ফিতনার ইতিহাস

ড. রাগিব সারজানি

ড. রাগিব সারজানি

ফিতনার ইতিহাস

অনুবাদ

মাহদি হাসান

মাকতাবাতুল হাসান

ফিতনার ইতিহাস

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০২২

দ্বিতীয় মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর ২০২২

প্রকাশনায়

মাকতাবাতুল হাসান

দোকান নং : ৩৩-৩৪, ইসলামি টাওয়ার (আন্ডারগ্রাউন্ড)
বাংলাবাজার, ঢাকা

✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০

অনলাইন পরিবেশক :

rokomari.com - wafilife.com

ISBN : 978-984-96318-5-9

Web : maktabatulhasan.com

E-mail : info.maktabatulhasan@gmail.com

fb/Maktabahasan

মুদ্রিত মূল্য : ৫২০/=

Fitnar Itihash

By Dr. Ragheb Sergani

Published by : Maktabatul Hasan, Bangladesh

ফিতনার ইতিহাস

মূল	:	ড. রাগিব সারজানি
অনুবাদ	:	মাহদি হাসান
সম্পাদনাপর্ষদ	:	আতাউস সামাদ, রাশেদ আবদুল্লাহ
ভাষা সম্পাদনা	:	মাহমুদুল্লাহ মুহিব
তথ্যসূত্র সংযোজন	:	রাশেদ আবদুল্লাহ
বানান সমন্বয়	:	মুনতাসির বিল্লাহ, কাজী আছিফুজ্জামান, সাজ্জাদ শরিফ
পৃষ্ঠাসজ্জা	:	তারিকুল হাসান তানভীর
প্রচ্ছদ	:	উজ্জ্বল আহমেদ
প্রকাশক	:	মো: রাকিবুল হাসান খান

অর্পণ

"যুন নুরাইন তথা দুই নুরের অধিকারী। রাসুল ﷺ-এর দুই কন্যার স্বামী। একাধিকবার রাসুল ﷺ-এর মুখে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত মহান সাহাবি এবং ইসলামের তৃতীয় খলিফা **উসমান ইবনে আফফান** রা.। যিনি বিদ্রোহীদের হাতে নির্মমভাবে শহিদ হয়ে পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাসুল ﷺ-এর সঙ্গে মিলিত হয়েছেন..."

বিষয়সূচি

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছেই সাহায্য কামনা করি। ক্ষমাপ্রার্থনা করি তাঁর কাছে এবং তাঁর কাছে চাই সঠিক পথের দিশা। আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি আমাদের প্রবৃত্তির অনিষ্ট থেকে এবং মন্দ আমল থেকে। আল্লাহ তাআলা যাকে সরল পথে পরিচালিত করেন, কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না। যাকে পথভ্রষ্ট করেন, কেউ তাকে সুপথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়। তিনি একক সত্তা, তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয় মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ তাআলার বান্দা এবং রাসুল।

পরকথা, আমরা আজ ইসলামি ইতিহাসের বেদনাসিক্ত একটি অধ্যায় উন্মোচন করতে যাচ্ছি। সময়ের যে প্রান্তে এসে সম্মানিত সাহাবিগণের হাতেই শহিদ হয়েছিলেন অনেক সাহাবি। আমরা কথা বলব ইসলামি ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ফিতনা উসমান ইবনে আফফান রা.-এর হত্যাকাণ্ড নিয়ে। আলোচনা করব আলি রা. এবং মুআবিয়া রা.-এর মতো সম্মানিত সাহাবিদ্বয়ের মধ্যকার লড়াই নিয়ে। কথা বলব এক অনভিপ্রেত ঘটনায় উল্লেখযোগ্যসংখ্যক সাহাবিগণের শাহাদাত নিয়ে। যা সেসময় ইসলামের প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে রেখেছিল বিরাট নেতিবাচক প্রভাব।

সত্যি বলতে, এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা ধারণার চেয়েও কঠিন। কারণ, বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর ও ঝুঁকিপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে কোনো ভুল মন্তব্য করা মানে জান্নাতি একজন ব্যক্তির ব্যাপারে ভুল মন্তব্য করা। সকল সাহাবিকে আমরা জান্নাতি মনে করি। রাসুল ﷺ তাদের ওপর সন্তুষ্ট থাকা অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন। তাদের মর্যাদার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে কুরআনের অনেক আয়াত। তাই তাদের কোনো একজনের ব্যাপারে ভুল মন্তব্য করা অবশ্যই মারাত্মক এবং ভয়াবহ ব্যাপার।

তবে অচিরেই আমরা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করব, যেগুলোর আলোকে আমরা এই ফিতনা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারব।

আর যেকোনো উৎস থেকে এ ফিতনা নিয়ে অধ্যয়ন করা ঠিক হবে না। কারণ, অনির্ভরযোগ্য উৎস থেকে এ বিষয়টি অধ্যয়ন করা খুবই বিপজ্জনক। এর কারণ আমরা শীঘ্রই উল্লেখ করব।

আমরা সামনে সেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো উল্লেখ করব, যেগুলো আপনাকে পবিত্র ও সম্মানিত সাহাবিগণের ক্ষেত্রে ভুল মন্তব্য করা থেকে রক্ষা করবে।

—ড. রাগিব সারজানি

কায়রো, মিশর

গ্রন্থটি যেসব উদ্দেশ্যে লেখা

প্রথম উদ্দেশ্য : সাহাবিগণের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অপবাদ ও আপত্তির জবাব দেওয়া

শুরুতেই আমাদের নিকট এ বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, কী কারণে ও কী উদ্দেশ্যে আমরা এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। এ ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য হবে, আমাদের প্রিয়নবী ﷺ-এর প্রিয় সাহাবিগণের মর্যাদা রক্ষা করা। সাহাবিগণের মর্যাদা রক্ষা করা সত্তাগতভাবেই অত্যন্ত মর্যাদার বিষয়। কারণ, বর্তমানে সাহাবিগণের ওপর অনেক অপবাদ আরোপ করা হচ্ছে। ইসলাম বিকৃতকারী কুচক্রী মহল তাদের কাউকেই লক্ষ্যবস্তু বানাতে কুণ্ঠাবোধ করছে না; চাই অজ্ঞতাবশত হোক কিংবা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেছেন,

> যখন এ উম্মতের শেষাংশ প্রথমাংশের (সাহাবিগণের) ওপর (তাদের মর্যাদা সম্পর্কে অজ্ঞতাবশত) অভিসম্পাত করবে, তখন যারা এ বিষয়ে (তাদের মর্যাদার বিষয়ে) জানে তারা যেন তাদের জ্ঞান প্রকাশ করে। নয়তো এই জ্ঞান গোপন করার কারণে মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর অবতীর্ণ জ্ঞানকে গোপন করার সমতুল্য অপরাধ হবে।[১]

আমরা চিন্তা করলে বুঝতে পারব যে, এ বাক্যটির গভীর মর্ম রয়েছে। সাহাবিগণের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তির জবাব না দিলে মানুষ মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর অবতীর্ণ জ্ঞানকে গোপনকারী সাব্যস্ত হবে—এ কথার কী অর্থ?

আমাদের নিকট এই দ্বীন সাহাবিগণের মাধ্যমেই এসেছে। পবিত্র কুরআন রাসুল ﷺ-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি সাহাবিগণের নিকট তা বর্ণনা করেছেন। তারা কুরআন লিপিবদ্ধ করেছেন, যথাযথভাবে সংরক্ষণ করেছেন এবং আমাদের পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন। রাসুল ﷺ নিজ হাতে পবিত্র সুন্নাহ তথা হাদিস লিপিবদ্ধ করেননি। বরং তাঁর থেকে সাহাবিগণ তা বর্ণনা করেছেন। তাই কোনো সাহাবির ওপর অপবাদ আরোপ করা সুন্নাহকে

---

১. *আল-মুজামুল আওসাত লিত তবারানি*, ৪৩০

প্রশ্নবিদ্ধ করার সমতুল্য। বরং এতে কুরআনকেও প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়। কারণ, এই কুরআন রাসুল ﷺ থেকে সাহাবিগণের মাধ্যমেই প্রচার হয়েছে।

আমরা সকলেই জানি, শিয়ারা সাহাবিগণের ওপর কতশত অপবাদ আরোপ করেছে! হয়তো কখনো কেউ বিষয়টি সম্পর্কে উদার নীতি গ্রহণ করে বলতে পারে, যতক্ষণ তারা আল্লাহ তাআলার তাওহিদ এবং রাসুল ﷺ-এর রিসালাতের সাক্ষ্য দেবে, ততক্ষণ সাহাবিগণের ওপর অপবাদ আরোপ করার কারণে তাদের ঈমানে কোনো সমস্যা হবে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি খুবই ভয়াবহ এবং বিপজ্জনক।

আসুন দেখে নিই, সাহাবিগণের ওপর অপবাদ আরোপ করার পরিণাম কী দাঁড়ায়। তারা সাহাবিগণের বিভিন্ন দোষত্রুটি তুলে ধরেছে। একজন একজন করে সবাইকে সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে। এমনকি তারা পাঁচজন সাহাবি ছাড়া অন্য সকল সাহাবিকে কাফের হিসাবে আখ্যায়িত করেছে। এ মতবাদের প্রবক্তারা আজও আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। যারা আমাদের কাছে শিয়া ইসনা আশারিয়া অথবা জাফরিয়া নামে পরিচিত। যে পাঁচজন সাহাবিকে তারা কাফের বলেনি তারা হলেন, আলি ইবনে আবু তালেব রা., মিকদাদ ইবনে আমর রা., আম্মার ইবনে ইয়াসির রা., আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. ও সালমান ফারসি রা.।

তাদের কেউ কেউ এ ক্ষেত্রে শিথিলতা করে ১১জন সাহাবি ছাড়া বাকি সকল সাহাবিকে কাফের সাব্যস্ত করেছে। আবু বকর সিদ্দিক রা. এবং উমর রা.-এর মতো সাহাবিকে তারা জিবত (শয়তান) ও তাগুত (বাতিল আরাধ্য) বলে আখ্যা দিয়েছে। উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রা.-সহ অন্য সকল সাহাবির ওপর অসংখ্য অপবাদ আরোপ করেছে।

সাহাবিগণের ঘৃণ্য সমালোচনা এবং তাদের কাফের সাব্যস্ত করার ফলে তারা সাহাবিগণের মুখনিঃসৃত সব কথা বর্জন করেছে। ওই সকল সাহাবিগণ যত হাদিস বর্ণনা করেছেন সবগুলোকেই তারা পরিত্যাগ করেছে।

বিশুদ্ধ গণনা অনুযায়ী প্রায় ১ লক্ষ ১৪ হাজার সাহাবি যত হাদিস বর্ণনা করেছেন সবগুলোকেই তারা বাতিল আখ্যা দিয়েছে। এমনকি তাদেরকে আমানতের খেয়ানতকারী আখ্যা দিয়ে স্পর্ধার চূড়ান্তসীমা লঙ্ঘন করেছে। ফলে বিষয়টি জটিল আকার ধারণ করেছে। তাদের মূলনীতির ওপর ভিত্তি

করে ওই সকল সাহাবিগণ থেকে বর্ণিত হাদিসকে তারা বাতিল আখ্যা দিয়ে থাকে।

ইমাম বুখারি রহ. যেহেতু সে সকল সাহাবি থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন; তাই শিয়াদের কথা অনুযায়ী এগুলো সবই বাতিল হিসাবে গণ্য হবে। আলি রা., সালমান ফারসি রা. প্রমুখগণ; যাদেরকে তারা কাফের সাব্যস্ত করেনি, *সহিহ বুখারি*তে তাদের বর্ণনা থেকে আনীত হাদিসগুলোও বাতিল বলে গণ্য হবে। এমনইভাবে *সহিহ মুসলিম*, *সুনানুত তিরমিজি*, *আস-সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ি*, *সুনানু আবি দাউদ*-সহ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআ সংকলিত সকল সহিহ হাদিসগ্রন্থ তাদের দৃষ্টিতে বাতিল ও পরিত্যাজ্য।

এর চেয়েও ঘৃণ্য এবং বিপজ্জনক কথা হচ্ছে, তারা পবিত্র কুরআনুল কারিমকে বিকৃত সাব্যস্ত করার ঘৃণ্য অপকর্মে লিপ্ত হয়েছে। শিয়াদের নিকট সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য গ্রন্থ *কিতাবুল কাফি*। আমাদের নিকট সহিহ বুখারির যে মর্যাদা, তাদের নিকট এ গ্রন্থটির সেই মর্যাদা। এই গ্রন্থে জাফর আল-জুফির সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, সে বলেছে,

আমি আবু জাফর[২] আ.-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি এই দাবি করে যে, সে সম্পূর্ণ কুরআন যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে সেভাবেই সংকলন করেছে; সে মিথ্যাবাদী।[৩]

তাদের দাবি অনুযায়ী কুরআন যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে সেভাবে সংকলিত হয়নি। একমাত্র আলি রা. এবং তার পরবর্তী ইমামগণই কুরআন যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে সেভাবে সংকলন ও সংরক্ষণ করেছেন।[৪] তাদের বক্তব্য অনুযায়ী, কুরআনের ১৭ হাজার আয়াত রয়েছে।[৫] অথচ আমরা জানি কুরআনের মোট আয়াত ৬২৩৬টি। আরও বলে, আমাদের কাছে যে কুরআন আছে, মূল কুরআন এর চেয়ে তিনগুণ বড়।[৬] আরও বলে, তাদের অদৃশ্য ইমাম, যিনি কোনো একদিন এসে আত্মপ্রকাশ করবেন; কুরআন তার

---

২. আবু জাফর সাদিক রহ. শিয়াদের থেকে মুক্ত। শিয়ারা তার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে যত কথা বলেছে তা থেকে তিনি পবিত্র। তিনি ছিলেন আলি রা.-এর বংশধর। শিয়ারা তাকে তাদের ষষ্ঠ ইমাম হিসাবে আখ্যা দিয়ে থাকে।

৩. *কিতাবুল কাফি*, ১/১৩৫

৪. *কিতাবুল কাফি*, ১/১৩৬

৫. *কিতাবুল কাফি*, ২/৩৫০

৬. *কিতাবুল কাফি*, ১/১৪১, *আশ-শিয়া ওয়াল কুরআন*, ৪২

সঙ্গে গোপন রয়েছে। আমাদের মাঝে যে কুরআন রয়েছে, তাতে অনেক বিকৃতি এবং ভ্রষ্টতা রয়েছে (নাউজুবিল্লাহ)। তবে বর্তমানে তাদের তাকিয়্যা নামক বিশ্বাস অনুযায়ী তারা এ কুরআনকে স্বীকার করে থাকে।

তাকিয়্যার শাব্দিক অর্থ আত্মরক্ষা।

পারিভাষিক সংজ্ঞা হচ্ছে, নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করার জন্য আপনি মনেপ্রাণে যা বিশ্বাস করেন তার বিপরীত প্রকাশ করা এবং আপনার অন্তরে নেই এমন কথা বলা।

শিয়াদের নিকট তাকিয়্যার আকিদা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি তারা বলে থাকে, 'যে তাকিয়্যায় বিশ্বাস করে না, তার দ্বীন নেই।' তাদের কথা অনুযায়ী তাকিয়্যা হচ্ছে দ্বীনের ১০ ভাগের নয়ভাগ। তাই দেখা যায়, তারা আমাদের মাঝে যে কুরআন রয়েছে, বাহ্যত তার প্রতি ঈমানের কথা স্বীকার করে ঠিকই, কিন্তু নিজেদের বইপত্রে তাদের বক্তব্য হচ্ছে—

প্রকৃত কুরআন সেটিই, যাতে ১৭ হাজার আয়াত রয়েছে। যা রাসুল ﷺ-এর ইন্তেকালের পর ফাতেমা রা.-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল। তিনি এ কুরআন মুখস্থ করেছিলেন। এরপর আলি রা.-ও পরবর্তী ইমামগণ তার কাছ থেকে আয়ত্ব করেছেন।' তাদের বক্তব্য অনুযায়ী কুরআনের অধিকাংশ আয়াত রহিত হয়ে গেছে।[৭] যেমন, সুরা ইনশিরাহের প্রথম আয়াত,

﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾

আমি কি আপনার বক্ষকে উন্মোচিত করিনি?

তাদের বক্তব্য অনুযায়ী এ আয়াত রহিত হয়ে গেছে। এর পরিবর্তে সেখানে হবে,

«وجعلنا عليا صهرك»

আমি আলিকে বানিয়েছি আপনার মেয়ের জামাই।

এ আলোচনা তাদের গ্রন্থ *কিতাবুল কাফি*-তে রয়েছে। বর্তমান ইরানি কুরআনের সুরা বেলায়া-এর মধ্যে এটি রয়েছে! আমাদের কুরআনে এ

৭. *কিতাবুল কাফি*, ১/১৪২

আলোচনা নেই এবং না থাকাটাই স্বাভাবিক। তাদের গ্রন্থে এই সূরাটি এভাবে আছে,

«يا أيها الذين امنوا امنوا بالنبي وبالولي الذين بعثناهما لهدايتكم إلى صراط مستقيم. نبي وولي بعضهما من بعض وأنا العليم الخبير. إن الذين يوفون بعهد الله لهم جنات النعيم. والذين إذا تليت عليهم اياتنا كانوا بايتنا مكذبين؛ إن لهم في جهنم مقاما عظيما. إذا نودي لهم يوم القيامة أين الظالمون المكذبون للمرسلين. ما خلفهم المرسلين بالحق وما كان الله ليظهرهم إلى أجل قريب وسبح بحمد ربك وعلي من الشاهدين»

হে ঈমানদাররা, তোমরা ঈমান আনো নবী এবং অলির প্রতি। যাদের আমি প্রেরণ করেছি, তোমাদের সরলপথ দেখানোর জন্য। আমার নবী এবং অলি একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত। আমিই সর্বজ্ঞ এবং সর্বাধিক অবগত। নিশ্চয় যারা আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার পূরণ করে, তাদের জন্য রয়েছে নেয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাত। আর যাদের সামনে আমার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হলে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তাদের জন্য জাহান্নামের ভয়াবহ স্থান নির্ধারিত। কেয়ামতের দিন তাদের এই বলে ডাকা হবে যে, ওই সকল মিথ্যাবাদী জালেমরা কোথায়, যারা আমার প্রেরিত দূতদ্বয়কে অস্বীকার করেছে? তাদের পরবর্তী সময়ে সত্য নিয়ে আর কোনো দূত প্রেরিত হবে না। আল্লাহ নিকটবর্তী সময় পর্যন্ত তাদের প্রকাশ ঘটাবেন না। আর তোমাদের প্রভুর তাসবিহ পাঠ করো এবং জেনে রাখো, আলি সাক্ষীগণের অন্তর্ভুক্ত।

এসব আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে, সাহাবিগণের মর্যাদা রক্ষা করা সম্পূর্ণ দ্বীন রক্ষার নামান্তর। যদি ওই সকল ভ্রান্ত দাবিদারকে সুযোগ করে দেওয়া হয়, তবে অচিরেই সুন্নাহের বিলুপ্তি ঘটবে। আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য যে দ্বীনকে মনোনীত করেছেন, সেই দ্বীন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এমনটি বাস্তবেই ঘটেছিল, যখন ওই সকল বিকৃতকারী কোনো কোনো অঞ্চলে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছিল। যেমন, মিশরে শিয়া ফাতেমিদের শাসনকালে তারা সুন্নাহকে সম্পূর্ণভাবে রহিত করে দিয়েছিল। তারা এমন সব বিষয় প্রতিষ্ঠা করেছিল, যা কুফর থেকে মুক্ত নয়। ফাতেমিদের ইতিহাস অধ্যয়নকারীগণ এমন অসংখ্য উদাহরণ খুঁজে পাবেন।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য : ইতিহাস নিয়ে চিন্তাভাবনা করা

পৃথিবীতে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। এটি আল্লাহ তাআলার অবধারিত রীতি। তিনি বলেন,

﴿فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحْوِيلًا﴾

আল্লাহ তাআলার স্থিরীকৃত নিয়মে কোনো পরিবর্তন পাবে না। এবং আল্লাহর স্থিরীকৃত নিয়মকে কখনো টলতেও দেখবে না।

[সুরা ফাতির : ৪৩]

সাহাবিগণের মধ্যে সংঘটিত ঘটনাবলি, তার কারণ, প্রকৃতি এবং ফলাফল এমন বিষয়, যুগে যুগে যার পুনরাবৃত্তি ঘটবে। আমাদের যুগে আসবে এবং কেয়ামত পর্যন্ত বারবার পুনরাবৃত্তি হবে। তাই প্রথমে আমাদের জানতে হবে, তাদের মধ্যকার বিরোধের প্রধান কারণ কী ছিল? কীভাবে সেগুলোর উৎপত্তি হয়েছিল? এর ফলাফল কী হয়েছিল? এবং কীভাবে এর ইতি ঘটেছিল?

যেন আমরা আল্লাহ তাআলার এই আদেশ থেকে উপকৃত হতে পারি। তিনি বলেন,

﴿فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾

আপনি ঘটনা বর্ণনা করুন, যেন তারা চিন্তাভাবনা করতে পারে।

[সুরা আরাফ : ১৭৬]

তিনি আরও বলেন,

﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

নিশ্চয় তাদের ঘটনাতে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষার উপাদান রয়েছে। এটি কোনো মনগড়া কথা নয় বরং তা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সমর্থক, সবকিছুর বিশদ বিবরণ এবং ঈমান আনয়নকারীদের জন্য হেদায়েত ও রহমতের উপকরণ। [সুরা ইউসুফ : ১১১]

তৃতীয় উদ্দেশ্য : বিকৃত আকিদাসমূহের সংশোধন

এসব ঘটনা সম্পর্কে যখন আমরা জানব, ভ্রান্ত দলগুলোর আত্মপ্রকাশের ইতিহাস সম্পর্কে অবগতি লাভ করব এবং তারা যে বিকৃত আকিদাগুলোর অনুসরণ করে, কীভাবে সেগুলো তাদের মধ্যে প্রবেশ করেছে; এ নিয়ে অধ্যয়ন করব, তখন আমাদের সামনে তাদের আকিদা আরও স্পষ্ট হবে এবং এসব আকিদার ব্যাপারে সুন্নাহর দৃষ্টিভঙ্গিও উদ্ভাসিত হবে।

যখন আমাদের অন্তরে এ সব উদ্দেশ্যের সম্মিলন ঘটবে ও আমাদের অধ্যয়ন হবে এসব মহান উদ্দেশ্যে, শুধু ঘটনা এবং কেচ্ছা শোনার উদ্দেশ্য নয়, তখনই আমরা বিপদ থেকে নিরাপদ হতে পারব। এ বিষয়ে মনগড়া ঘটনা অনেক রয়েছে। তবে কিছু মানুষ এগুলো অধ্যয়ন বা শ্রবণ করে পুলক বোধ করে। অথচ এটি খুবই মারাত্মক একটি ব্যাপার। হাসান বসরি রহ.-কে সাহাবিগণের মধ্যে সংঘটিত ফিতনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ তাআলা আমাদের তরবারিগুলো তাদের রক্ত থেকে নিরাপদ রেখেছেন। তাই আমরাও আমাদের কলমকে তাদের সম্মানে আঘাত করা থেকে নিরাপদ রাখতে চাই।

এই অধ্যায় (উসমান ইবনে আফফান রা.-এর হত্যাকাণ্ডের আলোচনা) শুরু করার আগে বলে রাখা আবশ্যক যে, মানুষ এই ফিতনা সম্পর্কে ব্যাপকভাবে যেসব তথ্য জানে তার বেশিরভাগই বিকৃত। স্কুল, মাদরাসা এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আমরা যে ইতিহাস পড়েছি, সেগুলোও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিকৃত করা হয়েছে। অচিরেই এ বিষয়ে আলোচনা করব। ইনশাআল্লাহ।

এ বিষয়ে জ্ঞানতাত্ত্বিক অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা ফিতনা নিয়ে গবেষণা করার একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি সম্পর্কে জানতে পারব। এই মূলনীতিটি আমাদের সামনে এমন একটি শাস্ত্রের পরিচয় তুলে ধরবে, যে শাস্ত্রের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহর প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন। এই শাস্ত্র হচ্ছে ইলমুর রিজাল বা ইলমুল জারহ ওয়াত তাদিল।

শুরুতে আমাদের বলে রাখা উচিত, রাসুল ﷺ থেকে যেসব হাদিস বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর দুটি অংশ রয়েছে। প্রথম অংশ হচ্ছে মতন তথা হাদিসের মূল বক্তব্য। দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে সনদ তথা বর্ণনাসূত্র। ইলমুর রিজালে বা

ইলমুল জারহ ওয়াত তাদিলে সনদের বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

আলেমগণের নিকট জারহ-এর সংজ্ঞা হচ্ছে, কোনো বিজ্ঞ হাফিজুল হাদিস[৮] কোনো বর্ণনায় কিংবা বর্ণনাকারীর মধ্যে ফিসক[৯], তাদলিস[১০], মিথ্যা, শুযুয[১১] অথবা এ ধরনের অন্য কোনো ত্রুটি থাকায় বর্ণনাটি গ্রহণ না করা। যেমন, কোনো বর্ণনাকারীর ব্যাপারে তিনি বললেন, এই বর্ণনাকারীর মধ্যে সমস্যা রয়েছে। সে মিথ্যাবাদী বা হাদিস জালকারী, অথবা সে নির্ভরযোগ্য নয় কিংবা সে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভুলে যায়। আর এ কারণে ওই বর্ণনাকারীর বর্ণিত বর্ণনাকে তিনি গ্রহণ করলেন না।

তাদিলের সংজ্ঞা হচ্ছে, একজন বর্ণনাকারীর বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য তার মধ্যে যেসব গুণ থাকা উচিত তাকে সেসব গুণে গুণান্বিত সাব্যস্ত করা।

সনদের বা বর্ণনাসূত্রের মান বিচারের মধ্য দিয়েই আমরা হাদিস সহিহ[১২], জয়িফ[১৩] বা জাল[১৪] কি না তা জানতে পারব।

ইলমুর রিজাল বা ইলমুল জারহ ওয়াত তাদিল একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শাস্ত্রের মর্যাদা রাখে। ইয়াহইয়া ইবনে মাইন রহ.; যিনি ছিলেন ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর সামসময়িক ব্যক্তিত্ব—তার মতো অনেক বিজ্ঞ আলেম এ শাস্ত্রে বিশেষ দক্ষ ছিলেন।

---

৮. **হাফিজুল হাদিস :** হাফিজুল হাদিস বলতে বিপুলসংখ্যক হাদিস আত্মস্থকারী ও হাদিসশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে বুঝানো হয়। *আদ-দুরারুস সামিনা ফি মুস্তলাহিস সুন্নাহ লিশ শায়খ আবদিল মাতিন*।-সম্পাদক

৯. **ফিসক :** কবিরা গুনাহ পর্যায়ের পাপাচারে লিপ্ত হওয়া।-সম্পাদক

১০. **তাদলিস :** হাদিসশাস্ত্রের একটি পরিভাষা। এর উদ্দেশ্য হলো বর্ণনার ত্রুটি ঢেকে রাখা বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে বর্ণনায় ধোঁকার আশ্রয় নেওয়া। হাদিসশাস্ত্রে এর বিভিন্ন প্রকার রয়েছে।-সম্পাদক

১১. **শুযুয :** হাদিসশাস্ত্রের একটি পরিভাষা। এর দ্বারা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী তার সমপর্যায়ের বর্ণনাকারীদের অথবা উচ্চপর্যায়ের বর্ণনাকারীদের বিপরীত বা স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করাকে বুঝানো হয়। অনুরূপভাবে অনির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর বিপরীত বা স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করাকেও বুঝানো হয়। *শারহু লুগাতিল মুহাদ্দিস*, পৃ. ৪১৫-৪২৫। -সম্পাদক

১২. **সহিহ :** বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য হাদিস।-সম্পাদক

১৩. **জয়িফ :** অনির্ভরযোগ্য হাদিসের একটি প্রকার, এ প্রকারের হাদিস দ্বারা শরিয়তের কোনো বিধান সাব্যস্ত হয় না। *আল-আজবিবাতুল ফাযিলা*।-সম্পাদক

১৪. **জাল :** এমন হাদিসকে বলা হয় যা নবীজি ﷺ-এর নামে চালানো হয়, কিন্তু বাস্তবে নবীজি তা বলেছেন বা করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন, *লামাহাত মিন তারিখিস সুন্নাহ ওয়া উলুমিল হাদিস*।-সম্পাদক

তবে চিন্তার বিষয় হচ্ছে, ফিতনা সম্পর্কিত যত হাদিস এবং বর্ণনা রয়েছে, এর মধ্যে ৭৫ শতাংশের বেশি অত্যন্ত দুর্বল এবং রাসুল ﷺ ও সাহাবিগণের নামে জালকৃত।

এ কথা বলাও গুরুত্বের দাবি রাখে যে, রাসুল ﷺ-এর হাদিসসমূহের সংকলন শুরু হয়েছিল উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ.-এর খেলাফতকালে। অর্থাৎ রাসুল ﷺ-এর হিজরতের প্রায় ১০০ বছর পর। যখন উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. দেখতে পেলেন যে, মানুষ রাসুল ﷺ-এর সুন্নাহ ভুলে যাচ্ছে এবং উম্মাহর এই অমূল্য সম্পদ বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে, তখন তিনি সেই সময়কার বিজ্ঞ আলেম ইমাম যুহরি রহ.-কে হাদিস সংকলনের আদেশ দেন। তিনি এসব হাদিস লিপিবদ্ধকরণ এবং সংকলনের দিকে মনোযোগী হন। সে সময় সাহাবিগণের মধ্যে কেবল হাতে গোনা কজন সাহাবি জীবিত ছিলেন। আর আমরা জানি যে, সর্বশেষ সাহাবির ইন্তেকাল হয়েছিল ১১০ হিজরিতে। তাই ইমাম যুহরি রহ. সম্পূর্ণরূপে ইলমুর রিজালের ওপর নির্ভর করেছিলেন। তিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে গবেষণা করে হাদিস সংকলন করতে থাকেন। তার পরবর্তী সময়ে আসেন ইমাম বুখারি রহ. এবং ইমাম মুসলিম রহ. প্রমুখ মনীষীগণ। তারা এসে 'অমুক থেকে অমুক বর্ণনা করেছেন' এই সূত্র ধরে হাদিস লিপিবদ্ধ করা শুরু করেন। তখন ইলমুর রিজাল এবং ইলমুল জারহ ওয়াত তাদিলের গুরুত্ব প্রকাশ পেতে থাকে।

৬০০ হিজরিতে এসে একজন লোক যখন কোনো একটি হাদিস পাঠ করে, তখন এই মন্তব্য করতে পারে যে, এই হাদিসটি দুর্বল। কারণ, এই হাদিসে অমুক বর্ণনাকারী রয়েছে, যাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আর হাদিস সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্য করা অত্যন্ত সূক্ষ্ম একটি বিষয়। এই পদ্ধতিতে নিশ্চিতভাবে হাদিসের মান নির্ধারণ করার লক্ষ্যে আলেমগণ একজন বর্ণনাকারীর সম্পূর্ণ জীবনী অধ্যয়ন করতেন। তিনি কখন জন্মগ্রহণ করেছেন, কখন তার মৃত্যু হয়েছে, কোথায় বাস করেছেন, কোন কোন শহরে কত সময় থেকেছেন, তার সম্পর্কে মানুষের কী মন্তব্য ছিল, তিনি কি সত্যবাদী ছিলেন নাকি মিথ্যাবাদী, আমানতদার ছিলেন নাকি খেয়ানতকারী—এসব নিয়ে তারা বিস্তারিত পড়াশোনা করেছেন।

এই শাস্ত্রই আমাদের জন্য সুন্নাহকে সংরক্ষণ করেছে। সংরক্ষণ করেছে সাহাবিগণের কার্যাবলি। এমনইভাবে আমাদের জন্য সংরক্ষিত রেখেছে

ফিতনাসংক্রান্ত হাদিসসমূহ। বিশেষভাবে আমাদেরকে জানিয়েছে যে, এ বিষয়ে রয়েছে অনেক মনগড়া হাদিস।

আমরা যদি শিয়াদের বর্তমান গ্রন্থাদির দিকে তাকাই, তবে দেখতে পাব তাদের কাছে ইলমুল জারহ ওয়াত তাদিল নামক অতি প্রয়োজনীয় এই শাস্ত্রের কোনো চিহ্নও নেই। একমাত্র আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর কাছেই এ শাস্ত্রের মূল্যায়ন রয়েছে। তাই আমরা দেখি, শিয়ারা অমুক থেকে অমুক, এভাবে বর্ণনা করতে গিয়ে একপর্যায়ে নির্দিষ্ট কারও নাম উল্লেখ না করে এভাবে বলতে থাকে যে, সে বর্ণনা করেছে তার চাচার সূত্রে, সে তার পিতার সূত্রে, সে একদল মানুষ থেকে। এখন এই অস্পষ্ট কথাগুলো দ্বারা কাদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে তাদের বিবরণে তা আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

কোনো হাদিস বিশারদ এ বর্ণনাকারীদেরকে চেনে না, ফলে এদের কারও সম্পর্কে ইতিবাচক বা নেতিবাচক মন্তব্য করতে পারছে না। এভাবেই নানা অস্পষ্টতা রয়ে যায়। এ ছাড়া তাদের অনেক বর্ণনাকারীর ব্যাপারেই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআ একমত যে, হাদিসশাস্ত্রে তাদের বর্ণনা অগ্রহণযোগ্য। এর বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসছে ইনশাআল্লাহ।

রাসুল ﷺ এবং সাহাবিগণের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে মনগড়া হাদিস রচনার প্রসার ঘটেছিল আব্বাসি খেলাফতকালে। কারণ, সে সময় ওই সকল পথভ্রষ্টরা ছিল খুবই শক্তিশালী। আব্বাসি খলিফাগণ তাদের প্রতিরোধে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। এই ঘৃণ্য অপকর্ম থেকে বিরত থাকার জন্য তাদেরকে অনেক সতর্কবার্তাও দিয়েছেন। তবুও তারা এই অপকর্ম অব্যাহত রেখেছে।

***

মনগড়া হাদিস রচনাকারীদের শ্রেণিভাগ

নবীজি ﷺ-এর নামে মনগড়া এবং বানোয়াট কথার রচয়িতাদেরকে আলেমগণ কয়েক শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। যথা :

১. জিন্দিক

যখন কোনো ব্যক্তি দ্বীন থেকে বেরিয়ে যায় এবং সজ্ঞানে দ্বীনকে আঘাত করে, তখন সে জিন্দিক হয়ে যায়। যেমন, বর্তমান সময়ের সালমান রুশদি। সে দ্বীন থেকে বেরিয়েই ক্ষান্ত থাকেনি; বরং তার রচনাবলির মাধ্যমে ইসলামের ওপর আঘাত শুরু করেছে। এসব জিন্দিক মূলত দ্বীনের বিকৃতি সাধন এবং ইসলামের আকিদা-বিশ্বাস, কুরআন ও সুন্নাহর ওপর কালিমা লেপনের লক্ষ্যে প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণের ভান করেছে। তাই তারা হাদিসের নামে মনগড়া কথা বানিয়ে হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল আখ্যা দেয়।

এর আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে মুহাম্মাদ ইবনে সাইদ আল-মাসলুব নামক এক ব্যক্তি। আব্বাসীয় খলিফা আবু জাফর মানসুর তার হাদিস জালিয়াতির ব্যাপারে জানতে পেরে তাকে হত্যা করেছিলেন। তার বানানো একটি হাদিস হলো, আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেছেন, আমিই শেষ নবী। আমার পর আর কোনো নবী আসবে না। তবে আল্লাহ যদি চান (তবে আসতে পারে)।[১৫]

এমন আরেক ব্যক্তির নাম হচ্ছে আবদুল কারিম ইবনে আবিল আওজা। তার হাদিস জালিয়াতি সম্পর্কে জানার পর আব্বাসি খলিফা তাকে হত্যা করেছেন। এই ইবনে আবিল আওজা ছিল চরম ইসলাম বিদ্বেষী। তাকে হত্যার জন্য আনা হলে, সে সদম্ভে বলেছিল, তোমরা আমাকে একটি বা দুটি হাদিসের জন্য হত্যা করছ। আল্লাহর শপথ! আমি রাসুল ﷺ-কে নিয়ে ৪

---

১৫. *আল-মাওজুআত লি ইবনিল জাওযি*, ১/২৭৯, *তানযিহুশ শারিয়া*, ১/২২১, *আল-লাআলিল মাসনুয়া*, ১/২৪৩

হাজার জাল হাদিস রচনা করেছি। এসব হাদিসে আমি হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল হিসাবে উপস্থাপন করেছি।

সে একাই বিপুল পরিমাণ জাল হাদিস রচনা করেছে। কথিত আছে, জিন্দিকদের রচিত জাল হাদিসের সংখ্যা প্রায় ১৪ হাজার। এর অনেকগুলো প্রসিদ্ধিও পেয়েছে।

২. শাসকশ্রেণির তোষামোদকারী

এই শ্রেণির লোকেরা তোষামোদ এবং চাটুকারিতার মাধ্যমে শাসকশ্রেণির নৈকট্যলাভ করতে চায়। এজন্য তারা রাসুল ﷺ-এর নামে মনগড়া হাদিস রচনা করে। এর মাধ্যমে বনু উমাইয়ার ওপর অপবাদ আরোপের ধারা শুরু করে। কারণ, তখন আব্বাসীয়দের শাসন চলছিল। তাই তাদেরকে খুশি করার অব্যর্থ অস্ত্র ছিল বনু উমাইয়া গোত্রের নিন্দা করা। এর প্রেক্ষিতেই মহান সাহাবি মুআবিয়া রা. এবং তার পুত্র ইয়াজিদের নিন্দামূলক বর্ণনাগুলো প্রকাশ পায়। অথচ ইয়াজিদ ছিলেন একজন খোদাভীরু ব্যক্তি। তারা ইয়াজিদের ব্যাপারে রটিয়ে দেয় যে, তিনিও মদ্যপান এবং নারীলিপ্সার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। ওয়ালিদ ইবনে উকবা রা.-এর মতো মহান মুজাহিদের ব্যাপারে তারা এ কথা ছড়িয়ে দেয় যে, তিনি মদ্যপানের প্রতি আসক্ত ছিলেন। এমনইভাবে আমের ইবনে আবদুল্লাহ এবং বনু উমাইয়া গোত্রের প্রত্যেক শাসকের চরিত্রে তারা কালিমা লেপন করে। তাদের মধ্যে মহান সাহাবি উসমান ইবনে আফফান রা.-ও ছিলেন। কারণ, তিনি ছিলেন বনু উমাইয়া বংশোদ্ভূত। তিনিও তাদের অপবাদ থেকে মুক্তি পাননি।

৩. জনগণের মনোতুষ্টিতে আগ্রহী

সেই যুগে একদল মানুষ ছিল, যাদের বলা হতো কাসসাস (বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে এর অনুবাদ করা যায় বক্তা)। তারা লোকদের কাছে বিভিন্ন হৃদয়স্পর্শী গল্প-কাহিনি বর্ণনা করত। মুসলিম সমাজ স্বাভাবিকভাবেই রাসুল ﷺ এবং সাহাবিগণকে ভালোবাসে, তাই তারা রাসুল ﷺ এবং সাহাবিগণকে এসব গল্প-কাহিনির বর্ণনাকারী বানাত। তারা দুর্লভ, বিস্ময়কর এবং বানোয়াট বিভিন্ন কাহিনি বর্ণনা করত, যেগুলোর কোনো ভিত্তি ছিল না। দুঃখজনক কথা হচ্ছে, তারা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে এসব মনগড়া কাহিনি সাহাবিগণের বর্ণনা বলে চালিয়ে দিত।

এমন একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা তুলে ধরছি—

একবার ইমাম আহমাদ রহ. এবং ইয়াহইয়া ইবনে মাইন রহ. বাগদাদের মসজিদে রুসাফায় নামাজ আদায় করছিলেন। ইতিমধ্যে এক বক্তা তাদের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে থাকে, আহমাদ ইবনে হাম্বল এবং ইয়াহইয়া ইবনে মাইন আমাকে শুনিয়েছেন, তারা শুনেছেন আবদুর রাজ্জাকের কাছ থেকে। তিনি শুনেছেন মামারের কাছ থেকে। তিনি কাতাদা থেকে, আর কাতাদা আনাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, রাসুল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করবে, আল্লাহ প্রতিটি অক্ষর থেকে একটি পাখি সৃষ্টি করবেন। যার ঠোঁট হবে স্বর্ণের আর পালক হবে অমূল্য মারজান পাথরের।

এভাবে সে ২০ পৃষ্ঠাব্যাপী লম্বা এক ঘটনা বর্ণনা করে। আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এবং ইয়াহইয়া ইবনে মাইন রহ. আশ্চর্যান্বিত হয়ে একে অপরের দিকে তাকাতে থাকেন। ইয়াহইয়া ইবনে মাইন রহ. ইমাম আহমাদ রহ.-কে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কি তার কাছে এই হাদিস বর্ণনা করেছেন? তিনি জবাব দেন, আল্লাহর শপথ! এমন হাদিস আমি মাত্রই শুনলাম।

লোকটির মজলিস শেষ হলে শুরু হয় হাদিয়া গ্রহণের পালা। সে লোকদের হাদিয়া গ্রহণের জন্য বসে পড়ে। ইয়াহইয়া ইবনে মাইন রহ. ইশারায় তাকে কাছে ডাকেন। সে হাদিয়া পাওয়ার আশা নিয়ে তাদের কাছে আসে। ইয়াহইয়া ইবনে মাইন রহ. তাকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনাকে এই হাদিস কে শুনিয়েছে?

লোকটি জবাব দেয়, আহমাদ ইবনে হাম্বল এবং ইয়াহইয়া ইবনে মাইন।

ইয়াহইয়া ইবনে মাইন রহ. বলেন, আমি ইয়াহইয়া ইবনে মাইন এবং ইনি হলেন আহমাদ ইবনে হাম্বল। আমরা তো রাসুল ﷺ-এর এমন কোনো হাদিসই শুনিনি।

লোকটি জবাব দেয়, আমি বরাবরই শুনে এসেছি, ইয়াহইয়া ইবনে মাইন একজন বোকা লোক। এখন সে ব্যাপারে নিশ্চিত হলাম। মনে হয় যেন পৃথিবীতে তোমরা ছাড়া আর কোনো ইয়াহইয়া ইবনে মাইন আর আহমাদ ইবনে হাম্বল নেই! আমি তো ১৭জন আহমাদ ইবনে হাম্বল এবং ইয়াহইয়া ইবনে মাইন থেকে লিখেছি।

তখন আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. তার জামার আস্তিন দিয়ে মুখ চেপে বলেন, এই লোককে যেতে দিন। লোকটি তখন বিদ্রূপাত্মক এক হাসি দিয়ে তাদের সামনে থেকে চলে যায়।[১৬], [১৭]

এই ছিল ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. (১৬৪-২৪১ হিজরি)-এর যুগের চিত্র। যা রাসুল ﷺ-এর যুগ থেকে খুবই নিকটবর্তী ছিল। তাহলে পরবর্তী সময়ে বিষয়টি কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে একটু ভেবেই দেখুন।

৪. নিজের মতবাদ বা অঞ্চলের প্রতি অন্যায় পক্ষপাতদুষ্ট

যারা মনগড়া হাদিস রচনা করে তাদের মধ্যে এই গোষ্ঠীকেই সবচেয়ে বিপজ্জনক গণ্য করা হয়। নিজেদের মতবাদের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবের কারণেই শিয়ারা রাসুল ﷺ-কে নিয়ে বানোয়াট হাদিস রচনা এবং সাহাবিগণের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে মিথ্যা বর্ণনা শুরু করেছিল। বিশেষ করে ফিতনাসংক্রান্ত ব্যাপারে তাদের মনোযোগ ছিল সবচেয়ে বেশি। তৎকালীন পরিস্থিতিতে শিয়াদের প্রভাবের কারণে এই ঘৃণ্য পদ্ধতিটি ব্যাপক প্রচলন লাভ করে। এমনইভাবে তারা পারস্যের প্রতিও খুব অন্যায় পক্ষপাতিত্বের আশ্রয় নেয় এবং ইসলামের সঙ্গে অনেক বিষয়ের সংমিশ্রণ ঘটায়। এর চেয়েও স্পর্ধার কথা হচ্ছে, তারা ইসলাম ধর্মে অগ্নিপূজারিদের অনেক আকিদার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। শিয়াদের আকিদা বর্ণনা করার সময় এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ।

এদের রচিত কিছু জাল হাদিস হচ্ছে—

- বনু হাশেম ব্যতীত অন্য লোকেরা একে অপরের সম্মানে দাঁড়াবে। কারণ, বনু হাশেম কারও সম্মানে দাঁড়ায় না।[১৮]

- রাসুল ﷺ মদিনায় আগমন করার পর যখন সাহাবিগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন গড়লেন, তখন আলি রা. অশ্রুসজল চোখে তাঁর কাছে এসে বললেন, আপনি সকল সাহাবিগণদের মাঝে একে অপরের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন গড়ে

---

১৬. ঘটনাটির বিশুদ্ধতা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। ইমাম যাহাবি রহ. এই ঘটনার বর্ণনাকারীকে অপরিচিত আখ্যা দিয়ে ঘটনাটি বানোয়াট হওয়ার আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন।-অনুবাদক

১৭. *তাহযিবুল কামাল*, ৩১/৫৫৮; *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১১/৮৬

১৮. *মাজমাউয যাওয়ায়িদ*, ৮/৪০

দিলেন। কিন্তু আমার সঙ্গে কারও ভ্রাতৃত্ব গড়ে দিলেন না! তখন রাসুল ﷺ বললেন, হে আলি, তুমি দুনিয়া এবং আখেরাতে আমার ভাই।[১৯]

এটি একটি জাল হাদিস। অনেকেই এটিকে সহিহ মনে করে থাকে।

এমনইভাবে আরও অনেক জাল হাদিস রয়েছে। যেমন :

- কুরআনের দিকে তাকানো ইবাদত।[২০]
- পিতামাতার দিকে সন্তানের তাকানো ইবাদত।[২১]
- আলি রা.-এর দিকে তাকানো ইবাদত।[২২]
- আমি সর্বশেষ নবী। আর হে আলি, তুমি সর্বশেষ অলি ইত্যাদি।[২৩]

এমনকি তারা উম্মুল মুমিনিন আয়েশা সিদ্দিকা রা.-এর মর্যাদাকে তুচ্ছ প্রতিপন্ন করতে চায়। এজন্য তারা বলে থাকে, রাসুল ﷺ বলেছেন, হে আয়েশা, তুমি কি জানো, আল্লাহ তাআলা জান্নাতে আমার সঙ্গে মারয়াম বিনতে ইমরান, মুসার বোন কুলসুম এবং ফেরাউনের স্ত্রীকে বিয়ে দিয়েছেন![২৪]

তারা এখানে আম্মাজান আয়েশা রা.-এর কথা উল্লেখ করেনি। অথচ এটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয় যে, মুমিনের দুনিয়ার স্ত্রী আখেরাতেও তার স্ত্রী থাকবেন। তারা আয়েশা রা.-এর ব্যাপারে আরও জঘন্য অপবাদ আরোপ করার প্রয়াস চালিয়েছে। তার কুৎসা বর্ণনা করতে এমন আরও অনেক হাদিস তারা রচনা করেছে। তাদের মধ্যে মাইসারা ইবনে আবদে রাব্বি নামে কুখ্যাত এক লোক ছিল। সে স্বীকার করেছে যে, সে একাই আলি রা.-এর মর্যাদাসংক্রান্ত ৭০টি হাদিস বানিয়েছে।

আমরা জানি যে, আলি রা.-এর মর্যাদা প্রমাণের জন্য এসব বানোয়াট হাদিসের কোনো প্রয়োজন নেই। ইসলামে আলি রা.-এর মর্যাদা সর্বজন স্বীকৃত। আল্লাহ তাআলার কাছে তার জন্য বিরাট মর্যাদা রয়েছে। কিন্তু আলি

---

[১৯]. *তাখরিজু আহাদিসিল ইহয়া*, ১/৬৪৮; *তাজকিয়াতুল মাওজুআত*, পৃ. ৯৭

[২০]. *আল-ইলালুল মুতানাহিয়া*, ২/৩৪৪; *আল-লাআলিল মাসনুআ*, ১/৩১৭

[২১]. *আল-লাআলিল মাসনুআ*, ১/৩১৭

[২২]. *আল-লাআলিল মাসনুআ*, ১/৩১৭

[২৩]. *আল-মাওজুআত লি ইবনিল জাওযি*, ১/৩৯৮; *তানযিহুশ শারিয়া*, ১/৩৬৬

[২৪]. *মাজমাউয যাওয়ায়িদ*, ৯/২১৮

রা.-এর মর্যাদা প্রমাণ এবং অন্যান্য সাহাবিগণের কুৎসা রটনায় নবীজির নামে হাদিস রচনার কোনো সুযোগ নেই। অন্য সাহাবিগণকে উপেক্ষা করে শুধু আলি রা.-কে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করা অবশ্যই ঘৃণ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে।

৫. ইসলামের প্রতি অতি ভক্তি পোষণকারী

আশ্চর্যের কথা হচ্ছে, এ ধরনের লোকেরাও জাল হাদিস রচনা করেছেন। কিন্তু আমরা যখন এ সমস্ত জাল হাদিস রচনার পেছনে তাদের উদ্দেশ্য জানতে পারব, তখন আমাদের বিস্ময় কেটে যাবে। তারা দেখতে পেয়েছিল যে, মানুষ দিনদিন ইসলাম ধর্ম থেকে সরে যাচ্ছে। কুরআন তেলাওয়াত কমিয়ে দিচ্ছে। সুন্নাহর অনুসরণ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। তাই মানুষকে কুরআন তেলাওয়াত এবং সুন্নাহর অনুসরণের প্রতি উদ্‌বুদ্ধ করতে তারা এ ধরনের মনগড়া হাদিস রচনার আশ্রয় নেয়।

এদের মধ্যে আবু ইসমাহ ইবনে মারয়াম নামক এক ব্যক্তি ছিলেন। যিনি তৎকালীন পারস্যের অন্তর্গত মার্ভ শহরের কাজি তথা বিচারক ছিলেন। তিনি কুরআনের প্রতিটি সুরার ফজিলত বর্ণনা করার জন্য একটি করে হাদিস রচনা করেছিলেন যে, যে অমুক অমুক সুরা পাঠ করবে সে এমন এমন সওয়াব পাবে ইত্যাদি। এমন একটি মুনকার (অগ্রহণযোগ্য ও বর্ণনার অযোগ্য) হাদিস হচ্ছে, প্রতিটি বস্তুরই সৌন্দর্যবর্ধক আছে। আর কুরআনের সৌন্দর্যবর্ধক হচ্ছে সুরা আর-রাহমান।[২৫]

এমন অগ্রহণযোগ্য আরও বহু হাদিস তিনি রচনা করেছিলেন।

৬. জাগতিক স্বার্থ উদ্ধারকারী

এই শ্রেণির লোকেরা জাগতিক স্বার্থ উদ্ধারের জন্য জাল হাদিস রচনা করে থাকে। রাসুল ﷺ-এর সঙ্গে এসব মনগড়া কথাকে সম্বন্ধ করতে তারা একটুও কুণ্ঠাবোধ করে না। এ ধরনের জাল হাদিসের একটি উদাহরণ হলো, এক ব্যক্তি রাসুল ﷺ-এর দিকে সম্বন্ধ করে বলেছে যে, আল্লাহ তাআলা বিনহা অঞ্চলের মধুর মধ্যে বরকত দান করেন।[২৬]

---

২৫. *জয়িফুল জামিয়িস-সগির ওয়া যিয়াদাতিহি*, ৪৭২৯

২৬. *তারিখু ইবনি মাইন*, ৪/৪৮৭; *সিলসিলাতুল আহাদিসিজ জয়িফা ওয়াল-মাওজুআ*, ১২৫৮

বোঝা যায় যে, সেই ব্যক্তি ছিল মধু বিক্রেতা। নিজের ব্যবসার প্রসারের উদ্দেশ্যে সে রাসুল ﷺ-এর নামে এমন মনগড়া কথা বলে দিয়েছে। উল্লেখ্য, বিনহা হচ্ছে মিশরের একটি গ্রাম।

এমন আরও কিছু জাল হাদিস রয়েছে। যথা :

যে ব্যক্তি মাসের ১৭ তারিখ মঙ্গলবার দিন শিঙ্গা লাগাবে, তার সারা বছরের চিকিৎসা সম্পন্ন হয়ে যাবে।[২৭]

কোনো পরিবারের কর্তা কখনো সফল হয়নি।[২৮]

এসবই হচ্ছে ঈমানের দুর্বলতা এবং অন্তর থেকে দ্বীনদারি বিদূরিত হয়ে যাওয়ার কুফল।

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, একাধিক কারণে বিপুল পরিমাণে জাল হাদিস ছড়িয়েছে। জিন্দিকরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই ইসলামের বিকৃতি সাধন করেছে। নিজেদের মতবাদের প্রতি অন্যায় পক্ষপাতদুষ্টরা তাদের মতবাদকে সমুন্নত করার জন্য ইসলামের সঠিক মতবাদকে কলুষিত করেছে। কিছু লোক শ্রোতাদেরকে মুগ্ধ করার জন্য নিজ থেকে মনগড়া গল্প রচনা করেছে। কিছু লোক আব্বাসি মন্ত্রী এবং আমলাদের নৈকট্যলাভের জন্য বনু উমাইয়া গোত্রের শাসকদের অপবাদ দিয়ে ভ্রান্তি ছড়িয়েছে।

এসব মনগড়া হাদিসের প্রতিক্রিয়া ফিতনাসংক্রান্ত ঘটনাসমূহের ওপরেও প্রকাশ পেতে থাকে।

যেসব গ্রন্থে এই ফিতনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলোর দিকে আমরা যদি চোখ বুলাই তাহলে দেখব যে, এসব গ্রন্থের প্রায় সব হাদিসই যথাক্রমে : আবু মিখনাফ লুত ইবনে ইয়াহইয়া, ওয়াকিদি, মুহাম্মাদ ইবনে সায়িব কালবি এবং তার পুত্র হিশাম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সায়িব কালবির সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। ফিতনাসংক্রান্ত যত সন্দেহযুক্ত হাদিস রয়েছে, এগুলো এই চারজনের সঙ্গেই সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে।

এখন দেখি এই চারজনের ব্যাপারে আলেমগণের কী মন্তব্য :

১. প্রথম বর্ণনাকারী লুত ইবনে ইয়াহইয়া আবু মিখনাফের ব্যাপারে ইবনে হাজার আসকালানি রহ. বলেছেন, লুত ইবনে ইয়াহইয়া আবু মিখনাফ হলো

---

২৭. *তাখরিজু আহাদিসিল ইহয়া*, ১/১৬৪৫

২৮. *আত-তাযকিরাহ ফিল আহাদিসিল মুশতাহিরা*, পৃ. ১৯০; *আল-মাওযুয়াত লি ইবনিল জাওযি*, ২/২৮১

একেবারেই অনির্ভরযোগ্য একজন ঐতিহাসিক। তার ওপর নির্ভর করা যায় না।

- দারাকুতনি রহ. বলেছেন, সে দুর্বল।
- ইয়াহইয়া ইবনে মাইন রহ. বলেছেন, সে কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী নয়। আরেকবার বলেছেন, তার কথা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নয়।
- ইবনে আদি রহ.-এর মতানুযায়ী সে ছিল একজন বিদ্বেষী শিয়া।

২. দ্বিতীয় বর্ণনাকারী ওয়াকিদির ব্যাপারে যাহাবি রহ.-এর মন্তব্য হচ্ছে, তার হাদিস বর্জনের ব্যাপারে সকলে একমত।

- আলি ইবনে মাদিনি রহ.-এর মতে, ওয়াকিদি জাল হাদিস রচনা করেন।
- ইমাম বুখারি রহ.-এর মতে ওয়াকিদির হাদিস বর্জনীয়।
- মুআবিয়া ইবনে সালিহ রহ. বলেন, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. ওয়াকিদিকে মিথ্যাবাদী বলেছেন। আরেকবার তিনি ওয়াকিদিকে অনির্ভরযোগ্য বলেছেন।
- ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর মতে ওয়াকিদির লেখা সব গ্রন্থই বানোয়াট।
- আলি ইবনে মাদিনি রহ. বলেছেন, আমার কাছে ওয়াকিদির বর্ণিত ২০ হাজার হাদিস আছে, যেগুলোর কোনো ভিত্তি নেই। ইবরাহিম ইবনে ইয়াহইয়া একজন মিথ্যাবাদী বর্ণনাকারী হলেও সে আমার কাছে ওয়াকিদি থেকে উত্তম।

৩. তৃতীয় এবং চতুর্থ বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনে সায়িব এবং হিশাম ইবনে মুহাম্মাদ সম্পর্কে অনেক সমালোচনা বর্ণিত হয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনে সায়িব বর্ণিত একটি হাদিস হচ্ছে, সে অমুক থেকে অমুকের সূত্রে শুনে বর্ণনা করেছে, রাসুল ﷺ বসে থাকতেন এবং এমতাবস্থায় তাঁর ওপর ওহি অবতীর্ণ হতো। একদিন তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন সম্পন্ন করতে যান। আলি রা. তাঁর স্থানে বসে ছিলেন। তখন জিবরাইল আ. আলি রা.-এর ওপরেই ওহি অবতীর্ণ করেন।

এ চারজন শিয়াদের নিকট অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য ইমাম। শিয়াদের রচিত গ্রন্থাবলিতে তাদের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে।

ফিতনা নিয়ে অধ্যয়নের সময় আমরা যে উৎস থেকে অধ্যয়ন করব, সে উৎসগুলো সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে নেওয়া আবশ্যক। আমরা যা বর্ণনা করছি সেগুলোর উৎস কি এসব মিথ্যুক ও জাল বর্ণনা রচয়িতাদের বর্ণনা নাকি ইলমুল জারহ ওয়াত তাদিল শাস্ত্রের আলেমগণ যাদেরকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন তাদের বর্ণনা।

এ বিষয়টি সঠিকভাবে জানার জন্য প্রয়োজন ব্যাপক চেষ্টা-সাধনা এবং নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রম।

(তবে এ বিষয়টি সহজ করণার্থে, 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর নিকট ফিতনাবিষয়ক বিশুদ্ধ হাদিসগ্রন্থ' ও 'ফিতনাবিষয়ক নির্ভরযোগ্য আরও কিছু গ্রন্থ' ভিন্ন দুটি শিরোনামে এখন উল্লেখ করা হচ্ছে)

***

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর নিকট ফিতনাবিষয়ক বিশুদ্ধ হাদিসগ্রন্থ

ফিতনাবিষয়ক সবচেয়ে বিশুদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে সিহাহ সিত্তাহ তথা প্রসিদ্ধ ছয়টি সহিহ হাদিস গ্রন্থ।[২৯]আর এ সবগুলোর মাঝে সবচেয়ে বিশুদ্ধ গ্রন্থ হলো *সহিহ বুখারি*। এটি খুবই প্রসিদ্ধ কথা। বরং পবিত্র কুরআনের পর এটিকেই সবচেয়ে বিশুদ্ধ গ্রন্থ হিসাবে আখ্যা দেওয়া হয়। জারহ এবং তাদিল শাস্ত্রবিদগণ এমনটিই বলেছেন। তারা সকলে বলেছেন, নিশ্চয় বুখারির প্রমাণ বিরোধী পক্ষের প্রমাণের চেয়ে শক্তিশালী।

ইমাম বুখারি রহ. তার গ্রন্থে দ্বিরুক্তি-সহ ৭৩৯৭টি এবং দ্বিরুক্তি ব্যতীত ২৬০২টি হাদিস চয়ন করেছেন।[৩০] এই হাদিসসমূহ তিনি নির্বাচিত করেছেন ৬০ লাখ হাদিসের মধ্য থেকে।

প্রতিটি হাদিস চয়ন করার আগে দুই রাকাত ইস্তেখারার নামাজ আদায় করে আল্লাহ তাআলার কাছে সমাধান চেয়েছেন যে, তিনি এই হাদিসটি লিখবেন নাকি লিখবেন না। তিনি একটি হাদিস শোনার জন্য মাইলের পর মাইল সফর করতেন।

---

২৯. **সিহাহ সিত্তা :** হাদিসের বিশুদ্ধ ছয়টি গ্রন্থ। এর দ্বারা *সহিহ বুখারি*, *সহিহ মুসলিম*, *আস-সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ি*, *সুনানু আবি দাউদ*, *সুনানুত তিরমিজি* এবং *সুনানু ইবনি মাজাহ*কে বুঝানো হয়েছে। এ ছয় কিতাবের মধ্যে *সহিহ বুখারি* এবং *সহিহ মুসলিম*-এর সব হাদিস সহিহ বা নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত। অবশিষ্ট চারটি গ্রন্থ সার্বিক বিবেচনায় নির্ভরযোগ্য হলেও তাতে বর্ণিত সব হাদিস নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত নয়। এ কারণে মুহাদ্দিসগণ এ ছয় গ্রন্থকে সিহাহ সিত্তার পরিবর্তে 'আল-কুতুবুস সিত্তাহ' বলাকে অধিক সমীচীন মনে করেন। উল্লেখ্য, হাদিসের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ উপরিউক্ত ছয়টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং হাদিসের আরও বহু গ্রন্থ রয়েছে। যা সার্বিক বিবেচনায় নির্ভরযোগ্য। যেমন, *সহিহ ইবনি খুযাইমা*, *সহিহ ইবনি হিব্বান*, *আল-মুনতাকা লি ইবনিল জারুদ*, *আল-আহাদিসুল মুখতারা লিজ জিয়া মাকদিসি* ইত্যাদি।-সম্পাদক

৩০. এ নিয়ে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। উল্লেখিত মতটি ইবনে হাজার আসকালানি রহ.-এর।-অনুবাদক

১৯৪ হিজরিতে তৎকালীন খোরাসানের বুখারা নামক গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আরব বংশোদ্ভূত ছিলেন না। ৬২ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন।

*সহিহ বুখারি*র পর দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে *সহিহ মুসলিম*। রাসুল ﷺ-এর হাদিস নিয়ে রচিত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ এটি। বরং কোনো কোনো আলেম এই গ্রন্থকে *বুখারি*র পর্যায়ে উন্নীত মনে করেন। কোনো কোনো আলেম *সহিহ মুসলিম* নিয়ে আরও উচ্চ মন্তব্য করেছেন। তারা বলেন, সনদ বা বর্ণনাসূত্র সংকলন এবং গঠন বিন্যাসের দিক দিয়ে *সহিহ মুসলিম*, *সহিহ বুখারি*র চেয়েও উত্তম। কিন্তু বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে *সহিহ বুখারি* এগিয়ে। এরপরই *সহিহ মুসলিম*-এর অবস্থান। কিছু হাদিসের ক্ষেত্রে ইমাম মুসলিম রহ.-এর ওপর আপত্তি করা হয়েছে। যদিও তা খুবই অল্প। যারা আপত্তি করেছেন তাদের আপত্তি যথাযথ। *সহিহ মুসলিম*-এ দ্বিরুক্তিহীন বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ৪ হাজার। যেখানে *সহিহ বুখারি*তে দ্বিরুক্তিহীন হাদিসের সংখ্যা ২৬০২টি। ইমাম মুসলিম রহ. জন্মগ্রহণ করেন পারস্যের নিশাপুরে। তিনিও আরব বংশোদ্ভূত নন। তার ইন্তেকাল হয়েছিল ৫৭ বছর বয়সে।

সহিহ মুসলিম-এর পরের অবস্থানে আছে *আস-সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ি*। ইমাম নাসায়ি রহ. খোরাসানের অন্তর্গত নাসা নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনিও আরব বংশোদ্ভূত ছিলেন না। তিনি ২১৫ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৮৮ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। ইলমুর রিজালশাস্ত্রে তিনি খুবই সূক্ষ্ম জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।

এরপরের অবস্থানে আছে *সুনানু আবি দাউদ*। এই গ্রন্থে ৪৮০০টি হাদিস রয়েছে। ইমাম আবু দাউদ রহ. আরব বংশোদ্ভূত ছিলেন। ২০২ হিজরিতে তিনি বসরায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ৭৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

এরপরের অবস্থান *সুনানুত তিরমিজি*র। এই গ্রন্থে কিছু দুর্বল হাদিসও রয়েছে। তবে এগুলোর মাননির্ণয়কৃত; ইমাম তিরমিজি রহ. তার গ্রন্থে হাদিসের বিশুদ্ধতা এবং দুর্বলতার দিক ইঙ্গিত করেছেন। তবে কিছু হাদিসের দুর্বলতার ক্ষেত্রে তিনি কোনো ইঙ্গিত প্রদান করেননি। ইলমুল জারহ ওয়াত তাদিল সম্পর্কে অভিজ্ঞ আলেমগণ এই গ্রন্থকে বিশুদ্ধ বলেছেন। ২০৯ হিজরিতে আফগানিস্তানের আমুদরিয়া নদীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অবস্থিত তিরমিজ নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ইমাম তিরমিজি রহ.। তিনি আরব

বংশীয় ছিলেন না। ইন্তেকালের সময় তার বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। ইমাম বুখারি রহ. ছিলেন ইমাম তিরমিজি রহ.-এর শিক্ষক। তা সত্ত্বেও তিনি ইমাম তিরমিজি রহ.-এর ওপর খুবই আস্থা রাখতেন এবং তার কাছ থেকে হাদিস গ্রহণ করতেন।

অতঃপর ষষ্ঠ অবস্থানে আছে *সুনানু ইবনি মাজাহ*। এ গ্রন্থের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. অন্য ইমামদের থেকে পৃথক যেসব হাদিস এনেছেন সেগুলোর অধিকাংশই দুর্বল। তবে যেসব হাদিস ইবনে মাজাহ-এর সঙ্গে অন্যান্য ইমামগণও বর্ণনা করেছেন সেগুলো ব্যতীত।

ইবনে হাজার আসকালানি রহ. বলেন, ঢালাওভাবে এ কথা বলা যাবে না। অর্থাৎ, ইমাম ইবনে মাজাহ এমন কিছু পৃথক হাদিসও এনেছেন যেগুলো দুর্বল নয়।[৩১]

ইবনে মাজাহ রহ. ২০৯ হিজরিতে কাজবিন শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনিও আরব বংশোদ্ভূত নন। লক্ষ্যণীয় যে, ছয় বিশুদ্ধ গ্রন্থের পাঁচজনই ছিলেন অনারব। সুবহানাল্লাহ! এসব অনারব অঞ্চল বিজিত করে আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের ওপর কতই-না অনুগ্রহ করেছেন। এ বিজয়ের ফলে ওই সকল মনীষীগণের মধ্যে ইসলামের আলো প্রবেশ করেছে, যারা আমাদের জন্য প্রিয় নবীজির সুন্নাহ তথা হাদিসগুলো সংরক্ষণ করেছেন।

সিহাহ সিত্তাহ তথা ছয় বিশুদ্ধ গ্রন্থের পরের অবস্থানে আছে *আল-মুসনাদ লিল ইমাম আহমাদ*। এটিই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মুসনাদ গ্রন্থ।

এখানে প্রশ্ন আসে যে, আলেমগণ *আল-মুসনাদ লিল ইমাম আহমাদকে* পূর্বের ছয় গ্রন্থের সঙ্গে কেন রাখেননি?

এর উত্তরে বলা যায় যে, সহিহ, সুনান ও মুসনাদ গ্রন্থের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সহিহ এবং সুনান গ্রন্থগুলোতে হাদিস লিখিত হয় অধ্যায় এবং বিষয়ভিত্তিক আকারে। আর মুসনাদ গ্রন্থে হাদিস লেখা হয় সাহাবিগণের নাম অনুসারে। যেমন, বলা হয়ে থাকে, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত হাদিসসমূহ, আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত হাদিসসমূহ ইত্যাদি।

আল-মুসনাদ লিল ইমাম আহমাদ-এ দ্বিরুক্তিহীন ৩০ হাজার হাদিস রয়েছে এবং দ্বিরুক্তি-সহ হাদিসের সংখ্যা ৪০ হাজার। বর্ণিত আছে, ইমাম আহমাদ

---

৩১. *তাহযিবুত তাহযিব*, ৯/৪৬৮

রহ. ৭ অথবা ১০ লক্ষ হাদিস থেকে বাছাই করে এই হাদিসগুলো সংকলন করেছেন।

আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর মৃত্যুর পর তার ছেলে আবদুল্লাহ *মুসনাদে আহমাদ*-এ কিছু হাদিস বৃদ্ধি করেন। বর্ণিত আছে, *মুসনাদে আহমাদ*-এ কোনো মওজু তথা জাল হাদিস নেই। যদি কয়েকটি থেকেও থাকে, তবে সেগুলো ইমাম আহমাদের ছেলের মাধ্যমে এসেছে।

এগুলো হলো আমাদের নিকট এবং ইলমুল জারহ ওয়াত তাদিল সম্পর্কে অভিজ্ঞ আলেমগণের কাছে পরিচিত এবং প্রসিদ্ধ নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। তাই ফিতনা সম্পর্কে অধ্যয়নের সময় এগুলোই আমাদের নির্ভরতার উৎস হওয়া উচিত। অন্য যেসব অনির্ভরযোগ্য এবং মিথ্যা ও জাল হাদিস বর্ণনার উৎস রয়েছে, সেগুলো বর্জন করা উচিত।

কেউ কেউ মনে করেন যে, আব্বাসি শাসনামলে আব্বাসি খলিফাদের নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্যে উমাইয়াদের কুৎসা রটনায় এসব মিথ্যার সয়লাব ঘটেছিল। কিন্তু এখন কেন এসব মিথ্যার মাধ্যমে ইসলামের ওপর আঘাত করা হবে? এসব কারা করবে?

বর্তমানে যারা ইসলামের ওপর আঘাত করছে তারা হচ্ছে কিছু বিকৃত মতাদর্শের অনুসারী। তাদের প্রত্যেকেই নিজস্ব দলের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ইসলামের ওপর আঘাত করছে। তাদের ভ্রান্ত এবং বিকৃত মতের সমর্থনে দুর্বল এবং জাল হাদিস বর্ণনা করছে।

ওরিয়েন্টালিস্ট তথা প্রাচ্যবিদরা যখন সব ইসলামি ঐতিহাসিক গ্রন্থের সমালোচনা শুরু করে, তখন এসব বানোয়াট ও জাল হাদিসের বিশাল ভান্ডার তাদের হস্তগত হয়। তারা বিভিন্ন ভাষায় এসব বানোয়াট হাদিস বর্ণনা করে ছড়িয়ে দেয়। তারা প্রচার করে যে, ইসলাম যুদ্ধের মাধ্যমে বিস্তৃতি লাভ করেছে। তাই কোনো মুসলিম যখন ক্ষমতার অধিকারী হয়, তখন তারা অন্যের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ফিতনাসংক্রান্ত ঘটনাকে তারা এসব মিথ্যা বর্ণনা এবং দাবির সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছে।

এ ছাড়াও পশ্চিমাদের মদদপুষ্ট অক্সিডেন্টালিস্ট তথা পাশ্চাত্যবিদরা নিজ নিজ দেশে ইসলামের ওপর আঘাত হানতে শুরু করে। এরা মুসলিম নাম ধারণ করে মুসলিম সমাজে বসবাস করলেও এবং কখনো নামাজ-রোজা

পালন করলেও ইসলামের ওপর কঠিন আঘাত হানতে এরা কোনোরূপ কুণ্ঠাবোধ করে না।

এদের একজন হচ্ছে তহা হুসাইন। একদিক দিয়ে তিনি খুবই প্রসিদ্ধ। তাকে বলা হয়ে থাকে আরবি সাহিত্যের খুঁটি। তিনি আরবি সাহিত্যিক হলেও ইসলামের একজন ঘোরতর শত্রু। তার রচিত সব গ্রন্থেই ইসলামের ওপর আঘাতমূলক বক্তব্য রয়েছে। তিনি তার ছাত্রদের কুরআনের সমালোচনা শেখাত। এভাবে বলত যে, এসব আয়াতের ভিত্তি মজবুত এবং ওই সব আয়াতের ভিত্তি দুর্বল (নাউজুবিল্লাহ)।

সে কুরআনের অপব্যাখ্যা করে বলে যে, কুরআনে ইবরাহিম আ. এবং ইসমাইল আ.-এর ঘটনা বর্ণিত হওয়ার অর্থ এই নয় যে, এ ঘটনা বাস্তব। কখনো কখনো কুরআনে গল্পের মতো বর্ণনাও এসেছে। এগুলো বাস্তব হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট দলিল-প্রমাণ বিদ্যমান থাকা জরুরি।

এমনইভাবে তহা হুসাইন তার গ্রন্থাবলিতে অনেক সাহাবিগণের সমালোচনা করেছে। এতটাই সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে যে, অবশেষে *আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়* থেকে তাকে কাফের এবং মুরতাদ ফতোয়া দেওয়া হয়। তখন সে *আল-আজহারের* লিটারেচার তথা সাহিত্য অনুষদের অধ্যাপক ছিল। এরপর সবাই মনে করেছিল, সে তওবা করে আল্লাহর পথে ফিরে এসেছে। *আল-আজহারের* আলেমগণের নৈকট্যলাভের জন্য সে নতুন একটি গ্রন্থ রচনা করে। এই গ্রন্থটিকে বাহ্যিকভাবে ইসলামের পক্ষে মনে হলেও, অন্তর্নিহিতভাবে এতেও ইসলামের ওপর আঘাত করা হয়েছে এবং বানোয়াট বর্ণনার সমাবেশ ঘটানো হয়েছে।

তহা হুসাইনের সামসময়িক অনেক ব্যক্তি যারা ফ্রান্স, ইংল্যান্ড প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশে পড়ালেখা করেছে, তারাও একই কাজ করেছে।

এই বিষয়ে আবদুর রহমান শারকাবি রচিত গ্রন্থাবলিও বিপজ্জনক। এসব গ্রন্থাবলি থেকে যারা ফিতনা সম্পর্কে অধ্যয়ন করবেন তারা দেখতে পাবেন যে, কোনো যাচাই-বাছাই না করেই এসব গ্রন্থে সকল সাহাবিগণকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে।

এমনইভাবে খালিদ মুহাম্মাদ খালিদ রচিত *রিজালুন হাওলার রাসুল* এবং *খোলাফাউর রাসুল* গ্রন্থদুটিতেও আলি রা.-এর বিরুদ্ধে মুআবিয়া রা.-এর পক্ষাবলম্বনকারী সাহাবিগণের সমালোচনা করা হয়েছে। ভ্রান্ত ও মিথ্যা

ঘটনার সূত্র তুলে ধরে সে প্রখ্যাত সাহাবি আবু মুসা আশআরি রা.-এর সমালোচনাও করেছে।

সাহাবিগণের সমালোচনাকারীদের মধ্যে অন্যতম হলো *লেবানন ইউনিভার্সিটির* সাহিত্য ও মানব বিজ্ঞান বিভাগের সাবেক ডিন ড. জাহিয়া কাদুরা। সে তার *আয়েশা : উম্মুল মুমিনিন* গ্রন্থে এ ধরনের ঘৃণ্য পন্থার আশ্রয় নিয়েছে। তার এই গ্রন্থে যে ঘৃণা ছড়ানো হয়েছে, তা পড়ে আমার বমি আসার উপক্রম হয়েছিল।

সে তার গ্রন্থে লিখেছে, আলি রা. এবং আয়েশা রা.-এর মধ্যকার বিরোধের মূল কারণ হলো রাসুল ﷺ কর্তৃক আয়েশা রা.-কে বিয়ে করা। আয়েশা রা. ছিলেন রাসুল ﷺ-এর কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয়। তাই ফাতেমা রা. তার প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়ে তাকে অপছন্দ করতেন। তিনি আলি রা.-কে এ বিষয়টি বললে তিনিও আয়েশা রা.-কে অপছন্দ করতে থাকেন। এ ব্যাপারটিই আলি রা.-কে আয়েশা রা.-এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে উদ্‌বুদ্ধ করেছে।

এদিকে রাসুল ﷺ ফাতেমা রা.-কেও ভালোবাসতেন। এ দেখে আয়েশা রা.-ও তার প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়েছিলেন।

সে আরও বলে যে, আয়েশা রা.-এর ওপর অপবাদ আরোপের সময় তার ওপর যেসব সাহাবি অপবাদ আরোপ করেছিলেন, তাদের মধ্যে আলি রা.-ও ছিলেন। তাই আয়েশা রা. তাকে অপছন্দ করতেন এবং এটিই তাকে আলি রা.-এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে উদ্‌বুদ্ধ করেছে।

এই লেখিকা আরও বলেছে যে, আয়েশা রা.-এর ওপর অপবাদ আরোপের সময় আলি রা. ও ফাতেমা রা. আয়েশা রা.-কে নিয়ে উল্লাস প্রকাশ করেছিলেন। এর পর নিষ্পাপ প্রমাণিত হওয়ার পর আয়েশা রা. এ নিয়ে তাদের সঙ্গে বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়েছিলেন।

এমনইভাবে তার আরেকটি জঘন্য মন্তব্য হলো যে, উসমান রা.-এর শাহাদাতের পর আলি রা. খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার কারণে আয়েশা রা. আলি রা.-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। আয়েশা রা. চেয়েছিলেন সগোত্রীয় তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রা. খলিফা হোক।

এই লেখিকার দৃষ্টিতে তৎকালীন মুসলিম সমাজ বর্তমান সময়ের মুসলিম সমাজের তুলনায় অধিক অধঃপতনের শিকার ছিল।

এই লেখিকার সব আলোচনার রেফারেন্স এবং উৎস শিয়াদের রচিত। জানি না সে এসব জেনেই লিখেছে নাকি না জেনে লিখেছে! যদি না জেনে লিখে থাকে তবে এটিও বিপজ্জনক। আর যদি জেনে লিখে থাকে তবে এটি আরও বেশি বিপজ্জনক।

এই লেখিকা আরও লিখেছে যে, আয়েশা রা. এবং আলি রা.-এর মধ্যকার এই বিদ্বেষ এবং পারস্পরিক অপছন্দের ফলেই তাদের মধ্যে জঙ্গে জামাল সংঘটিত হয়েছে। লেখিকার বক্তব্য অনুযায়ী তাদের এই পারস্পরিক অপছন্দের কারণেই এসব সাহাবিগণের পবিত্র রক্ত বিনষ্ট হয়েছে।

এই ভ্রান্ত লেখিকার বক্তব্য অনুযায়ী আয়েশা রা. উসমান রা.-এর ওপরও প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন। ফলে লোকেরা তার আহ্বানে সাড়া দেয়। তখন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. উসমান রা.-এর পক্ষে প্রতিরোধ গড়ার জন্য মদিনায় থেকে যান। অথচ তিনি ছিলেন সে বছরের হজের আমির। তখন আয়েশা রা. তাকে বলেছিলেন, হে আবদুল্লাহ, এই শহরে থেকো না। এই পথভ্রষ্ট লোকের পক্ষে লোকদের নিবৃত্ত রেখো না।

এসব অক্সিডেন্টালিস্ট তথা পাশ্চাত্যবিদরা এভাবেই তাদের মিথ্যা এবং বাতিল চিন্তাধারা ছড়িয়েছে। এভাবেই তারা মুসলিম উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সন্তান সাহাবিগণের ওপর অপবাদ আরোপ করার চেষ্টা চালিয়েছে।

***

সাহাবিগণের পরিচয়

এখানে সাহাবিগণের পরিচয় তুলে ধরাও প্রয়োজন মনে করছি। যেন আমরা যাদের নিয়ে কথা বলছি, তাদের মর্যাদা সম্পর্কে সম্যক অবগত থাকতে পারি।

সাহাবি হলেন প্রত্যেক এমন ব্যক্তি, যিনি রাসুল ﷺ-এর ওপর ঈমান এনেছেন। তাঁকে স্বচক্ষে দেখেছেন, জীবনে একবার হলেও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন এবং ঈমানের ওপর মৃত্যুবরণ করেছেন। আশআস ইবনে কায়স রা.-এর মতো যারা ইসলাম গ্রহণ করার পর মুরতাদ হয়ে পুনরায় ইসলামে ফিরে এসেছেন, তারাও এ সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবেন।

বিশুদ্ধতম মতানুযায়ী সাহাবিগণের সংখ্যা হলো ১ লক্ষ ১৪ হাজার।[৩২]

আর তাবেয়ি হলেন, যারা রাসুল ﷺ-এর ওপর ঈমান এনেছেন, সাহাবিগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন এবং তাদের কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেছেন। তাবেয়িগণের কয়েকটি স্তর রয়েছে। সর্বোচ্চ স্তরে আছেন সাইদ ইবনে মুসাইয়িব রহ. প্রমুখ। কারণ, তাদের অধিকাংশ বর্ণনা সরাসরি সাহাবিগণের থেকে। মধ্যম স্তরে আছেন ইকরিমা রহ., কাতাদা রহ., উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. এবং হাসান বসরি রহ. প্রমুখ। এরপর হলেন সর্বনিম্ন স্তরের তাবেয়িগণ। তারা সাহাবিগণ থেকে খুব কমই হাদিস বর্ণনা করেছেন।

মুখাদরাম নামেও একশ্রেণির তাবেয়ি রয়েছেন, যারা রাসুল ﷺ-এর জীবদ্দশায় তাঁর ওপর ঈমান এনেছেন, কিন্তু তাঁকে স্বচক্ষে দেখতে পারেননি। যেমন, নাজ্জাশি প্রমুখ।

জারহ ওয়াত তাদিলশাস্ত্রবিদ আলেমগণের ঐকমত্য অনুযায়ী সকল সাহাববিগণ ন্যায়পরায়ণ এবং তারা যা বলেন তা-ই সত্য। কখনো কখনো এতে ভুল হয়ে গেলেও তা মিথ্যা, খেয়ানত এবং সত্য গোপন হিসাবে গণ্য হবে না।[৩৩]

আলেমগণ বলেছেন, সাহাবিগণের নাম, পরিচয় অজ্ঞাত থাকা ক্ষতিকর নয়।[৩৪] অর্থাৎ, আপনি যখন জানতে পারবেন যে, অমুক ব্যক্তি সাহাবি ছিলেন;

---

৩২. *আল-জামি লিল খতিব*, ২/২৯৩

৩৩. *আল-ইসতিয়াব*, ১/৩; *আল-ইসাবা*, ১/১০; *আত-তাকরিব ওয়াত তাইসির*, পৃ. ৯২

এ ছাড়া তার সম্পর্কে আর কিছুই জানেন না। শুধু জানেন, তিনি রাসুলের সান্নিধ্য পেয়েছেন। তবেই তিনি যা বলবেন তাই বিশুদ্ধ গণ্য হবে। এতে কোনো মিথ্যার আশঙ্কা নেই। সাহাবিগণের ব্যাপারে এটিই আমাদের নীতি।

তাই কোনো সাহাবির সমালোচনা করা জায়েজ নেই। যখন কোনো সাহাবি এমন কোনো কাজ করেন, যে কাজে দুই ধরনের উদ্দেশ্য থাকার সম্ভাবনা থাকে, তখন কাজটিকে উত্তম উদ্দেশ্যেই বিবেচনা করা হবে। প্রতিটি মুসলিমের ক্ষেত্রেই সুধারণা রাখা প্রয়োজন। তাই সাহাবিগণের ওপর সর্বাগ্রে সুধারণা রাখতে হবে।

কোনো সাহাবির ভুল প্রকাশিত হলে আমরা বলব যে, তিনি এখানে ইজতেহাদ[৩৫] করেছেন ও ইজতেহাদে ভুল করেছেন। তাই এতেও তিনি সওয়াব পাবেন।

কয়েকজন সাহাবির খুব বেশি সমালোচনা করা হয়েছে। মুআবিয়া রা. হলেন তাদের একজন। অথচ রাসুল ﷺ তার সম্পর্কে বলেছেন,

> হে আল্লাহ, আপনি তাকে সুপথপ্রাপ্ত এবং সুপথ প্রদর্শনকারী হিসাবে কবুল করুন।[৩৬]

যারা মুআবিয়া রা.-এর সমালোচনা করে, তারা সারা জীবন নেক আমল করলেও তাদের আমল মুআবিয়া রা.-এর এক বছর কিংবা আরও কম সময়ের নেক আমলের সমানও হবে না। আল্লাহ তাআলা তার হাতে অনেক জাতিকে সুপথ দেখিয়েছেন।

তবে শিয়াদের আকিদা এবং তাদের জাল হাদিস রচনার প্রতি ঘৃণাপোষণ যেন আমাদেরকে আলি রা., হাসান রা., হুসাইন রা., ফাতেমা রা. এবং সম্মানিত আহলে বাইতের[৩৭] কারও মর্যাদাহানিতে প্ররোচিত না করে। নিশ্চয় ইসলামে তাদের বিরাট মর্যাদা রয়েছে। কিন্তু এতে কোনো বাড়াবাড়ি অথবা ছাড়াছাড়ির সুযোগ নেই।

---

৩৪. *আল-বাদরুল মুনির লি ইবনিল মুলাক্কিন*, ২/২৪০

৩৫. **ইজতেহাদ :** কুরআন ও সুন্নাহয় যে সমাধান সুস্পষ্টভাবে দেওয়া হয়নি বা যে সমাধান উল্লেখ করা হয়নি, এমন ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহর অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাহ গবেষণা করে সমাধান দেওয়াকে ইজতেহাদ বলা হয়।-সম্পাদক

৩৬. *সুনানুত তিরমিজি*, ৩৮৪২; *আল-মুসনাদ লিল ইমাম আহমাদ*, ১৭৮৯৫

৩৭. **আহলে বাইত :** রাসুল ﷺ-এর পরিবার, বংশধর ও তাদের মুক্ত দাসগণকে আহলে বাইত বলা হয়।-সম্পাদক

ফিতনাবিষয়ক নির্ভরযোগ্য আরও কিছু গ্রন্থ

ফিতনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এমন কিছু নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ নিম্নে উল্লেখ করা হলো—

১. কাজি আবু বকর ইবনুল আরাবি রহ. রচিত *আল-আওয়াসিম মিনাল কাওয়াসিম*। সাহাবিগণের সমালোচকদের জবাবে লিখিত উৎকৃষ্ট গ্রন্থাবলির মধ্যে এটি অন্যতম। তবে এটিকে যেন *আল-আওয়াসিম ওয়াল কাওয়াসিম* গ্রন্থ মনে না করা হয়। সেটি ভিন্ন গ্রন্থ।

কাজি আবু বকর ইবনুল আরাবি পঞ্চম হিজরি শতাব্দীর শেষভাগে আন্দালুসের ইশবেলিয়া তথা বর্তমান স্পেনের সেভিলায় জন্মগ্রহণ করেন। পাঁচ বছর বয়সেই তিনি কুরআন হিফজ সমাপ্ত করেন। ১৬ বছর বয়সে কুরআনের ১০ কেরাত আয়ত্ব করেন। এরপর ইলম অন্বেষণের উদ্দেশ্যে একের পর এক অঞ্চল ভ্রমণ করতে থাকেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি আলজেরিয়া, মিশর, হিজায, শাম এবং ফিলিস্তিন প্রভৃতি অঞ্চলে সফর করেন। এই সময়ে তিনি অনেক প্রসিদ্ধ আলেমগণের সান্নিধ্য লাভ করেন এবং তাদের কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেন। এরপর রচনা এবং লেখালেখিতে মনোযোগী হওয়ার জন্য ফিরে আসেন জন্মভূমিতে। ৩৫টিরও বেশি গ্রন্থ তার হাতে রচিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি তাফসিরুল কুরআন বিষয়ে লিখিত *আনওয়ারুল ফজর ফি তাফসিরিল কুরআন*। এটি ছিল ১ লক্ষ ৬০ হাজার পৃষ্ঠায় লিখিত। এই গ্রন্থটি বহন করা হতো উটের পিঠে করে। পঞ্চম হিজরি শতাব্দীর একেবারে শেষদিকে তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেন। একাধিক স্থানে এই গ্রন্থকে সংরক্ষণ করা হয়েছিল। অবশেষে অষ্টম হিজরিতে এই অমূল্য গ্রন্থটি বাদশাহর হস্তগত হয়। এরপর গ্রন্থটির আর কোনো হদিস পাওয়া যায়নি। কাজি আবু বকর ইবনুল আরাবি দীর্ঘ ২০ বছর সময় নিয়ে এই গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। তার লিখিত সবচেয়ে চমৎকার গ্রন্থগুলোর একটি হচ্ছে *আল-আওয়াসিম মিনাল কাওয়াসিম* গ্রন্থটি। সামসময়িক প্রসিদ্ধ আলেম মুহিব্বুদ্দিন আল-খতিব রহ. এই গ্রন্থে টীকা সংযোজন করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থের সঙ্গে তিনি আরও অনেক মূল্যবান আলোচনা সংযোজন করেছেন। যা পাঠকদের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে তুলবে।

২. ইবনে তাইমিয়া রহ. রচিত *মিনহাজুস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যা*। প্রকৃতপক্ষেই তিনি শাইখুল ইসলাম উপাধির উপযুক্ত। তিনি ছিলেন বিদআতিদের বিরুদ্ধে সুন্নাহর উন্মুক্ত তরবারি। শিয়া ও কদরিয়্যা[৩৮] আকিদা এবং ফিতনার ঘটনাবলি নিয়ে যারা জানতে চায়, তাদের জন্য এই গ্রন্থের বিকল্প নেই। গ্রন্থটি চার খণ্ডে লিখিত। সাহাবিগণের ওপর আরোপিত প্রশ্ন এবং অপবাদের জবাবে তিনি গ্রন্থটিতে মানতেক তথা তর্কশাস্ত্র এবং যুক্তির ব্যবহারও করেছেন।

৩. আল্লামা ইবনে কাসির রহ. রচিত *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*। এটিকে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য এবং উত্তম গ্রন্থসমূহের একটি বিবেচনা করা হয়। প্রত্যেক মুসলিমের জন্যই *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* সংগ্রহে রাখা উচিত। তবে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, ইবনে কাসির রহ. কিছু কিছু স্থানে ওয়াকিদি থেকে বর্ণনা করেছেন। এসব বর্ণনা নির্ভরযোগ্য নয়। তবে ইবনে কাসির রহ. বর্ণিত অনেক গ্রহণযোগ্য বর্ণনাও রয়েছে। তিনি ইমাম তবারি রহ. প্রণীত *তারিখুল উমামি ওয়াল মুলুক* থেকেও অনেক বর্ণনা এনেছেন।

৪. ইহসান ইলাহি জহির রচিত *আশ-শিয়াতু ওয়াত তাশাইয়ু*। এটি শিয়া এবং তাদের পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোকপাতকারী সবচেয়ে সুন্দর গ্রন্থের একটি। সাম্প্রতিক সময়ে রহস্যজনকভাবে লেখককে হত্যা করা হয়েছে। তার রচিত এই গ্রন্থটি শিয়া এবং শিয়া মতাদর্শ সম্পর্কে রচিত সর্বোত্তম গ্রন্থগুলোর একটি।

৫. আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতি রহ. রচিত *তারিখুল খুলাফা*। এ গ্রন্থে প্রত্যেক খলিফার ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। যদিও ফিতনাসংক্রান্ত ঘটনার বর্ণনায় তিনি খুব বেশি সতর্কতা অবলম্বন করেননি। ইমাম সুয়ুতি ৯১১ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

৬. মোস্তফা নাজিব রচিত *হুমাতুল ইসলাম*। এটি সংক্ষিপ্ত হলেও খুবই মূল্যবান একটি গ্রন্থ। এ গ্রন্থের অধিকাংশই নির্ভরযোগ্য। গ্রন্থটির বিভিন্ন স্থানে লেখকের পক্ষ থেকে যে টীকা যুক্ত করা হয়েছে তাও খুব চমৎকার।

৭. আল্লামা ইবনে কাসির রহ. রচিত *ইসতিশহাদুল হুসাইন*।

---

৩৮. **কদরিয়্যা :** তাকদিরকে অস্বীকারকারী একটি কাফের দল। তাদের দাবি হলো, যেকোনো ঘটনা ঘটার পূর্বে আল্লাহ তাআলা সে সম্পর্কে জানেন না। নাউজুবিল্লাহ। এ দলটির উৎপত্তি হয় হিজরি প্রথম শতাব্দীতে। *তুহফাতুল আহওয়াযি*, ৬/৩০৩ (শামেলা)-সম্পাদক

৮. শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. রচিত *রাঅসুল হুসাইন*।

৯. নাসিরুদ্দিন শাহ রচিত *আল-আকাইদুশ শিইয়্যা*।

১০. সাইদ ইসমাইল রচিত *হাকিকতুল খিলাফ বাইনা উলামায়িশ শিয়া ওয়া জুমহুরি উলামায়িল মুসলিমিন*।

১১. আল্লামা মুহিব্বুদ্দিন আল-খতিব রহ. রচিত *আল-উসুসুল্লাতি কামা আলাইহা দ্বীনুশ শিয়াতিল ইমামিয়্যাতিল ইসনা আশারিয়্যা*।

আল্লামা মুহিব্বুদ্দিন আল-খতিব রহ. তার জীবনের উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যয় করেছেন শিয়া এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর মধ্যে সামঞ্জস্যতার দাবিদারদের অপনোদন এবং তাদের নিয়ে গবেষণা করে। তিনি বলেন, আহলুস সুন্নাহ এবং শিয়াদের মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য নেই। শিয়া মতবাদ ইসলাম ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। শিয়াদের গ্রন্থসমূহে তাদের আকিদাগুলো অধ্যয়ন করলে এ বিষয়টি পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে যাবে।

এই আকিদাগুলো আমাদের ভালোভাবে বোঝা এবং আয়ত্ব করা উচিত। ফিতনাসংক্রান্ত এই স্পর্শকাতর বিষয়ে অধ্যয়ন করার সময় আমরা যেসব গ্রন্থ অধ্যয়ন করব, কিছুতেই কোনো লেখককে ত্রুটিমুক্ত মনে করব না। কারণ, শিয়ারা লোকদের বুঝাতে চায় যে, কেবল আবু বকর রা. এবং উমর রা.-এর সময়েই ইসলামি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল। এরপর ইসলামি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি। তাদের দাবি অনুযায়ী এরপর থেকে ইসলাম রক্তারক্তি এবং হানাহানির মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছে। তাই ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার কোনো প্রয়োজন নেই। নয়তো আমাদের পরিণতি, তাদের পরিণতির মতোই হবে। তাদের দাবি অনুযায়ী, রাসুল ﷺ থেকে সরাসরি দীক্ষা গ্রহণকারী সাহাবিগণই যদি এমন সব অন্যায়কর্ম করে থাকেন, তাহলে অন্যরা কী করবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই কথাটি প্রতিষ্ঠিত করাই তাদের মূল লক্ষ্য। এ উদ্দেশ্যেই তারা এসব বানোয়াট এবং মিথ্যা বর্ণনা ছড়িয়ে থাকে।

অতএব, ফিতনাসংক্রান্ত ঘটনা পাঠ করার সময় আপনার জন্য উচিত হবে এ ঘটনা উল্লেখকারী উৎস এবং রেফারেন্সগুলো খতিয়ে দেখা এবং সেগুলোর বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতা যাচাই করে নেওয়া।

দুই নুরের অধিকারী উসমান ইবনে আফফান রা.

ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, ফিতনার ঘটনা অধ্যয়ন দ্বারা আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে সাহাবিগণের ওপর আরোপিত অপবাদ এবং আপত্তিসমূহের জবাব দেওয়া। এটি একটি মর্যাদাপূর্ণ কাজ। আমরা রাসুল ﷺ-এর সাহাবি জাবের রা.-এর হাদিসও উল্লেখ করেছি। তিনি বলেন, রাসুল ﷺ বলেছেন,

> যখন এ উম্মতের শেষাংশ প্রথমাংশের (সাহাবিগণের) ওপর (তাদের মর্যাদা সম্পর্কে অজ্ঞতাবশত) অভিসম্পাত করবে, তখন যারা এ বিষয়ে (তাদের মর্যাদার বিষয়ে) জানে তারা যেন তাদের জ্ঞান প্রকাশ করে। নয়তো এই জ্ঞান গোপন করার কারণে মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর অবতীর্ণ জ্ঞানকে গোপন করার সমতুল্য অপরাধ হবে।[৩৯]

আমরা এ কথার কারণও উল্লেখ করেছি। নিশ্চয় ওই সকল সাহাবিগণ আমাদের কাছে রাসুল ﷺ থেকে কুরআন ও সুন্নাহ বর্ণনা করেছেন। তাই তাদেরকে যদি কাফের, ফাসেক, মিথ্যাবাদী অথবা খেয়ানতকারী বলা হয় এবং যারা এ সম্পর্কে জ্ঞান রাখে তারা চুপ থাকে, তাহলে এর অর্থ এই দাঁড়াবে যে, আমাদের কাছে তাদের বর্ণিত যা-কিছু আছে সেগুলো নির্ভরযোগ্য নয়, গ্রহণযোগ্যও নয়। এতে পুরো দ্বীনই ধ্বংস হয়ে যাবে এবং রাসুল ﷺ-এর ওপর যে জ্ঞান অবতীর্ণ করা হয়েছে তা গোপন করা হবে।

তাই এ ক্ষেত্রে আমাদের উচিত, সকল সাহাবির ন্যায়পরায়ণতা জোর দিয়ে প্রমাণ করা। কোনো অবস্থায়ই তাদের ওপর আরোপিত কোনো অপবাদ মেনে নেওয়া যাবে না। যদি তারা কোনো কথায় ভুলও করে ফেলেন তাহলে আমরা বলব যে, তিনি ইজতেহাদের ক্ষেত্রে ভুল করেছেন। এতেও তিনি সওয়াব পাবেন। আর তাদের যেসব বর্ণনার সূত্র বিশুদ্ধ সেগুলো সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য।

আল্লাহ তাআলা রাসুল ﷺ ও তাঁর জাতিকে সম্বোধন করে বলেন,

---

৩৯. *আল-মুজামুল আওসাত লিত তবারানি*, ৪৩০

﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾

তোমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি, তোমাদের আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে মানবজাতির কল্যাণের জন্য। [সুরা আলে ইমরান : ১১০]

তিনি আরও বলেন,

﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾

এভাবেই আমি তোমাদের বানিয়েছি মধ্যপন্থী জাতি।

[সুরা বাকারা : ১৪৩]

আরও বলেন,

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾

আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের নিচে আপনার কাছে বাইআত গ্রহণ করছিল। আল্লাহ অবগত ছিলেন সে সম্পর্কে যা তাদের অন্তরে ছিল। তাই তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি অবতীর্ণ করেছেন এবং তাদেরকে পুরস্কারস্বরূপ দিয়েছেন আসন্ন বিজয়। [সুরা ফাতহ : ১৮]

আয়াতে উল্লেখিত বাইআতে (বাইআতে রিদওয়ানে) অংশগ্রহণকারী অনেক সাহাবির ওপরও অপবাদ আরোপ করা হয়েছে। শিয়ারা তাদের শুধু ফাসেক বলেই থেমে যায়নি, বরং কাফেরও আখ্যা দিয়েছে। আমরা এ থেকে আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

অগ্রগামী মুহাজির ও আনসারগণ এবং তাদেরকে যারা নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও

আল্লাহ তাআলার প্রতি সন্তুষ্ট। তাদের জন্য আল্লাহ তাআলা প্রস্তুত করেছেন জান্নাত। যার তলদেশ দিয়ে বয়ে যায় প্রস্রবণধারা। তারা সেখানে হবে চিরস্থায়ী। এটিই বিরাট সফলতা। [সুরা তাওবা : ১০০]

তিনি আরও বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾

হে নবী, আপনার জন্য আল্লাহ তাআলা এবং যে-সকল মুমিন আপনার অনুসরণ করেছে তারাই যথেষ্ট। [সুরা আনফাল : ৬৪]

আরও বলেন,

﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾

এই ধনসম্পদ ওই সকল মুহাজির দরিদ্র ব্যক্তিদের জন্য, যাদেরকে নিজ ভিটেমাটি এবং সম্পদ থেকে উৎখাত করা হয়েছে। যারা আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ এবং সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে সাহায্য করেন, তারাই প্রকৃত সত্যবাদী। [সুরা হাশর : ৮]

আরও বলেন,

﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ۚ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾

তোমরা কেন আল্লাহ তাআলার পথে ব্যয় করছ না? অথচ আসমান এবং জমিনের সব মিরাস তাঁরই। তোমাদের মধ্যে যারা (মক্কা) বিজয়ের পূর্বে দান করেছে এবং জিহাদ করেছে তারা পরবর্তীদের সমান নয়। (মক্কা) বিজয়ের পর যারা দান করেছে এবং জিহাদ করেছে তাদের তুলনায় (মক্কা) বিজয়ের আগে যারা দান করেছে এবং জিহাদ করেছে তারা অধিক মর্যাদাবান। তবে আল্লাহ তাআলা তাদের প্রত্যেককেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা সম্যক অবগত। [সুরা হাদিদ : ১০]

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. প্রিয় রাসুল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন,

> সর্বোত্তম জাতি হচ্ছে আমার সময়কার লোকেরা, এরপর তাদের পরবর্তীগণ। এরপর তাদের পরবর্তী সময়ে যারা আসবে তারা। এই তিন সময়ের পর এমন কিছু লোকের আবির্ভাব হবে, যারা সাক্ষ্য দেওয়ার পূর্বেই শপথ করে নেবে এবং সাক্ষ্য দিতে বলার আগেই সাক্ষ্য দিয়ে বসবে।[৪০]

হাদিসটি আবু হুরাইরা রা. এবং ইমরান ইবনে হুসাইন রা. থেকেও বর্ণিত হয়েছে। এ হাদিসটি *সহিহ বুখারি* ও *সহিহ মুসলিম* উভয় গ্রন্থেই উল্লেখ করা হয়েছে।

আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেছেন,

> তোমরা আমার সাহাবিগণকে গালি দিয়ো না। তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও ব্যয় করে ফেলে, তবুও তাদের এক মুদ[৪১] অথবা অর্ধেক মুদের সমান হবে না।[৪২]

কিন্তু শিয়া আলেমদের মত হলো যে, প্রথম তিন খলিফা রাসুল ﷺ-এর সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন। মাহদি আসকারি তার গ্রন্থে এমনটিই ব্যক্ত করেছে। এদিকে গণপ্রজাতন্ত্রী ইরানের ইসলামবিষয়ক মন্ত্রণালয় একটি নতুন পুস্তিকা প্রকাশ করেছে। যাতে সকল সাহাবিগণকে নিম্নোক্ত তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে।

প্রথম শ্রেণি :

যাদের প্রতি আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হয়েছেন। মূলত যাদের প্রতি শিয়া আলেমগণ সন্তুষ্ট এখানে তাদের কথা বলা হচ্ছে। মাত্র পাঁচজন সাহাবিকে তারা এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করেছে। তারা হলেন, আলি ইবনে আবু তালেব রা., আম্মার ইবনে ইয়াসির রা., মিকদাদ ইবনে আমর রা., আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এবং সালমান ফারসি রা.।

দ্বিতীয় শ্রেণি :

উক্ত পুস্তিকার বক্তব্য মতে তারা সবচেয়ে নিকৃষ্ট জাতি এবং তারা অবাধ্যদের অনুসরণে জীবন বিসর্জন দিয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-কে তাদের একজন বলা হয়েছে।

---

৪০. *সহিহ মুসলিম*, ২৫৩৩; *আস-সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ি*, ১১৭৫০; *সহিহ ইবনি হিব্বান*, ৭২২৩; *সহিহ বুখারি*, ২৬৫২

৪১. মুদ : একটি পরিমাপের নাম। এক মুদ = ৮১৭.৬৫ গ্রাম।

৪২. *সহিহ বুখারি*, ৩৬৭৩; *সহিহ মুসলিম*, ২৫৪১

তৃতীয় শ্রেণি :

পুস্তিকার বক্তব্য মতে এই শ্রেণির সাহাবিগণ তাদের মর্যাদা বিকিয়ে দিয়েছেন। তাদের প্রতিটি হাদিসকে তারা দিনারের বিনিময়ে বিক্রি করেছেন। তাদের এই মত থেকে আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় চাইছি। আবু হুরাইরা রা. এবং আবু মুসা আশআরি রা. প্রমুখ সাহাবিকেও তারা এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করেছে।

আমরা জানি, আবু হুরাইরা রা. হলেন সবচেয়ে বেশি হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবি। যদি তিনি কয়েকটি দিরহামের বিনিময়ে ধর্ম বিক্রি করে থাকেন, তবে তাদের দাবি অনুযায়ী তার বর্ণিত সব হাদিসই বাতিল হয়ে যাবে। এমনইভাবে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. একাই বর্ণনা করেছেন ৪ হাজার হাদিস। তার হাদিসগুলোও তাদের মতে গ্রহণযোগ্য নয়। দেখা যাচ্ছে, ব্যাপারটি খুবই বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা.-কে তারা বলে বেপরোয়া। উসমান রা.-কে বলে সামাজিক প্রতিপত্তিশালী। আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা.-কে বলে সম্পদের পূজারি। সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা.-কে বলে তাকওয়াহীন।

অথচ উসমান রা., আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. এবং সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা. হলেন রাসুল ﷺ-এর মুখে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ১০জন সাহাবির অন্তর্ভুক্ত। তাহলে তারা কাদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে? সাহাবিগণকে নাকি রাসুল ﷺ-কে?

খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা.-কে আমরা সাইফুল্লাহ তথা আল্লাহ তাআলার উন্মুক্ত তরবারি বলে জানি।

শিয়া নেতা খোমেনি তার *কাশফুল আসরার* গ্রন্থে লিখেছেন, আবু বকর রা., উমর রা. এবং উসমান রা. রাসুল ﷺ-এর খলিফা ছিলেন না। বরং আরও আগবাড়িয়ে তিনি লেখেন, তারা আল্লাহ তাআলার বিধানে পরিবর্তন সাধন করেছে। হারামকে হালাল করেছে। রাসুল ﷺ-এর বংশধরগণের ওপর অত্যাচার করেছে এবং ঐশী নিয়মকানুন ও ধর্মীয় বিধান সম্পর্কে তারা ছিল অজ্ঞ।[৪৩]

এই হলো সাহাবিগণকে নিয়ে তাদের মিথ্যা রটনার সমুদ্র থেকে সামান্য কয়েক ফোঁটা।

---

৪৩. *কাশফুল আসরার*, পৃ. ১২০-১২৫

সাহাবিগণের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর আলেমগণের বক্তব্য

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন, যখন তুমি কাউকে দেখো সে সাহাবিগণ সম্পর্কে মন্দ কথা বলছে, তবে মনে করো তার ইসলাম গ্রহণ মিথ্যা।[৪৪]

ইসহাক ইবনে রাহওইয়াহ রহ. বলেন, সাহাবিগণকে যে গালি দেয় তাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হবে এবং বন্দি করা হবে।[৪৫]

ইমাম মালেক রহ. বলেন, যে ব্যক্তি রাসুল ﷺ-কে গালি দেয় তাকে কুফরির কারণে হত্যা করা হবে। আর যে সাহাবিগণকে গালি দেয় তাকে সমুচিত শাস্তি দেওয়া হবে।[৪৬]

কাজি আবু ইয়ালা রহ. বলেন, সাহাবিগণকে গালমন্দ করার ব্যাপারে ফকিহগণের ঐক্যবদ্ধ মত হচ্ছে, যদি কেউ এ কাজকে বৈধ মনে করে তবে সে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে। যদি বৈধ মনে না করে গালমন্দ করে তবে সে ফাসেক হয়ে যাবে।[৪৭]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, যে ব্যক্তি দাবি করে যে, রাসুল ﷺ-এর মৃত্যুর পর দশের অধিক কিছু লোক ব্যতীত সকল সাহাবি মুরতাদ হয়ে গিয়েছে অথবা যে ব্যক্তি সকল সাহাবিকে ফাসেক আখ্যা দেয়, সে নিঃসন্দেহে কাফের।[৪৮]

আবু যুরয়া রাজি রহ. বলেন, যদি কোনো ব্যক্তিকে দেখো কোনো সাহাবিকে দোষারোপ করতে, জেনে নিয়ো সে জিন্দিক।[৪৯]

এসব কারণে আমাদের এই পাঠের উদ্দেশ্য হচ্ছে, সাহাবিগণের পক্ষে প্রতিরোধ করা। ওই সকল পথভ্রষ্ট মূর্খরা তাদের ওপর যেসব মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছে, সেগুলো থেকে তাদের পবিত্র প্রমাণিত করা। কিন্তু বড়

---

৪৪. *শরহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ*, ৭/১৩২; *মাশিখাতু কাযিল মারিস্তান*, ২/৮৬৫

৪৫. *আকিদাতু আহলিস সুন্নাহ*, ২/৮৬৫

৪৬. *আশ-শিফা*, ২/৫৮০

৪৭. *ফাতাওয়াস সুবকি*, ২/৫৮০

৪৮. *আস-সারিমুল মাসলুল*, পৃ. ৫৮৭

৪৯. *আল-আওয়াসিম মিনাল কাওয়াসিম*, পৃ. ৩৪

আক্ষেপ এই যে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর দাবিদার অনেক অজ্ঞ মুসলিম ওই সকল ভ্রান্তদের অনুসরণ করেছে এবং সাহাবিগণকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তারা রচনা করেছে অনেক গ্রন্থ। জানি না এসব কি তারা ইচ্ছাকৃত করেছে যে, তাদেরকে কাফের আখ্যা দেবো, নাকি অজ্ঞতাবশত করেছে যে, তাদেরকে ফাসেক বলব!

এদের মধ্যে আবদুর রহমান শারকাবি এবং আয়েশা কাদুরা প্রমুখ ব্যক্তি হলো অন্যতম। আয়েশা কাদুরা, 'লেবানন ইউনিভার্সিটি'র সাহিত্য বিভাগের সাবেক ডিন। উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রা.-এর ওপর অত্যন্ত জঘন্য মিথ্যাচার সে করেছে। আরও মিথ্যাচার করেছে আলি রা., হাফসা রা., ফাতেমা রা. এবং উসমান রা.-কে নিয়ে।

উসমান রা.-এর কথাই বলা যাক। ইসলামের ইতিহাসে তিনি একজন মহান ব্যক্তি। রাসুল ﷺ-এর দুই মেয়ে উম্মে কুলসুম রা. ও রুকাইয়া রা.-কে বিয়ে করার কারণে তাকে দেওয়া হয়েছিল যুন নুরাইন তথা দুই নুরের অধিকারী উপাধি। অবশ্যই এটি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ বিষয়। পৃথিবীর ইতিহাসে অন্য কোনো ব্যক্তির ভাগ্যলিপিতে কোনো নবীর দুই কন্যা বিয়ে করার মহাসৌভাগ্য লিখিত হয়নি। উম্মে কুলসুম রা.-এর মৃত্যুর পর রাসুল ﷺ তাকে বলেছিলেন, আমার যদি তৃতীয় কোনো মেয়ে থাকত তবে তাকেও আমি তোমার সঙ্গেই বিয়ে দিতাম।

এই মজলুম খলিফার ওপর আরোপ করা হয়েছে অনেক অপবাদ। এমনকি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর অজ্ঞ কিছু লোক, যারা সম্যক জ্ঞান ও যাচাই-বাছাই ছাড়াই লেখালেখি করে, তারাও এই মহান সাহাবির ওপর মিথ্যাচার করেছে।

২৪ হিজরির শুরুভাগে উসমান রা. মুসলিম বিশ্বের খলিফা নির্বাচিত হন। ৩৫ হিজরিতে শহিদ হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি খেলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তবে এর আগে কিছু নামধারী মুসলিম এবং এদের অনুসারীদের পক্ষ থেকে তার ওপর আরোপ করা হয়েছিল বহু মিথ্যা অপবাদ। অবশেষে তারা তাকে হত্যা করে। এরপর শিয়ারা এসে উসমান রা.-কে নিয়ে অপবাদের পাহাড় গড়তে থাকে। তারা দাবি করে, তিনি আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা.-এর সঙ্গে যোগসাজশ করে আলি রা. থেকে খেলাফত ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। তাদের এই দাবি থেকে আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় চাই।

উসমান ইবনে আফফান রা.-এর পরিচয়

পুরো নাম উসমান ইবনে আফফান ইবনে আবুল আস ইবনে উমাইয়া ইবনে আবদিশ শামস ইবনে আবদি মানাফ ইবনে কুসাই। তিনি ছিলেন বনু উমাইয়া বংশোদ্ভূত। চতুর্থ পুরুষ আবদে মানাফ পর্যন্ত গিয়ে রাসুল ﷺ-এর সঙ্গে তার বংশতালিকা মিলে যায়। রাসুল ﷺ-এর সঙ্গে বংশতালিকা মিলে যাওয়া অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ এবং সৌভাগ্যের ব্যাপার।

উসমান রা.-এর মায়ের নাম ছিল আরওয়া বিনতে কুরাইজ। তার নানি বায়দা বিনতু আবদুল মুত্তালিব ছিলেন মুহাম্মাদ ﷺ-এর ফুফু। তাঁর পিতা আবদুল্লাহর জমজ বোন। এ হিসাবে তিনি পিতামাতা উভয়দিক দিয়েই রাসুল ﷺ-এর আত্মীয়।

হস্তিবাহিনীর ঘটনার ছয় বছর পর উসমান রা.-এর জন্ম হয়। তাই রাসুল ﷺ-এর চেয়ে ছয় বছরের ছোট ছিলেন তিনি। গঠনাকৃতিতে তিনি ছিলেন মধ্যম গড়নের। খাটোও ছিলেন না, লম্বাও ছিলেন না। ছিলেন সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট। লালিমাময় শুভ্র ছিল তার দেহের রং। কিছু বসন্তের দাগ চেহারায় ছিল। দাড়ি ছিল গালভরতি এবং ঘন। বয়সের কারণে তার দাড়ি শুভ্রতায় ছেয়ে গিয়েছিল। বক্ষ ছিল প্রশস্ত। দেহের গঠন ছিল প্রসারিত। হাতদুটো ছিল লম্বা। ছিলেন কোঁকড়া চুলবিশিষ্ট। তার দাঁতগুলো ছিল সবচেয়ে সুন্দর। তিনি ছিলেন সবচেয়ে সুদর্শন। তার এই সৌন্দর্যের প্রসিদ্ধিও ছিল। তাকে এবং রুকাইয়া রা.-কে বলা হতো সবচেয়ে সুন্দর দম্পতি।

তিনি আবু বকর রা.-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আবু বকর রা., যায়দ ইবনে হারেসা রা. এবং আলি রা.-এর পর তিনি ছিলেন চতুর্থ ইসলাম গ্রহণকারী পুরুষ। রাসুল ﷺ-এর নবুয়ত লাভের পর তার সঙ্গে একদিন আবু বকর রা.-এর দেখা হয়। তিনি তাকে বলেন, উসমান, তোমার জন্য দুঃখ হয়। তুমি তো একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি। কোনটা সত্য, কোনটা অসত্য তা তোমার কাছে অস্পষ্ট নয়। আমাদের সম্প্রদায় যে মূর্তিগুলোর পূজা করে এগুলোর কি কোনো মানে হয়? এগুলো তো শুধু পাথর। কিছুই শুনতে পায় না, কিছুই দেখতে পায় না। না আছে কারও উপকারের ক্ষমতা, না আছে কাউকে ক্ষতি করার ক্ষমতা।

উসমান রা. বললেন, আপনি যা বলেছেন তাই ঠিক।

তখন আবু বকর রা. বললেন, আল্লাহর শপথ! মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ হলেন আল্লাহ তাআলার রাসুল। আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিজীবের কাছে তাঁকে সত্যের বার্তা দিয়ে পাঠিয়েছেন। তুমি কি তাঁর কাছে যাবে?

উসমান রা. বললেন, অবশ্যই যাব।

এরপর তারা নবীজি ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। রাসুল ﷺ বললেন, হে উসমান, আল্লাহ তাআলার সত্য আহ্বানে সাড়া দাও। আমি তোমার প্রতি এবং আল্লাহ তাআলার সমস্ত সৃষ্টির প্রতি রাসুল হিসাবে প্রেরিত হয়েছি।

উসমান রা. বলেন, আল্লাহর শপথ! রাসুল ﷺ-এর কথা শোনার পর থেকেই আমি নিজেকে ধরে রাখতে পারছিলাম না। সঙ্গে সঙ্গেই আমি কালিমা পাঠ করে ইসলাম গ্রহণ করি।[৫০]

আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে তিনি খুব দ্রুতই ইসলামের আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন। এতে আবু বকর রা.-এর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।

ইসলাম গ্রহণের পর তিনি নবীজির মেয়ে রুকাইয়া রা.-কে বিয়ে করেন। তবে নবীজির নবুয়ত প্রাপ্তির আগ থেকেই তারা দম্পতি ছিলেন বলেও মত পাওয়া যায়। উসমান রা. ছিলেন তার গোত্রের মর্যাদাবান এক ব্যক্তি। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর তার গোত্রের লোকেরা তার প্রতি অমানবিক নির্যাতন করে। তার চাচা হাকাম ইবনে আবুল আস ছিল এর মূলহোতা। সে তাকে বেত্রাঘাত করত। কিন্তু এই শাস্তি উসমান রা.-কে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারেনি।

রাসুল ﷺ যখন সাহাবিগণকে হাবাশা (বর্তমান ইথিওপিয়া) হিজরতের নির্দেশ দিলেন, তখন সবার আগে উসমান রা. এবং তার স্ত্রী রুকাইয়া রা. হিজরত করেন। এরপর অন্য মুসলিমগণ তাদের অনুসরণ করেন। এ হিজরতের উদ্দেশ্য ছিল ইথিওপিয়ায় মুসলিমদের ভিত মজবুত করা। যদি মক্কায় মুসলিমদের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়ে, তাহলে যেন তাদের জন্য একটি নিরাপদ আবাসনের ব্যবস্থা হয়।

---

৫০. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/২২৩

হাবাশায় মুসলিমদের অবস্থানকালে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, মক্কাবাসী সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেছে। তখন হাবাশা থেকে কিছু মুসলিম মক্কায় ফিরে আসেন। উসমান রা. এবং তার স্ত্রীও ছিলেন এই কাফেলায়। মুসলিমগণ যখন জানতে পারলেন যে, এটি একটি গুজব, তখন হাবাশা থেকে যারা ফিরে এসেছিলেন তারা মক্কাতেই থেকে গেলেন। যারা আসেননি তারা হাবাশাতেই থেকে যান।

এরপর উসমান রা. স্ত্রীকে নিয়ে মদিনা মুনাওয়ারায় হিজরত করেন। এ হিসাবে তিনি দুই হিজরতের অধিকারীও ছিলেন।[৫১] সাহাবিগণ রা.-এর মধ্য থেকে অল্প কয়েকজনই এই গৌরব অর্জন করেছিলেন।

তিনি ছিলেন সম্পদশালী। মক্কা-মদিনা উভয় স্থানে থাকাকালীন অনেক ক্রীতদাস তিনি মুক্ত করেছেন। খলিফা হওয়ার পরও তিনি এ কাজ অব্যাহত রেখেছিলেন। এমনকি তার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এমন কোনো শুক্রবার অতিবাহিত হয়নি যে শুক্রবারে উসমান রা. দাস মুক্ত করেননি।

ইসলাম গ্রহণের পর থেকে শাহাদাত পর্যন্ত তিনি এটা অব্যাহত রেখেছিলেন। কোনো শুক্রবারে সম্পদ কম থাকার কারণে দাস মুক্ত করা সম্ভব না হলে পরবর্তী শুক্রবারে তিনি দুজন দাস মুক্ত করতেন।[৫২]

উসমান রা.-এর একটি অবদান হচ্ছে, মদিনায় হিজরতের পর তিনি নিজের ব্যক্তিগত সম্পদ দিয়ে মসজিদে নববির পাশের জায়গা ক্রয় করে তা মসজিদের সম্প্রসারণের জন্য দান করেছিলেন।

মদিনা মুনাওয়ারায় পানির নিয়ন্ত্রণ একচছত্রভাবে ইহুদিদের কাছে ছিল। উসমান রা.-এর সর্বজনবিদিত উত্তম কাজ হলো, মদিনায় আসার পর তিনি ইহুদিদের থেকে রুমা নামক কূপটি ক্রয় করে মুসলিমদের জন্য ওয়াকফ করে দেন। সেখানে একজন মুসলিমের যতটুকু অধিকার ছিল, তারও ততটুকুই অধিকার ছিল। রাসুল ﷺ বলেছিলেন, যে ব্যক্তি রুমা কূপ খনন করেছে সে জান্নাত লাভ করবে[৫৩]

---

৫১. *তারিখুল ইসলাম*, ৩/৯১; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/২২২

৫২. *তারিখুল মাদিনা*, ৪/১১৫৩; *তারিখুল ইসলাম*, ৩/৯২, *আল-মারিফাতু ওয়াত তারিখ*, ২/৪৮৯

৫৩. *সহিহ বুখারি*, ২৭৭৮; *আস-সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি*, ১১৯৩৩

ফিতনার ঘটনার সময় যখন তাকে গৃহবন্দি করা হয়, তখন তিনি বলেছিলেন,

> আপনাদের মধ্যে যারা নবীজি ﷺ-এর সাহাবি আছেন তাদের আমি আল্লাহ তাআলার শপথ করে বলছি, আপনারা কি জানেন, রাসুল ﷺ বলেছিলেন, যে ব্যক্তি তাবুক যুদ্ধের বাহিনী প্রস্তুত করবে তার জন্য রয়েছে জান্নাত। এরপর আমি সেই বাহিনী প্রস্তুত করে দিয়েছি? তারা বললেন, হ্যাঁ।[৫৪]

আবু হুরাইরা রা. বলতেন, উসমান রা. দুইবার রাসুল ﷺ-এর কাছ থেকে জান্নাত কিনে নিয়েছেন; একবার রুমা কূপ খনন করে, আরেকবার তাবুক যুদ্ধের বাহিনী প্রস্তুত করে।[৫৫]

এবার আসি বদর যুদ্ধের আলোচনায়। আমরা জানি যে, রাসুল ﷺ যখন বদরের উদ্দেশে বেরিয়েছিলেন, তখন তাঁর যুদ্ধের কোনো ইচ্ছা ছিল না। সে সময় মুসলিমরা বেরিয়েছিল কুরাইশদের কাফেলাকে আটক করার জন্য। উসমান রা. রাসুল ﷺ-এর সঙ্গে যাওয়ার জন্য বেশ পীড়াপীড়ি করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ছিল ভিন্ন। তখন রুকাইয়া রা. অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাই রাসুল ﷺ উসমান রা.-কে মদিনায় অবস্থান করে রুকাইয়া রা.-এর কাছে থেকে তার চিকিৎসা ও সেবা করার নির্দেশ দেন। ফলে তিনি মদিনাতেই থেকে যান। রাসুল ﷺ সাহাবিগণকে নিয়ে বেরিয়ে যান বদরের উদ্দেশে। সেখানে শুরু হয় যুদ্ধ। বিজয় লাভের পর মদিনায় ফিরে এসে নবীজি ﷺ দেখতে পান উসমান রা. তার স্ত্রীকে দাফন করছেন। নবীজি ﷺ তাকে গনিমতের সম্পদের একাংশ প্রদান করেন, যেন তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদেরই একজন। অতঃপর রাসুল ﷺ তাঁর অপর মেয়ে উম্মে কুলসুম রা.-কে উসমান রা.-এর সঙ্গে বিয়ে দেন। হিজরতের নবম বছর পর্যন্ত উসমান রা. তার সঙ্গে সংসার করেন। এরপর উম্মে কুলসুম রা.-ও ইন্তেকাল করেন। তখন রাসুল ﷺ উসমান রা.-কে বলেছিলেন,

> আমার যদি আরও কোনো মেয়ে থাকত, তবে তাকেও তোমার সঙ্গে বিয়ে দিতাম।[৫৬]

---

৫৪. *সহিহ বুখারি*, ২৭৭৮

৫৫. *আল-মুসতাদরাক লিল হাকিম*, ৪৫৭০

উহুদ যুদ্ধে প্রথমে মুসলিম বাহিনী বিজয় লাভ করে। কিন্তু তিরন্দাজ বাহিনী রাসুল ﷺ-এর আদেশ লঙ্ঘন করলে তাদের ওপর নেমে আসে বিপর্যয়। অনেক সাহাবি সেদিন শহিদ হন। অনেকে যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে চলে যান। যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে উসমান রা.-ও সেদিন পলায়নকারীদের দলে ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা নিজের দয়া, অনুগ্রহ এবং বদান্যতা দেখিয়ে এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾

> দুই বাহিনী মুখোমুখি হওয়ার দিন যারা পালিয়ে গিয়েছিল, তাদের কিছু পাপের কারণে শয়তান তাদেরকে প্ররোচিত করেছিল। আল্লাহ তাআলা তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল এবং সহনশীল। [সুরা আলে ইমরান : ১৫৫]

তাই আল্লাহ তাআলা নিজে যাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, তার নিন্দা করা কখনোই বৈধ হতে পারে না। যদি কেউ শুধু এই পলায়নের কারণেও নিন্দা করে তবুও তা বৈধ হবে না। মায়েজ আসলামি নামক সাহাবি ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার পর রাসুল ﷺ-এর কাছে এসে স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন। তখন পাথর নিক্ষেপ করে তাকে হত্যা করা হয়। এরপর কিছু লোক মায়েজ আসলামি রা.-কে নিয়ে সমালোচনা করতে থাকে। এ সময় রাসুল ﷺ মায়েজ আসলামি রা. সম্পর্কে বলেন, সে এমন তওবা করেছে যদি তা পৃথিবীবাসীর ওপর বণ্টন করা হয়, তবে তাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে।

একদিন নবীজি ﷺ একটি মৃত গাধার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন মায়েজ আসলামি রা. সম্পর্কে সমালোচনাকারী দুজন সাহাবি রাসুল ﷺ-এর সঙ্গেই ছিলেন। তিনি তাদের বললেন, যাও, এই মৃত গাধার গোশত ভক্ষণ করো।

তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমরা কীভাবে তা করতে পারি?

নবীজি ﷺ বললেন, তোমরা যা করেছ তা এর চেয়েও বেশি নিন্দনীয়।[৫৭]

---

৫৬. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/২২৪

৫৭. *সহিহ ইবনি হিব্বান*, ৪৩৯৯; *আস-সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ি*, ৭১২৭

তারা ব্যভিচারের স্বীকারোক্তিদাতা সাহাবির গিবত করেছিলেন। তাদেরকে যখন রাসুল ﷺ এ কথা বললেন, তাহলে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা দিয়ে যার অপরাধ ক্ষমা করেছেন, কীভাবে আমরা তার সমালোচনা করতে পারি?

চতুর্থ হিজরিতে সংঘটিত হয় যাতুর রিকা যুদ্ধ। তখন রাসুল ﷺ উসমান রা.-কে মদিনায় স্থলাভিষিক্ত করে যান। রাসুল ﷺ-এর অনুপস্থিতিতে তিনি মদিনার দেখভাল করেন। পঞ্চম হিজরিতে সংঘটিত খন্দকের যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেন।[৫৮] এর আগে তৃতীয় হিজরিতে সংঘটিত গাতফানের যুদ্ধেও রাসুল ﷺ আবার তাকে মদিনায় নিজের স্থলাভিষিক্ত করেন।

ষষ্ঠ হিজরিতে সংঘটিত হুদাইবিয়া সন্ধির পূর্বে রাসুল ﷺ উমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কার উদ্দেশে সফর করেন। কিন্তু মক্কার কাফের সম্প্রদায় তাঁকে এবং উপস্থিত সাহাবিগণকে মক্কায় প্রবেশ এবং বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে বাধা প্রদান করে। তখন রাসুল ﷺ একজন সাহাবিকে পাঠিয়ে তাদের জানাতে চাইলেন যে, তিনি কোনো যুদ্ধবিগ্রহের জন্য আসেননি। তিনি এসেছেন শুধু উমরা করার জন্য। এ কাজের জন্য রাসুল ﷺ প্রথমে উমর রা.-কে নির্বাচন করেন। তখন উমর রা. বলেন, আমি আশঙ্কা করি কুরাইশরা আমার ওপর খুবই ক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। মক্কায় বনু আদি ইবনে কাব গোত্রের এমন কেউ নেই যে আমাকে রক্ষা করবে। কুরাইশদের সঙ্গে আমার শত্রুতা এবং ক্রোধের কথা তারা জানে। কিন্তু আমি আপনাকে এ কাজে আমার চেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তির কথা বলে দিচ্ছি। তিনি হলেন উসমান ইবনে আফফান।

রাসুল ﷺ তার এ মত পছন্দ করলেন। উসমান রা.-কে ডেকে আবু সুফিয়ান এবং কুরাইশ গোত্রের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের কাছে পাঠালেন; তাদেরকে এ কথা জানানোর জন্য যে, রাসুল ﷺ যুদ্ধ করার জন্য আসেননি। তিনি শুধু উমরা করার জন্য এসেছেন। এরপর উসমান রা. মক্কায় প্রবেশ করেন। তার এক চাচাতো ভাই আবান ইবনে সাইদ ইবনুল আস তাকে নিরাপত্তা দেন। তিনি কুরাইশদের বিষয়টি বুঝিয়ে বলেন। তখন তারা নবীজি ﷺ-এর সঙ্গে কিছু কথা বলার আগ্রহ ব্যক্ত করে। উসমান রা. তাতে সম্মত হন। তিনি যখন ফিরতে চাইলেন তখন কুরাইশরা তাকে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করার প্রস্তাব

৫৮. এ ছাড়া তিনি খাইবার বিজয়, মক্কা বিজয়, হুনাইন ও তাবুকের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিলেন।-সম্পাদক

দেয়। মক্কা থেকে হিজরত করার পর বছরের পর বছর ধরে প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তি এই স্বপ্ন লালন করে আসছিলেন। কিন্তু উসমান রা. জবাব দেন, রাসুল ﷺ তাওয়াফ করার পূর্বে আমি কখনোই তাওয়াফ করব না।

মক্কাবাসীদের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য উসমান রা. তিন দিন সেখানে অবস্থান করেন। এ সময় রাসুল ﷺ এবং আগত সাহাবিগণের কাছে উসমান রা.-এর হত্যার মিথ্যা সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। তখন নবীজি ﷺ সাহাবিগণকে একত্র করেন এবং উসমান রা.-কে হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের শপথ নেন।[৫৯]এ ঘটনায় উসমান রা.-এর মর্যাদা খুব ভালো করেই উপলব্ধ হয়। এই বাইআতের সময় উসমান রা.-এর স্থলে রাসুল ﷺ নিজের হাত রেখেছিলেন। যা ছিল এই বাইআতের সর্বশ্রেষ্ঠ হাত।

এ ঘটনার পর উসমান রা. সপ্তম হিজরির খাইবার বিজয় এবং অষ্টম হিজরির মক্কা বিজয়ে[৬০] অংশগ্রহণ করেন। এরপর তাবুক যুদ্ধে এসে রাসুল ﷺ ঘোষণা দেন, সেনাবাহিনীর প্রস্তুতির জন্য কে কী দান করবে?

উসমান রা. দাঁড়িয়ে বললেন, আমি ১০০ উট দেবো। সেই সঙ্গে সেগুলোর যাবতীয় সামগ্রীও।

এ কথা শুনে রাসুল ﷺ খুবই আনন্দিত হলেন। সাহাবিগণকেও এ কাজে অংশগ্রহণ করতে বললেন। তখন উসমান রা. আবারও দাঁড়িয়ে বললেন, আমি আরও ১০০ উট এবং সেগুলোর যাবতীয় সামগ্রী দান করব।

এভাবে তিনি নিজের ওপর দানের পরিমাণ বাড়াতে থাকেন। কোনো কোনো বর্ণনা অনুযায়ী সেদিন তিনি মোট ৩০০ উট এবং কোনো বর্ণনা অনুযায়ী ১ হাজার উট দান করেছিলেন। এরপর বাড়িতে গিয়ে আরও ১ হাজার দিনার এবং ২০০ উকিয়া[৬১] রৌপ্য এনে রাসুল ﷺ-এর হাতে দিলেন। তখন প্রিয় নবীজি ﷺ বলেছিলেন, আজকের পর উসমান কোনো কাজে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।[৬২]

উসমান রা.-এর ক্ষেত্রে তিনি দুই বার এ কথা বলেছিলেন।

---

৫৯. *আল-মুসনাদ লিল ইমাম আহমাদ*, ১৮৯১০; *শারহু মুশকিলিল আসার*, ৫৭৭১
৬০. এ ছাড়া তিনি হুনাইন ও তাবুকের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিলেন।-সম্পাদক
৬১. উকিয়া : একটি পরিমাপের নাম। এক উকিয়া = ৪০ দিরহাম বা ১২২.৪৭২ গ্রাম।-সম্পাদক
৬২. *সুনানুত তিরমিজি*, ৩৭০০; *আল-মুসনাদ লিল ইমাম আহমাদ*, ১৬৬৯

উসমান রা.-এর লজ্জাশীলতা

উসমান ইবনে আফফান রা. অনেক উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন খুবই লজ্জাশীল।

আয়েশা রা. বলেন, একবার রাসুল ﷺ আমার ঘরে শুয়ে ছিলেন। তখন তার দুই উরু কিংবা পায়ের কিছু অংশ ছিল উন্মুক্ত। এমতাবস্থায় আবু বকর রা. ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে তাকে অনুমতি দেওয়া হয়। এ অবস্থায়ই নবীজি ﷺ তার সঙ্গে কথা বলেন। এরপর উমর রা. আসেন। তার সঙ্গেও এ অবস্থায়ই কথা হয়। এরপর উসমান রা. এসে অনুমতি প্রার্থনা করেন। তখন রাসুল ﷺ কাপড় দিয়ে শরীর ঢেকে নেন। উসমান রা. প্রবেশ করেন এবং নবীজি ﷺ-এর সঙ্গে কথা বলেন। আয়েশা রা. নবীজি ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলেন, আবু বকর এবং উমর এলেন, আপনি তাদের জন্য ঠিক হয়ে বসলেন না, কিন্তু উসমান আসায় এমন করলেন কেন? তিনি বললেন, যাকে দেখে ফেরেশতারাও লজ্জা করে আমি কি তাকে দেখে লজ্জা করব না?[৬৩]

আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে দয়ালু হলো আবু বকর, আল্লাহ তাআলার বিধানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কঠোর হলো উমর, সবচেয়ে লজ্জাশীল হলো উসমান, হালাল-হারাম সম্পর্কে সবচেয়ে অবগত হলো মুয়াজ ইবনে জাবাল, ফারায়েজ[৬৪] সর্ম্পকে সবচেয়ে বড় জ্ঞানী হলো যায়দ ইবনে সাবেত, সবচেয়ে সুন্দর কুরআন তেলাওয়াতকারী হলো উবাই ইবনে কাব। প্রত্যেক উম্মতের একজন বিশ্বস্ত লোক রয়েছে, এই উম্মতের বিশ্বস্ত লোক হলো আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ।[৬৫]

উসমান রা.-এর ঈমান

ইবনে উমর রা. বলেন, একদিন সকালে সূর্যোদয়ের পর রাসুল ﷺ আমাদের কাছে এসে বললেন, ফজরের পূর্বমুহূর্তে আমি স্বপ্নে দেখেছি আমাকে যেন সমস্ত চাবিকাঠি এবং দাঁড়িপাল্লা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। চাবি তো (তোমাদের পরিচিত) এ চাবি। দাঁড়িপাল্লাও ওই দাঁড়িপাল্লা যা দিয়ে তোমরা পরিমাপ করে থাকো। সে দাঁড়িপাল্লার এক পাল্লায় রাখা হলো আমাকে, আরেক

---

৬৩. *সহিহ মুসলিম*, ২৪০৯; *সহিহ ইবনি হিব্বান*, ৬৯০৭

৬৪. **ফারায়েজ :** কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক উত্তরাধিকার বণ্টনপদ্ধতিকে ফারায়েজ বলা হয়।-সম্পাদক

৬৫. *সুনানুত তিরমিজি*, ৩৭৯০; *আল-মুসনাদ লিল ইমাম আহমাদ*, ১৩৯৮৭

পাল্লায় রাখা হলো আমার উম্মতকে। এরপর আমার ওজন তাদের চেয়ে বেশি হলো। এরপর আবু বকরকে মাপা হলো, তার ওজন আমার উম্মতের চেয়ে বেশি হলো। উসমান রা.-কে মাপা হলো, তার ওজনও উম্মতের চেয়ে বেশি হলো। এরপর দাঁড়িপাল্লা উঠিয়ে নেওয়া হলো।[৬৬]

এখানে উসমান রা.-এর ঈমান দিয়ে এই উম্মতের ঈমানের পরিমাপ করা হলো।

উসমান রা.-এর কুরআন তেলাওয়াত

তিনি ছিলেন কুরআনের হাফেজ। হৃদয় দিয়ে তিনি কুরআনকে ধারণ করেছিলেন। *তারিখুল খুলাফা* গ্রন্থে জালালুদ্দিন সুয়ুতি রহ. বলেন, খলিফাগণের মধ্য থেকে কেবল দুজন খলিফাই কুরআন হিফজ করেছিলেন। উসমান ইবনে আফফান রা. এবং আব্বাসি খলিফা মামুন।[৬৭]

উসমান রা. কুরআন তেলাওয়াতের প্রতি খুবই আসক্ত ছিলেন। তিনি প্রচুর পরিমাণে কুরআন তেলাওয়াত করতেন। এমনকি যখন তাকে অবরোধ করা হয় তখন তার স্ত্রী নায়েলা রহ. বলেন, তোমরা তাকে হত্যা করে ফেলো অথবা ছেড়ে দাও। কারণ, আল্লাহর শপথ! তিনি তো পুরো রাত এক রাকাতে কুরআন তেলাওয়াত করেই কাটিয়ে দেন।[৬৮]

উসমান রা. বলেছেন, আমাদের অন্তর যদি পবিত্র হতো তবে কখনোই আমরা প্রভুর কালাম পাঠ করে অতৃপ্ত হতাম না। আল্লাহর শপথ! আমি চাই না, আমার জীবনে এমন কোনো দিন আসুক, যেদিন আমি কুরআনের দিকে তাকাতে পারব না।[৬৯]

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন,

﴿أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾

---

৬৬. *আল-মুসনাদ লিল ইমাম আহমাদ*, ৫৪৬৯

৬৭. *তারিখুল খুলাফা*, পৃ. ২৫, উল্লেখ্য যে, খলিফাগণের মধ্যে কেবল উসমান রা. ও খলিফা মামুন হাফেজ ছিলেন এ দাবি বাস্তবসম্মত নয়। উপরিউক্ত খলিফাদ্বয় ছাড়া আলি ইবনে আবু তালেব রা.-সহ বেশ কয়েকজন খলিফা কুরআনের হাফেজ ছিলেন। দেখুন, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ১০/৩০২; *তারিখুল খুলাফা*, পৃ. ২৫।-সম্পাদক

৬৮. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/২৪০

৬৯. *কিতাবুল ইতিকাদ*, পৃ. ৫০১; *শুআবুল ঈমান*, ২০৩০; *হিলয়াতুল আওলিয়া*, ৫/১৬৭৪

তবে কি (এরূপ ব্যক্তি সেই ব্যক্তির সমতুল্য হতে পারে) যে রাতের মুহূর্তগুলোতে ইবাদত করে, কখনো সিজদাবস্থায়, কখনো দাঁড়িয়ে, যে আখেরাতকে ভয় করে এবং নিজ প্রতিপালকের রহমতের আশা করে।

[সুরা যুমার : ৯]

কুরআনের এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল উসমান রা.-এর ব্যাপারে।[৭০]

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন,

﴿وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ اَحَدُهُمَاۤ اَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّهُوَ كَلٌّ عَلٰى مَوْلٰىهُ ۙ اَيْنَمَا يُوَجِّهْهُّ لَا يَاْتِ بِخَيْرٍ ؕ هَلْ يَسْتَوِيْ هُوَ ۙ وَمَنْ يَّاْمُرُ بِالْعَدْلِ ۙ وَهُوَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ﴾

আল্লাহ তাআলা দুই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত পেশ করলেন। যাদের একজন মূক, কিছুই বলতে পারে না। সে তার মনিবের ওপর বোঝাস্বরূপ, যেখানেই তাকে পাঠানো হয় কোনো কল্যাণ নিয়ে আসে না। সেই ব্যক্তি কি একজন সঠিক পথ অবলম্বনকারী ন্যায়ের আদেশদাতার সমান হবে?

[সুরা নাহল : ৭৬]

উক্ত আয়াতও অবতীর্ণ হয়েছিল উসমান রা.-এর ব্যাপারে।[৭১]

দাসদের সঙ্গে উসমান রা.-এর আচরণ

তিনি দাসদের সঙ্গে কোমল আচরণ করতেন। খলিফা হওয়ার পর তিনি দাসকে জাগ্রত না করে নিজেই অজুর পানি প্রস্তুত করতেন আর বলতেন, রাত তাদের জন্য। তারা বিশ্রাম করুক।

উসমান রা.-এর নামাজ-রোজা

তিনি অনেক রোজা রাখতেন। এমনও বলা হয় যে, তিনি বছরব্যাপী অথবা এর কাছাকাছি সময় রোজা রাখতেন। তিনি অধিক পরিমাণে নফল নামাজও পড়তেন।

---

৭০. *তাফসিরুল বাগাবি*, ৪/৮১; *রুহুল মাআনি*, ১২/২৩৭

৭১. *রুহুল মাআনি*, ৪/৪৩৭

উসমান রা.-এর বাগ্মিতা

তিনি ছিলেন একজন বাগ্মী। আল্লাহ তাআলা তাকে অনেক বাগ্মিতা এবং খোদাভীরুতা দান করেছিলেন। নিজের শেষ বক্তব্যে তিনি বলেছিলেন,

আল্লাহ তাআলা তোমাদের দুনিয়া দিয়েছেন এর মাধ্যমে আখেরাত অনুসন্ধান করার জন্য। দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হওয়ার জন্য নয়। নিশ্চয় দুনিয়া একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। তবে আখেরাত কখনো ধ্বংস হবে না। তাই অস্থায়ী জগৎ যেন তোমাদের অবাধ্য না করে এবং চিরস্থায়ী জগৎ থেকে বিমুখ না করে দেয়। তোমরা অস্থায়ী জগতের ওপর স্থায়ী জগতকে প্রাধান্য দাও। দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলার দিকেই আমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তাই আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। আল্লাহর ভয়ই হচ্ছে তাঁর ক্রোধ থেকে বাঁচার ঢাল এবং তাঁর নৈকট্যলাভের মাধ্যম। আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে শরিক করা থেকে ভয় করো। নিজেদের জামাত তথা দলকে আঁকড়ে ধরো। দলে দলে বিভক্ত হয়ে যেয়ো না।

﴿وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ إِخْوَانًا﴾

স্মরণ করো আল্লাহ তাআলার নেয়ামতের কথা। যখন তোমরা ছিলে শত্রু, অতঃপর আল্লাহ তাআলা তোমাদের হৃদয়গুলোকে জুড়ে দিয়েছেন। ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেলে।

[সুরা আলে ইমরান : ১০৩]

অনেক সাহাবি সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, উসমান রা. ছিলেন একজন প্রাঞ্জল আলোচক ও বক্তা। আবদুর রহমান ইবনে হাতিব রা. বলেন, কথা বলার ক্ষেত্রে উসমান রা. ছিলেন সবচেয়ে পরিপূর্ণ ব্যক্তি। তবে তিনি কথা বলতে খুবই ভয় করতেন। কারণ, তিনি ছিলেন অত্যন্ত লাজুক।

ওয়াকিদি রহ.-এর এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, উসমান রা. খলিফা হওয়ার পর প্রথমে সবার উদ্দেশে দাঁড়িয়ে বলেন, হে লোকসকল, যেকোনো কাজের প্রথম পর্যায় কঠিন হয়ে থাকে (আজকের এ দিনটি আমার খেলাফত আমলের প্রথম পর্যায়)। কিন্তু এ দিনের পর আরও বহুদিন আসবে (তখন আর খেলাফতের দায়িত্ব পালন কঠিন মনে হবে না)। আমি যদি (দীর্ঘদিন) বেঁচে থাকি তাহলে (দেখে যেতে পারব যে) তোমাদের (মন্দ চরিত্রের)

বক্তারা যথাযথ বক্তব্য দেবে। কিন্তু আমি বক্তা নই, কিন্তু অবশ্যই আল্লাহ তাআলা আমাকে শেখাবেন।

আল্লামা ইবনে কাসির রহ. ওয়াকিদি থেকে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি অপর এক স্থানে বলেছেন, এ বর্ণনার বক্তব্যটি বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল নয়।

উসমান রা.-এর দয়াশীলতা

উসমান রা. ছিলেন অত্যন্ত দানশীল। পরিচিত এবং অপরিচিত সকলের জন্যই তার দানের হাত ছিল উন্মুক্ত। খলিফা হওয়ার পূর্বে এবং পরে মদিনার সকল লোকের কাছেই তার দান পৌঁছেছে। বর্ণিত আছে, আবু তালহা রা. উসমান রা.-এর কাছে ৫০ হাজার দিরহাম ঋণী ছিলেন। আবু তালহা রা. উসমান রা.-এর কাছে সংবাদ পাঠিয়ে জানালেন, আপনার পাওনা সংগ্রহ হয়ে গেছে। তাই কাউকে পাঠিয়ে দিন নিয়ে যাওয়ার জন্য। তখন উসমান রা. বলেন, আপনার ব্যক্তিত্বের প্রতি লক্ষ করে আমি তা আপনাকে উপহার দিলাম।[৭২]

অথচ পাশ্চাত্যবাদী লেখিকা জাহিয়া কাদুরা এই মহান সাহাবি সম্পর্কে কী ধৃষ্টতাপূর্ণ কথাই-না লিখেছে! সে লিখেছে, তিনি শুধু নিজের পরিবারের প্রতিই দয়া করতেন। অপর মুসলিমদের কিছু দান করতেন না, তাদের কোনো খোঁজ নিতেন না। এমনই ঘৃণ্য বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে এই লেখিকার থেকে।

উসমান রা. এত মর্যাদাশীল হওয়া সত্ত্বেও ওই সকল নিন্দুকেরা তার ব্যাপারে এমন মিথ্যা অপবাদ আরোপ করতে এতটুকুও কুণ্ঠাবোধ করেনি। শিয়াদের গ্রহণযোগ্য গ্রন্থ *আল-বুরহান*-এ রয়েছে,

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم ۚ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾

> আপনি কি তাদের দেখেন না, যারা নিজেদের পরিশুদ্ধ দাবি করে, অথচ আল্লাহ তাআলা যাকে চান তাকে পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদের এক বিন্দুও অত্যাচার করা হয় না। [সুরা নিসা : ৪৯]

৭২. *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, ২৫/১০৩

এই আয়াতের দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে তারা, যারা নিজেদের সিদ্দিক, ফারুক এবং যুন নুরাইন নাম দিয়েছে।

মাজলিসি রচিত *হক্কুল ইয়াকিন* গ্রন্থে বলা হয়েছে, বড় বড় সাহাবিগণ আবু বকর সিদ্দিক এবং উমর ফারুকের ফাসেক এবং কাফের হওয়ার ব্যাপারে একমত ছিলেন। এরপর উসমান রা.-এর ব্যাপারে তারা বলে, (তাদের ভ্রান্ত ধারণা অনুযায়ী) হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান রা. বলেছেন, আলহামদুলিল্লাহ, আমি উসমান-এর কুফরির ব্যাপারে কোনো সন্দেহ করি না।

তারা বলে থাকে, উসমানকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে, এ কথা যারা বিশ্বাস করে, তারা গোবৎস পূজারিদের তুলনায় অধিক পাপী।[৭৩]

উসমান রা.-এর প্রজ্ঞা

উসমান রা. ছিলেন একজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি ছিলেন রাসুল ﷺ-এর পরামর্শ সভার অন্যতম সদস্য। আবু বকর রা. এবং উমর রা.-এর পরামর্শ সভায়ও তিনি ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। আবু বকর রা. এবং উমর রা. উভয়েই চাইতেন উসমান রা. যেন কোনো যুদ্ধ অভিযানের জন্য মদিনা থেকে বেরিয়ে না যান। যেন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তার পরামর্শ দ্বারা উপকৃত হতে পারেন। এমনইভাবে আলি রা.-ও উসমান রা.-এর পরামর্শকে খুবই গুরুত্ব দিতেন।

২৩ হিজরির শেষভাগে ইসলামি ইতিহাসে এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। ২৩ হিজরির ২৭ জিলহজ তারিখে সংঘটিত হয়েছিল এই নৃশংস ঘটনা। সেদিন হত্যা করা হয় উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-কে। অগ্নিপূজারি আবু লুলু সেদিন তাকে খঞ্জর দিয়ে আঘাত করেছিল। এরপর ২৩ হিজরির সর্বশেষ রাতে উমর রা. ইন্তেকাল করেন। তবে এর আগে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর তিনি ছয়জন সাহাবির মধ্য থেকে মুসলিম বিশ্বের পরবর্তী খলিফা নির্বাচিত করতে বলে যান। তারা হলেন, উসমান ইবনে আফফান রা., আলি ইবনে আবু তালেব রা., যুবায়ের ইবনুল আওয়াম রা., তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রা., সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা. ও আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা.।

তারা সকলেই ছিলেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ১০জন সাহাবির অন্তর্ভুক্ত। ১০জনের মধ্যে আবু বকর রা. এবং আবু উবাইদা রা. ইতিপূর্বে ইন্তেকাল করেছিলেন। উমর রা. তো মৃত্যুশয্যায়ই ছিলেন। সাইদ ইবনে যায়দ রা.-কে

---

৭৩. *হক্কুল ইয়াকিন*, ২৭১

উমর রা. এই তালিকায় রাখেননি। কারণ, তিনি ছিলেন উমর রা.-এর চাচাতো ভাই। তাই সতর্কতাবশত উমর রা. তাকে বাদ দিয়েছিলেন। যেন কেউ বলতে না পারে যে, আত্মীয় হওয়ার কারণে উমর রা. তাকে মনোনয়ন দিয়েছেন। যদিও ইসলামের জন্য সাইদ ইবনে যায়দ রা.-এরও গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল।

সেই ছয়জনের সঙ্গে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-কেও রেখেছিলেন। তবে তাকে কোনো বিষয়ের ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। উমর রা. এই ছয়জনের প্রহরার জন্য আবু তালহা আনসারি রা.-এর নেতৃত্বে ৫০জন সাহাবিকে নিযুক্ত করেছিলেন। তারা মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রা. অথবা উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রা.-এর ঘরে, কিংবা বায়তুল মালে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌছার জন্য বসেন। সবশেষে ছয়জনের মধ্যে উসমান ইবনে আফফান রা., আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. এবং আলি ইবনে আবু তালেব রা. এই তিনজনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়।

আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. নিজ থেকেই এই দায়িত্ব থেকে সরে যাওয়ার কথা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, দুজনের মধ্যে যাকে তিনি এ দায়িত্বের জন্য অধিক উপযুক্ত মনে করবেন, তাকেই নির্বাচিত করবেন। সবাই তার সঙ্গে ঐকমত্য প্রকাশ করে। এরপর (উসমান রা. ও আলি রা. থেকে) এই মর্মে শপথ নেওয়া হয় যে, উসমান রা. অথবা আলি রা., যাকেই খলিফা নির্বাচিত করা হোক না কেন, সে মানুষের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবে। একজনকে খলিফা নিযুক্ত করা হলে অপরজন তার পূর্ণ আনুগত্য করবে।

এরপর আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. টানা তিন দিন ব্যাপারটি নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন। একজন, দুজন করে এবং সম্মিলিতভাবে লোকদের কাছে জিজ্ঞাসা করেন। ছোট-বড় সবার কাছে, এমনকি বালকদের কাছেও জিজ্ঞাসা করেন। স্বাধীন-দাস সবাইকেই এ ব্যাপারে প্রশ্ন করেন। মদিনায় আগত অতিথি, মদিনার পাশ দিয়ে গমনকারী অনারব কাফেলা এবং মহিলাদের কাছেও তিনি এ নিয়ে প্রশ্ন করেন। অবশেষে এই কঠোর পরিশ্রমের পর তিনি বলেন যে, মিকদাদ ইবনে আম্মার রা. এবং আম্মার ইবনে ইয়াসির রা. ব্যতীত মদিনার সকলেই আলি রা.-এর ওপর উসমান রা.-কে প্রাধান্য দিয়েছেন। কোনো কোনো বর্ণনায় এমনটি এসেছে যে, এজন্যই শিয়া পণ্ডিতরা এ দুজন সাহাবিকে কাফের সাব্যস্ত করে না।

এই তিন দিন আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. ঘুমাননি। লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ করা, খোঁজখবর নেওয়া, নামাজ আদায়, ইস্তেখারা এবং দোয়ার মধ্যেই সময় কাটিয়ে দিয়েছিলেন। এরপর চতুর্থ রাতে এসে তিনি তার ভাগ্নে মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রা.-এর দরজায় কড়া নেড়ে বলেন, মিসওয়ার তুমি কি ঘুমিয়ে গিয়েছ? আল্লাহর শপথ! গত তিন দিন ধরে আমি খুব একটা ঘুমাতে পারিনি। যাও আলি এবং উসমানকে ডেকে নিয়ে এসো।

মিসওয়ার রা. জিজ্ঞাসা করলেন, প্রথমে কাকে ডাকব?

তিনি বললেন, তোমার যাকে ইচ্ছা হয়।

মিসওয়ার রা. বলেন, এরপর আমি আলি রা.-এর কাছে গিয়ে বললাম, আমার মামার সালাম গ্রহণ করুন।

আলি রা. বললেন, আমার সঙ্গে অন্য কাউকে ডাকতে বলেছেন?

মিসওয়ার রা. বললেন, হ্যাঁ।

তিনি বললেন, কাকে?

মিসওয়ার রা. বললেন, উসমান ইবনে আফফান রা.-কে।

আলি রা. বললেন, আমাদের মধ্যে কার কথা আগে বলেছেন?

মিসওয়ার রা. বললেন, আমাকে এমন কিছু বলেননি। বলেছেন তোমার যাকে ইচ্ছা হয় তার কাছেই আগে যাও। আমি প্রথমে আপনার কাছে এলাম। এরপর আলি রা. মিসওয়ার রা.-এর সঙ্গে চলতে লাগলেন। মিসওয়ার রা. বলেন, আমরা যখন উসমান ইবনে আফফান রা.-এর বাড়িতে পৌঁছলাম, তখন আলি রা. বসলেন। আমি উসমান রা.-এর ঘরে প্রবেশ করতেই দেখি তিনি ফজরের পূর্বে বিতরের নামাজ আদায় করছেন। তখন তিনি আমাকে আলি রা.-এর মতোই প্রশ্ন করলেন এবং তিনিও আমাদের সঙ্গে চললেন।

এরপর তারা উভয়েই আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা.-এর কাছে গেলে তিনি তাদের বললেন, আমি আপনাদের দুজন সম্পর্কে লোকদের জিজ্ঞাসা করেছি। আমি দেখেছি, তারা অন্য কাউকেই আপনাদের সমকক্ষ মনে করে না। এরপর তিনি উভয়ের কাছ থেকে পুনরায় শপথ নিলেন যে, তাদের মধ্য থেকে যাকে নির্বাচিত করা হবে অপরজন তাকে নির্দ্বিধায় মেনে নেবে। এরপর আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. নবীজি ﷺ-এর কাছ থেকে উপহার

পাওয়া পাগড়িটি পরিধান করে মসজিদের উদ্দেশে বের হন। সঙ্গে ঝুলিয়ে নেন নিজের তরবারি। নামাজের আহ্বান করা হলে সকল মানুষ এসে সমবেত হয় মসজিদ প্রান্তরে। সেদিন সেখানে এতই লোকসমাগম হয়েছিল যে, উসমান রা. বসার জায়গা পাচ্ছিলেন না। অথচ তিনি ছিলেন খেলাফতের জন্য মনোনয়ন প্রাপ্তদের একজন। অগত্যা তিনি মসজিদের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকেন। তিনি ছিলেন খুবই লাজুক।

অতঃপর আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. রাসুল ﷺ-এর মিম্বরে আরোহণ করেন। মিম্বরে আরোহণ করে তিনি দীর্ঘক্ষণ বসে থাকেন এবং নীরবে আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করতে থাকেন। এরপর তিনি বলেন, হে লোকসকল, আমি আপনাদের প্রকাশ্যে এবং গোপনে, পছন্দের ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। আমি দেখেছি আপনারা অন্য কাউকেই এ দুজনের সমকক্ষ মনে করেন না। কেউ বলেছেন আলি রা.-এর কথা, কেউ বলেছেন উসমান রা.-এর কথা। তাই হে আলি, আপনি দাঁড়ান। এরপর আলি রা. দাঁড়ালেন এবং মিম্বরের নিচে গিয়ে বসলেন। আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. তার হাত ধরে বললেন, আপনি কি আল্লাহ তাআলার কিতাব (কুরআন), তাঁর প্রেরিত রাসুলের সুন্নাহ এবং আবু বকর রা. ও উমর রা.-এর কর্মের অনুসরণের শর্তে আমার কাছে বাইআত গ্রহণ করতে রাজি আছেন?

আলি রা. বললেন, না। (বরং কুরআন, সুন্নাহ ও) আমার ইজতেহাদ অনুসারে চলব।

আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. আলি রা.-এর হাত ছেড়ে দিয়ে এবার উসমান রা.-কে দাঁড়াতে বললেন। এরপর তার হাতে ধরে বললেন, আপনি কি আল্লাহ তাআলার কিতাব (কুরআন), তাঁর প্রেরিত রাসুলের সুন্নাহ এবং আবু বকর রা. ও উমর রা.-এর কর্ম অনুসরণের শর্তে আমার কাছে বাইআত গ্রহণ করতে রাজি আছেন?

তিনি বললেন, হ্যাঁ।

মিসওয়ার রা. বলেন, এরপর আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. তার মাথা তুলে মসজিদের ছাদের দিকে তাকালেন। তার হাত তখন উসমান রা.-এর হাতে। তিনি বললেন, হে আল্লাহ, আপনি শুনুন এবং সাক্ষী থাকুন। আপনি শুনুন এবং এবং সাক্ষী থাকুন। নিশ্চয় আমি আমার কাঁধের বোঝা উসমান রা.-এর কাঁধে অর্পণ করলাম।

মিসওয়ার রা. বলেন, অতঃপর সকল মানুষ উসমান রা.-এর হাতে বাইআত গ্রহণের জন্য ভিড় করলেন। এক বর্ণনা অনুযায়ী সবার আগে আলি রা. বাইআত গ্রহণ করেছিলেন। আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. মিম্বরের তৃতীয় সিঁড়িতে বসলেন। উসমান রা. বসলেন দ্বিতীয় সিঁড়িতে। তিনি দাঁড়িয়ে লোকেদের উদ্দেশে তার প্রথম খুতবা প্রদান করেন।[৭৪] অবশ্যই এ খুতবা তেমন ছিল না, যেমনটি ওয়াকিদি বর্ণনা করেছেন।[৭৫]

আল্লামা ইবনে কাসির রহ. এ ঘটনার সঙ্গে সংযুক্ত করে বলেন, শিয়া রাফেজি আলেমদের বর্ণনা অনুযায়ী এ ঘটনার পর আলি রা. আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা.-কে বলেছিলেন, আপনি আমাকে ধোঁকা দিয়েছেন। তিনি আপনার মেয়ের জামাই বলেই আপনি তাকে নির্বাচিত করেছেন। যেন সে প্রতিদিন আপনার সঙ্গেই যাবতীয় বিষয়ে পরামর্শ করে।

এসব কথা স্পষ্ট ভ্রান্ত এবং ভিত্তিহীন।[৭৬]

২৪ হিজরির ৩ মহররম উসমান রা.-এর হাতে বাইআত গ্রহণ করা হয়েছিল। এ দিন থেকে শুরু হয় ইসলামের তৃতীয় খলিফা উসমান রা.-এর শাসনামল। যা স্থায়ী হয় ৩৫ হিজরি পর্যন্ত। তবে এ সময়ের মাঝে ঘটে যায় বহু ঘটনা।

***

---

৭৪. *সহিহ বুখারি*, ৩৭০০; *তারিখুত তবারি*, ৪/২৩৬-২৩৮; *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১/১৬৩-১৬৫

৭৫. ওয়াকিদির বর্ণনা কয়েক পৃষ্ঠা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেখানে ইবনে কাসির রহ. থেকে তার বর্ণনা খণ্ডনও উল্লেখ করা হয়েছে।-সম্পাদক

৭৬. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/১৬৫

উসমান রা.-এর খেলাফতকালের অবদান ও ঘটনা

• উমর রা.-এর মৃত্যুর পর খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করে উসমান রা. পারস্য বিজয় অভিযান সম্পন্ন করার জন্য সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন।

• কাস্পিয়ান সাগরের পূর্বে অবস্থিত রায় অঞ্চলে প্রেরণ করেন একটি বাহিনী। এ বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন প্রখ্যাত সাহাবি আবু মুসা আশআরি রা.। এ অভিযানে তিনি বিজয় লাভ করেন। এরপর রোমকদের বেশ কয়েকটি কেল্লা এবং দুর্গে আক্রমণ করেন।

• এ সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার একটি হচ্ছে উসমান রা. ২৪ হিজরিতে সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা.-কে কুফার গভর্নর হিসাবে নিয়োগ দেন। পূর্ব থেকেই এ শহর ছিল বিশৃঙ্খলাপূর্ণ। সবসময় তারা শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এসেছে। ২৫ হিজরিতে তারা নতুন করে সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা.-এর বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ ঘোষণা করে। উসমান রা. সাদ রা.-কে সরিয়ে ওয়ালিদ ইবনে উকবা ইবনে আবু মুইত রা.-কে তার স্থলাভিষিক্ত করেন।

• ২৬ হিজরিতে ওয়ালিদ ইবনে উকবা রা.-এর হাতেই বিজিত হয় কাস্পিয়ান সাগরের পশ্চিমে অবস্থিত আজারবাইজান এবং আর্মেনিয়া অঞ্চল।

• এ সময় (২৬ হিজরিতে) উসমান রা. মসজিদে নববির সম্প্রসারণের কাজে হাত দেন।

• এ বছরই (২৬ হিজরিতে) বিজিত হয় পারস্যের পূর্বাঞ্চলীয় সাবুর রাজ্য। যা ছিল ঘনবসতিপূর্ণ সমৃদ্ধশীল একটি ধনী রাজ্য। এ অঞ্চলের খারাজ (ট্যাক্স) ছিল ৩৩ লক্ষ দিরহাম। মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ব্যাপকভাবে কল্যাণের বাতাস বইতে শুরু করে এ সময়।

• ২৭ হিজরিতে বিজিত হয় পারস্যের আরজান[৭৭] অঞ্চল। মিশরের দায়িত্ব থেকে বরখাস্ত করা হয় আমর ইবনুল আস রা.-কে। তিনি উমর রা.-এর পক্ষ থেকে সেখানকার গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাকে বরখাস্ত করার কারণ

---

৭৭. খ্রিষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে এ শহর ধ্বংস হয়ে যায়। এ অঞ্চলের বর্তমান নাম বেবাহ। যা ইরানের খুজেস্তান প্রদেশে অবস্থিত।-অনুবাদক

ছিল, তিনি মিশরের আহলে কিতাবদের জিজয়ার পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছিলেন এবং তাতেই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। এ বছর বিজয় অভিযান সম্প্রসারিত হয় বুরকা শহর পর্যন্ত। যা বর্তমানে লিবিয়ার অন্তর্গত। মিশরের নতুন গভর্নর নিয়োগ করা হয় আবদুল্লাহ ইবনে সাদ ইবনে আবু সারহ রা.-কে। তিনি পুনরায় আমর ইবনুল আস রা.-এর শাসনকালের শুরুরদিকের মতো জিজয়া চালু করেন। এদিকে তিনি মিশর থেকে পশ্চিম অভিমুখে বিজয় অভিযান শুরু করেন এবং বর্তমান তিউনিসিয়া অভিমুখে বাহিনী প্রেরণ করেন। এ বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন উকবা ইবনে নাফে রা.।

• ২৮ হিজরিতে বিজিত হয় সাইপ্রাস অঞ্চল। তৎকালীন ইসলামি সাম্রাজ্যের জন্য এ ছিল বিরাট অগ্রগতি। কারণ, ইতিপূর্বে মুসলিমদের কোনো নৌবহর ছিল না। উমর ইবনুল খাত্তাব রা. নৌযুদ্ধে সম্মত ছিলেন না। তিনি মুসলিমদের জন্য নৌযুদ্ধকে ঝুঁকিপূর্ণ মনে করতেন। তবে মুআবিয়া রা. এ ব্যাপারে বেশ জোর দেন এবং উসমান রা.-এর কাছে বারংবার নৌবাহিনী গঠনের প্রস্তাব পেশ করেন। অবশেষে উসমান রা. তার প্রস্তাব মেনে নেন। ইসলামি নৌবাহিনীর প্রথম অভিযান ছিল সাইপ্রাস অঞ্চলে। এই বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রা. এবং মিশরের গভর্নর আবদুল্লাহ ইবনে সাদ ইবনে আবু সারহ রা.। তারা দুজন সাইপ্রাস অবরোধ করেন। অবশেষে তা বিজিত হয়। এ সময় আফ্রিকা বিজয় সম্পন্ন হয় এবং পূর্ব ও উত্তর আফ্রিকা অঞ্চলে ইসলামি সাম্রাজ্যের স্তম্ভ শক্তিশালী হয়।

• ২৯ হিজরিতে পারস্যের এস্তাখার নামক অঞ্চল বিদ্রোহ করে মুসলিমদের সঙ্গে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করে। উসমান রা. তখন এ শহর অভিমুখে বাহিনী প্রেরণ করেন এবং তা পুনরায় বিজিত হয়।

• এ বছরই (২৯ হিজরিতে) দ্বিতীয়বারের মতো মসজিদে নববিকে সম্প্রসারণ করা হয়।

• ৩০ হিজরিতে বিজিত হয় খোরাসান, নিশাপুর এবং কোস শহর। ফলে ইসলামি সাম্রাজ্যের ট্যাক্স বৃদ্ধি পায় ব্যাপক হারে। নিজেদের চিরায়ত অভ্যাস অনুযায়ী কুফাবাসী আবার বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসে ওয়ালিদ ইবনে উকবা রা.-এর বিরুদ্ধে। ফলে সেখান থেকে তাকে সরিয়ে নিয়োগ দেওয়া হয় সাইদ ইবনুল আস রা.-কে।

• হাসান বসরি রহ. ছিলেন সেই সময়ের প্রসিদ্ধ একজন তাবেয়ি। তিনি উসমান রা.-এর শাসনামলের এ সময় সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়ে বলেন, উসমান রা.-এর ওপর বিদ্বেষীরা কী কারণে ক্ষুব্ধ হয়েছে আমি তা বুঝতে পারি। তার সময়ে এমন দিন খুব কমই ছিল, যেদিন লোকেরা ধনসম্পদ ভাগাভাগি করে নেয়নি। তিনি বলতেন, হে মুসলিমগণ, তোমাদের ভাতা সংগ্রহ করো। এরপর তারা সেখান থেকে পূর্ণরূপে গ্রহণ করতেন। তিনি পুনরায় বলতেন, তোমাদের ভাতা সংগ্রহ করো। তারা সেখান থেকেও পূর্ণরূপে গ্রহণ করতেন। তিনি বলতেন, ঘি ও মধু গ্রহণ করুন। এভাবে মুসলিমদের ভাতা অব্যাহত ছিল। শত্রুরা ছিল দূরে। মুসলিমদের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল সুন্দর। কল্যাণের প্রাচুর্য ছিল। কোনো মুসলিম অপর মুসলিম ভাইকে ভয় পেত না। তাদের সকলের মধ্যেই ছিল ভ্রাতৃত্বের বন্ধন।[৭৮] তখন মুসলিমরা ছিলেন খুবই সচ্ছল। ইতিপূর্বে কখনো তারা এতটা সচ্ছল ছিলেন না।

• এ সময় উসমান রা. হাত দেন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজে। ব্রতী হন এক মলাটে কুরআন সংরক্ষণের প্রতি। এর কারণ, তখন পুরো শাম এবং রোম সাম্রাজ্য বিজয় অভিযানে শাম ও ইরাকের মুসলিমরা যোগ দিয়েছিলেন। সেসব অভিযানে অংশ নেওয়া হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান রা. লোকেদের কুরআন তেলাওয়াতে ব্যাপক পার্থক্য দেখতে পান। প্রত্যেক অঞ্চলের মানুষ কুরআন তেলাওয়াত করত ভিন্ন ভিন্ন কেরাত অনুযায়ী। শাম তথা বৃহত্তর সিরিয়ার অধিবাসীরা তেলাওয়াত করত মিকদাদ ইবনে আমর রা. এবং আবু দারদা রা.-এর কেরাত অনুযায়ী। ইরাকের অধিবাসীরা তেলাওয়াত করত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এবং উবাই ইবনে কাব রা.-এর কেরাত অনুযায়ী। সে সময় কিছু অজ্ঞ—যারা জানত না যে কুরআন সাত হরফে[৭৯] অবতীর্ণ হয়েছে—তারা একে অপরের কেরাতকে ভুল আখ্যা দিতে শুরু করে। এমনকি ব্যাপারটা একে অপরকে কাফের সাব্যস্ত করা পর্যন্ত গড়িয়ে যায়।

এ অবস্থা দেখে হুজাইফা রা. উসমান রা.-এর কাছে এসে বলেন, মুসলিম উম্মাহর লাগাম টেনে ধরুন।

---

৭৮. *আল-ইসতিয়াব*, ৩/১০৪১; *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, ৩৯/২২৭; *তাহযিবুল কামাল*, ১৯/৪৫১

৭৯. **সাত হরফ :** এর ব্যাখ্যা নিয়ে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আবু উবাইদ রহ. প্রমুখ মুফাসরিরের মতে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে সাত গোত্রের সাতটি ভাষা। কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রসিদ্ধ সাত কেরাত। এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে।

এ সময় উসমান রা. যায়দ ইবনে সাবেত রা.-কে তলব করেন। তিনি আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর আমলে কুরআন সংকলনের কাজ করেছিলেন। উসমান রা. তাকে তার সংকলিত কুরআনের পাণ্ডুলিপিগুলো একত্র করতে বলেন। এগুলো প্রথমে ছিল আবু বকর রা.-এর কাছে। এরপর আসে উমর রা.-এর কাছে। তিনি ইন্তেকালের সময় তার মেয়ে উম্মুল মুমিনিন হাফসা রা.-এর কাছে এই পাণ্ডুলিপিগুলো রেখে যান। যায়দ ইবনে সাবেত রা. তখনই হাফসা রা.-এর কাছ থেকে পাণ্ডুলিপিগুলো নিয়ে আসেন।

সাইদ ইবনুল আস উমাবি রা., যায়দ ইবনে সাবেত আনসারি রা.,আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের ইবনুল আওয়াম আসাদি রা. এবং আবদুর রহমান ইবনে হারেস ইবনে হিশাম মাখযুমি রহ. এই চারজনকে উসমান রা. নিয়োগ দেন। আবু বকর রা.-এর যুগে যায়দ ইবনে সাবেত রা. যে কেরাতে কুরআন একত্র করেছেন সেই কেরাতেই কুরআনের একটি পাণ্ডুলিপি লিপিবদ্ধ করার আদেশ দেন। সুতরাং উসমান রা. নতুন কোনো কেরাত সংযুক্ত করেননি। বরং ইতিপূর্বে আবু বকর রা.-এর সময়ে যেভাবে সংকলন করা হয়েছিল সেগুলোকেই তিনি নতুনভাবে সংকলন করেন।

সাইদ ইবনুল আস রা. তেলাওয়াত করতেন, যায়দ ইবনে সাবেত রা. তা শুনে শুনে লিখতেন আর আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. এবং আবদুর রহমান ইবনে হারিস রহ. তখন উপস্থিত থেকে যাবতীয় বিষয়ের তদারকি করতেন। এভাবেই পূর্ণ কুরআন লিপিবদ্ধের কাজ সম্পন্ন হয় এবং এর সাতটি কপি করা হয়।

অন্যান্য সাহাবিগণের কাছে যেসব পাণ্ডুলিপি ছিল[৮০] এবং যেগুলোর বিন্যাস রাসুল ﷺ-এর মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে দশম হিজরির রমজান মাসে যেভাবে তিনি ও জিবরাইল আ. একে অপরকে কুরআন শুনিয়েছিলেন সে বিন্যাসের চেয়ে ভিন্ন ছিল, সেগুলোকে উসমান রা. পুড়িয়ে ফেলেন। এটি ছিল খুবই কষ্টকর একটি কাজ।

উসমান রা. যে কুরআন সংকলন করেছিলেন সেগুলোর একেকটি পাণ্ডুলিপির আয়তন ছিল ৮০×৬০ সেন্টিমিটার। একটি পাণ্ডুলিপি বহন করতে একদল

---

৮০. সাহাবিগণের একক সূত্রে বর্ণিত কুরআনের আয়াত বা সাহাবিগণকর্তৃক কুরআনের ব্যাখ্যামূলক কথা সম্বলিত কপিগুলোই মূলত পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। *মানাহিলুল ইরফান*, ১/২৬০-২৬১; (শামেলা)-সম্পাদক

লোকের প্রয়োজন হতো। উসমান রা. সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে একটি করে কপি পাঠিয়ে দেন। মদিনা মুনাওয়ারায় রাখেন এক কপি। এক কপি পাঠান মক্কায়। তৃতীয় কপি মিশরে, চতুর্থ কপি শামে, পঞ্চম কপি কুফায়, ষষ্ঠ কপি বসরায় এবং সপ্তম কপি পাঠান ইয়ামেনে।

এভাবেই সকল মুসলিমের জন্য এক কেরাতে কুরআন সংকলন করা হয়। কুরআনের এই সংকলিত পাণ্ডুলিপিকে বলা হয় মুসহাফে উসমানি। যদিও উসমান রা. তাতে একটি হরফও (বর্ণও) লেখেননি; বরং তিনি তা সংকলন এবং পাণ্ডুলিপি আকারে তৈরির নির্দেশ দিয়েছিলেন মাত্র।[৮১]

- ৩১ হিজরিতে মুসলিম বাহিনী এক ঐতিহাসিক নৌ-অভিযানে অংশগ্রহণ করে। যা যাতুস সাওয়ারি নামে প্রসিদ্ধ।

- ৩৪ হিজরিতে অনেক প্রসিদ্ধ সাহাবি ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ফিতনায় জড়িয়ে পড়ার অনিষ্ট থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, আব্বাস ইবনে আবদিল মুত্তালিব রা., আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা., আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা., আবু দারদা রা., আবু যর রা. এবং যায়দ ইবনে আবদি রাব্বিহ রা. প্রমুখ। শেষোক্ত সাহাবি স্বপ্নে আজানের বাক্যগুলো শুনেছিলেন। রাসুল ﷺ-এর কাছে গিয়ে তার স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করেছিলেন। তখন রাসুল ﷺ-ও তার সঙ্গে একমত হয়েছিলেন।

- উসমান রা.-এর শাসনামলে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের কিছু অংশও বিজিত হয়। তবে মুআবিয়া রা.-এর শাসনামলে এসব অঞ্চল পরিপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণে আসে।

- ৩৩ হিজরিতে বিজিত হয় হাবাশা অঞ্চল অর্থাৎ সুদানের কিছু অংশ।

- ৩৪ হিজরিতে কুফাবাসী পুনরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে গভর্নর সাইদ ইবনুল আস রা.-এর বিরুদ্ধে। তখন কুফাবাসীদের আগ্রহে সেখানে নিয়োগ দেওয়া হয় আবু মুসা আশআরি রা.-কে। উসমান রা. তাদের আগ্রহের সঙ্গে একমত হয়েছিলেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ।

- ৩৪ হিজরিতেই ফিতনার বড় বড় পর্বগুলো (ক্রমেই) স্পষ্ট আকার ধারণ করতে শুরু করে। এর প্রেক্ষিতেই ৩৫ হিজরিতে উসমান রা. পান করেন

৮১. *তারিখু ইবনি খালদুন*, ২/৫৮৩

শাহাদাতের অমীয় সুধা। এর মাধ্যমেই সমাপ্ত হয় উসমান রা.-এর বর্ণাঢ্য জীবন। যে জীবন তিনি ব্যয় করেছিলেন আল্লাহ তাআলার প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে। যার কারণে জীবদ্দশাতেই রাসুল ﷺ তাকে দিয়েছিলেন জান্নাতের সুসংবাদ।

উসমান রা. জানতেন কী ঘটবে তার সঙ্গে

নিঃসন্দেহে উসমান রা.-এর হত্যাকাণ্ড বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে। তবে তার আগে আমাদের জেনে রাখা উচিত যে, উসমান রা. আগে থেকেই আঁচ করতে পেরেছিলেন যে, তিনি এই ফিতনায় হত্যাকাণ্ডের শিকার হতে যাচ্ছেন। কেননা এ ব্যাপারে রাসুল ﷺ পূর্বেই সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন।

*সহিহ বুখারি*তে কাতাদা রহ. থেকে আনাস ইবনে মালেক রা.-এর সূত্রে বর্ণিত আছে, একবার রাসুল ﷺ উহুদ পাহাড়ে উঠলেন। তার সঙ্গে ছিলেন আবু বকর রা., উমর রা. ও উসমান রা.। তখন উহুদ পাহাড় কেঁপে উঠলে রাসুল ﷺ বলেন,

> উহুদ, তুমি স্থির হও। তোমার ওপরে আছে একজন নবী, একজন সিদ্দিক এবং দুইজন শহিদ।[৮২]

অপর হাদিসে আবু মুসা আশআরি রা.-এর সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

> আমি রাসুল ﷺ-এর সঙ্গে মদিনার কোনো এক বাগানে ছিলাম। তখন একজন লোক এসে দরজা খোলার অনুরোধ করলেন। রাসুল ﷺ বললেন, খুলে দাও এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। তখন আমি দেখি তিনি আবু বকর রা.। আমি দরজা খুললাম এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিলাম। তারপর আরেক ব্যক্তি দরজা খোলার অনুরোধ করলেন। রাসুল ﷺ বললেন, খুলে দাও এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। তখন আমি দেখলাম তিনি উমর রা.। আমি দরজা খুলে দিলাম এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিলাম। তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন। তারপর আরেক ব্যক্তি দরজা খোলার অনুরোধ করলেন। তখন রাসুল ﷺ বললেন, দরজা খুলে দাও এবং তাকে আসন্ন বিপদ-সহ জান্নাতের সুসংবাদ দাও। আমি গিয়ে দেখি তিনি উসমান ইবনে আফফান রা.। আমি দরজা খুলে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিলাম

---

৮২. *সহিহ বুখারি*, ৩৬৭৫; *সুনানু আবি দাউদ*, ৪৬৫১; *সুনানুত তিরমিজি*, ৩৬৯৭

এবং রাসুল ﷺ যা বলেছেন তার বর্ণনা দিলাম। তখন উসমান রা. আল্লাহর প্রশংসা করার পর বললেন, আল্লাহ সহায় হোন।[৮৩]

আবদুল্লাহ ইবনে আবু কায়স রহ.-এর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, নোমান ইবনে বশির রা. তাকে বলেছেন, একবার মুআবিয়া রা. একটি চিঠি লিখে আমাকে দিয়ে আয়েশা রা.-এর কাছে পাঠালেন। আমি আয়েশা রা.-এর কাছে এসে তাকে মুআবিয়া রা.-এর চিঠিটি দিলাম। তখন আয়েশা রা. আমাকে বললেন, বৎস, তোমাকে কি রাসুল ﷺ থেকে শোনা একটি হাদিস শোনাব? আমি বললাম, অবশ্যই।

তিনি বললেন, একদিন আমি এবং হাফসা রা. রাসুল ﷺ-এর কাছে বসা ছিলাম। তখন রাসুল ﷺ বললেন, যদি কোনো লোক এসে আমাদের সঙ্গে কথা বলত।

আমি বললাম, আপনার পক্ষ থেকে কি আবু বকর রা.-এর কাছে সংবাদ পাঠাব? এ কথা শুনে তিনি চুপ রইলেন। আবার বললেন, যদি কোনো লোক এসে আমাদের সঙ্গে বলত।

তখন হাফসা রা. বললেন, তাহলে আপনার পক্ষ থেকে উমর রা.-এর কাছে সংবাদ পাঠাই? এ কথা শুনেও তিনি চুপ রইলেন। একটু পর বললেন, না। এরপর একজন লোককে ডেকে গোপনে কিছু বললেন। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই উসমান রা. এসে উপস্থিত হলেন। তখন রাসুল ﷺ তার মুখোমুখি হয়ে কথা বলা শুরু করলেন। আমি শুনেছি, রাসুল ﷺ তাকে বলেছেন, হে উসমান, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাকে সম্মানের পোশাক পরিধান করাবেন। যদি তারা এ পোশাক খুলে ফেলতে বলে, তবে তুমি খুলবে না। এ কথা তিনবার বলেন।[৮৪] শায়খ আলবানি রহ. হাদিসটিকে সহিহ[৮৫] বলেছেন।

---

৮৩. *সহিহ বুখারি*, ৩৬৯৩; *সুনানুত তিরমিজি*, ৩৭১০; *সহিহ ইবনি হিব্বান*, ৬৯১০

৮৪. *আল-মুসনাদ লিল ইমাম আহমাদ*, ২৫১৬২; *সুনানুত তিরমিজি*, ৩৭০৫; *সুনানু ইবনি মাজাহ*, ১১২

৮৫. **সহিহ হাদিস :** সহিহ হাদিস নির্ভরযোগ্য হাদিসের একটি প্রকার। এ প্রকারের হাদিস নির্ভরযোগ্য সূত্রে নবীজি ﷺ থেকে প্রমাণিত। এ ধরনের হাদিস দ্বারা শরিয়তের বিধিবিধান সাব্যস্ত হয়। বিস্তারিত দেখুন, *তাদরিবুর রাবি*, ১/১৭১-সম্পাদক

ইমাম তিরমিজি রহ. আবুল আশআস সানআনি রহ.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, একবার শামে কয়েকজন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বক্তব্য দিলেন। তাদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন রাসুল ﷺ-এর সাহাবি। সর্বশেষ মুররা ইবনে কাব নামক একজন সাহাবি দাঁড়িয়ে বললেন, আমি যদি রাসুল ﷺ থেকে একটি হাদিস না শুনতাম তাহলে আজ দাঁড়াতাম না। রাসুল ﷺ ফিতনার কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন, শীঘ্রই তা সংঘটিত হবে। বর্ণনাকারী (আবুল আশআস সানআনি) বলেন, সে সময় এক ব্যক্তি কাপড় দিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে সেখান দিয়ে অতিক্রম করলে রাসুল ﷺ (লোকটিকে ইঙ্গিত করে) বলেন, সে সময় এই লোকটি সৎপথে অটল থাকবে। বর্ণনাকারী (আবুল আশআস সানআনি) বলেন, আমি উঠে তার কাছে যাই; দেখি, তিনি উসমান ইবনে আফফান রা.। তারপর আমি তাকে নিয়ে রাসুল ﷺ-এর কাছে এসে প্রশ্ন করলাম, ইনিই কি সেই (সৎপথে অটল) ব্যক্তি? তিনি বললেন, হ্যাঁ।[৮৬]

ইমাম তিরমিজি রহ. হাদিসটিকে 'হাসান' 'সহিহ' (নির্ভরযোগ্য ও প্রমাণযোগ্য) আখ্যা দিয়েছেন। ইমাম ইবনে মাজাহ রহ.-ও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। শায়খ আলবানি হাদিসটিকে সহিহ আখ্যা দিয়েছেন।

এসব হাদিসে পূর্ব থেকেই উসমান রা.-কে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল যে, এই ফিতনা শীঘ্রই সংঘটিত হবে। সে সময় উসমান রা. সঠিক পথে থাকবেন এবং হত্যাকাণ্ডের শিকার হবেন। ফলে তিনি প্রবেশ করবেন জান্নাতে। পরবর্তী ঘটনা পরিক্রমায় রাসুল ﷺ-এর এসব ভবিষ্যদ্‌বাণী বেশ প্রভাব রেখেছিল। যা আমরা সামনে বিস্তারিত আলোচনায় দেখতে পাব।

উসমান রা.-এর শাসনামলের অনেক উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। ইসলামি সাম্রাজ্যের ইতিহাসে তার শাসনামল ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক অধ্যায়। এসব কল্যাণ, কৃতিত্ব এবং অবদানসত্ত্বেও ঘটেছিল ফিতনার সেই মর্মান্তিক ঘটনা। তার খেলাফতের সময়ে মুসলিমরা সচ্ছলতায় দিন কাটাচ্ছিল, রিজিকের কোনো অভাব ছিল না। খলিফা নিজেই ডেকে বলতেন, তোমাদের ভাতা সংগ্রহ করো। মোটকথা, তার শাসনামল ছিল সচ্ছলতার স্বর্ণযুগ। এতৎসত্ত্বেও ফিতনা সংঘটিত হয়েছিল এবং তাকে বরণ করতে হয়েছিল নিদারুণ পরিণতি।

---

৮৬. *সুনানুত তিরমিজি*, ৩৭০৪

ইবনে সাবার আত্মপ্রকাশ ও ফিতনার সূচনা

৩০ থেকে ৩১ হিজরির মাঝামাঝি সময়ে ইয়ামেনে আবদুল্লাহ ইবনে সাবার আত্মপ্রকাশ ঘটে। তার মা ছিল এক কৃষ্ণাঙ্গ বাঁদি। এজন্য তাকে ইবনুস সাওদা অর্থাৎ কালো বাঁদির ছেলে বলা হয়। সে ছিল ইহুদি। জীবনের দীর্ঘ সময় সে ইয়ামেনে কাটায়। ইসলাম আগমনের পূর্বে ইয়ামেন ছিল পারস্যের অন্তর্গত একটি প্রদেশ। ফলে আবদুল্লাহ ইবনে সাবা অগ্নিপূজারি পারসিকদের থেকে অনেক কিছুই শিখতে পারে। এই ইহুদিই ইসলাম ধর্ম এবং মুসলিম উম্মাহর ওপর আঘাত হানার হীন লালসা পোষণ করে ফিতনা সৃষ্টির প্রয়াস চালায়।

উসমান রা.-এর শাসনামলের শুরুতে সে বাহ্যত ইসলাম গ্রহণ করে এবং বিভিন্ন দেশে গিয়ে তার ইসলামবিদ্বেষী বিষাক্ত মতবাদ প্রচার করতে শুরু করে। প্রথমে সে যায় হিজাযে। সেখানকার পরিবেশ অনুকূল না হওয়ায় ইরাকের দিকে রওনা হয়ে বসরায় চলে যায়। যা আগে থেকেই ফিতনার ভূমি ছিল। এখানে তার সাক্ষাৎ ঘটে হাকিম ইবনে জাবালা নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে। যদিও সে মুসলিম ছিল, তবে সে ছিল চোর। জিম্মিদের সম্পদ সে গ্রাস করে নিত। খলিফা তাকে গৃহবন্দি করে রাখতে আদেশ দিয়েছিলেন, যেন সে বসরা ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে না পারে। তার স্বভাবচরিত্রও ছিল খারাপ।

ইবনে সাবা পেয়ে যায় তার উপযুক্ত শিষ্য। সে একটু একটু করে হাকিম ইবনে জাবালাকে ইহুদি এবং অগ্নিপূজারি মতবাদের সংমিশ্রণে তৈরি তার নব্য মতাদর্শে দীক্ষিত করতে শুরু করে। আবদুল্লাহ ইবনে সাবার এই মতাদর্শ থেকেই শিয়াদের আকিদা-বিশ্বাসের সূত্রপাত। শিয়ারা অনেক ভাগে বিভক্ত। সেসবের মধ্যে একদল সম্পূর্ণরূপে ইবনে সাবার অনুসরণ করেছে, যাদেরকে বর্তমানে শিয়ায়ে সাবাইয়্যাহ বলা হয়। আবার কোনো কোনো দল ইবনে সাবার আংশিক অনুসরণ করেছে। আবার কেউ অনুসরণ করেছে সামান্য কিছু ক্ষেত্রে। কিন্তু ব্যাপকভাবে সমস্ত শিয়াই আবদুল্লাহ ইবনে সাবার বিষাক্ত মতবাদ থেকে কিছু না কিছু গ্রহণ করেছে।

হাকিম ইবনে জাবালা তার কিছু বন্ধু এবং সগোত্রীয় কিছু লোক-সহ ইবনে সাবার অনুসরণ করে। এসব কাজ চলছিল গোপনে। শুরুতে সে প্রকাশ্যে এসব করার দুঃসাহস করেনি। এরপর সে বসরা থেকে চলে যায় কুফায়; যা ছিল ফিতনার আরেক ঘাঁটি, বিদ্রোহের স্বর্গরাজ্য। কুফাবাসীদের অনেকেই ইবনে সাবার অনুসরণ করে। কিন্তু সেখানেও তার কার্যক্রম গোপনেই চলছিল। ইবনে সাবার অনুসারীদের একজন ছিল আশতার নাখায়ি। তার ব্যাপারটি ছিল খুবই

আশ্চর্যজনক। কারণ, সে ছিল ইয়ারমুক এবং পরবর্তী যুদ্ধসমূহে একজন সক্রিয় মুজাহিদ। কিন্তু আল্লাহ তাআলা যাকে চান তাকে দ্বীনের ওপর অটল রাখেন। আশতার নাখায়ি হয়তো নিজের অজ্ঞতাবশত কিংবা নেতৃত্বের লোভে কিংবা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ইবনে সাবার ডাকে সাড়া দেয়।

আশতার ছিল তার গোত্রে অত্যন্ত প্রভাবশালী। তাই সে তার গোত্রের মানুষদের কাছে নিজের মতাদর্শ প্রচার শুরু করে। কিছু ইতিহাসবিদ আশতারের এই সম্পৃক্ততার বিভিন্ন কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। তবে প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন মত প্রদান করেছেন। প্রথম কারণ হিসাবে বলা হয়, সে ছিল ধর্মীয় কিছু কিছু বিষয়ে খুবই কঠোর। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সে অতি বাড়াবাড়ি করে সেগুলোকে ভুল মনে করেছিল। দ্বিতীয় কারণ হিসাবে বলা হয়, তার মধ্যে নেতৃত্ব ও প্রতিপত্তির লোভ ছিল। তাই নিজের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে সে বিশৃঙ্খলাকারীদের সঙ্গে যোগ দেয়।

এরপর ইবনে সাবা চলে যায় মিশরে। সেখানে তার মতবাদ প্রচারের উর্বর ভূখণ্ড পেয়ে যায়। কারণ, তখন অধিকাংশ মুসলিম বেরিয়ে গিয়েছিলেন লিবিয়া এবং সুদানের বিভিন্ন অভিযানে। অল্প কিছু মুসলিম সেখানে ছিলেন। ফলে ইবনে সাবা অল্প কিছু লোককে তার পাশে সমবেত করতে সক্ষম হয় এবং মিশরেই স্থায়ী হয়ে যায়। মিশরে স্থায়ী হওয়া তার উদ্দেশ্য ছিল না। কেননা তার অভ্যাস ছিল যেখানেই যেত সেখানেই একটা সময় পর্যন্ত অবস্থান করত। এরপর সেখান থেকে চলে যেত অন্য কোনো স্থানে। সে যখন মিশরে অবস্থান করতে থাকে তখন ফিতনার সময় প্রায় ঘনিয়ে এসেছিল। তাই সে মিশর থেকে প্রস্থান করে।

ইবনে সাবার চিন্তাধারা

ইবনে সাবার চিন্তাধারা ও মূল লক্ষ্য ছিল ইসলামকে ধ্বংস করা এবং মুসলিমদের মনে ইসলামের ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টি করা। তার ধ্বংসাত্মক কিছু চিন্তাধারা হচ্ছে—

এক. রজআতের বিশ্বাস (প্রত্যাবর্তনের বিশ্বাস) : শিয়াদের নিকট এটি খুবই দৃঢ় এক বিশ্বাস। যার ভিত্তি হচ্ছে অগ্নিপূজারি ধর্ম। ইহুদি ধর্মেও আল্লাহ তাআলার ওপর মিথ্যাচারমূলক এই আকিদার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ইহুদিরা নিজেদের হাতে বই লিখে বলে এটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রেরিত। এই বিশ্বাসের কথা ইবনে সাবা এভাবে বলেছে, ঈসা আ. যদি পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারেন, তাহলে মুহাম্মাদ ﷺ কেন নয়? তিনি অবশ্যই ফিরে আসবেন। শিয়ারা আরও আগ বাড়িয়ে বলে, শুধু মুহাম্মাদ ﷺ-ই নয়; বরং আলি রা. ও অন্যরাও ফিরে আসবেন।

কিন্তু এই বিশ্বাসের উৎস হচ্ছে অগ্নিপূজারি ধর্ম এবং ইহুদিদের মিথ্যাচার। ইবনে সাবা তার মতাদর্শ প্রচার করত অজ্ঞ এবং মূর্খদের মধ্যে। তারা তাকে সত্যায়ন করত। একদিন এক ব্যক্তি তাকে মুহাম্মাদ ﷺ-এর পুনরায় ফিরে আসাসংক্রান্ত দলিল জিজ্ঞাসা করে। তখন সে বলে, আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ﴾

যিনি আপনার প্রতি কুরআনের দায়িত্বভার অর্পণ করেছেন, তিনি অবশ্যই আপনাকে প্রত্যাবর্তনস্থলে ফিরিয়ে আনবেন। [সুরা কাসাস : ৮৫]

তার কথা অনুযায়ী এই প্রত্যাবর্তনস্থল হচ্ছে পৃথিবী। এ কথার মাধ্যমে সে কিছু অজ্ঞ মানুষকে প্রতারিত করেছে।[৮৭]

দুই. অসায়ার বিশ্বাস (অসিয়তের বিশ্বাস) : ইবনে সাবার বক্তব্য অনুযায়ী আদম আ. থেকে শুরু করে মুহাম্মাদ ﷺ পর্যন্ত নবুয়ত, অসিয়তের মাধ্যমে চলমান ছিল। অর্থাৎ প্রত্যেক নবীই তার পরবর্তী নবীর জন্য অসিয়ত করে গিয়েছেন। এটি ছিল তার স্পষ্ট বিকৃতি এবং মিথ্যাচার। সে বলে, যেহেতু হাজার হাজার নবী তাদের পরবর্তী নবীর জন্য অসিয়ত করে গিয়েছেন তাহলে মুহাম্মাদ ﷺ শেষ নবী হয়েও কেন তার পরবর্তী কারও জন্য অসিয়ত করবেন না? তিনিও কাউকে অসিয়ত করে গিয়েছেন। প্রথমে সে এতটুকু বলেই ক্ষান্ত হয়। এরপর সে এমন একজন লোক অনুসন্ধান করতে থাকে, যার নাম মানুষ প্রত্যাখ্যান করতে দ্বিধাবোধ করবে। এরপর সে বলে, মুহাম্মাদ ﷺ নবুয়তের অসিয়ত করেছেন আলি রা.-কে। আমি তার কাছ থেকেই তা জেনেছি। এবার সে রাসুল ﷺ-এর নামে মিথ্যা হাদিস রচনা করে বলে, তিনি বলেছেন, আমি শেষ নবী, আর আলি সর্বশেষ অসিয়তপ্রাপ্ত অথবা সর্বশেষ অলি।

এটি একটি বানোয়াট হাদিস। শায়খ আলবানি রহ. তা স্পষ্ট করেছেন।[৮৮] এর সঙ্গে শিয়ারা আলি রা.-এর পর আরও কজন অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তি যোগ করে। এখান থেকেই অসিয়তের বিশ্বাস প্রকাশ পায়।

এরপর ইবনে সাবা তার অনুসারীদের বলে, তোমরা গভর্নরদের ওপর অপবাদ আরোপ করতে শুরু করো। এরপর সে আবদুল্লাহ ইবনে সাদ ইবনে

---

৮৭. *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, ৪/২৯; *তারিখুত তবারি*, ৪/৩৪০
৮৮. *সিলসিলাতুল আহাদিসিয যয়িফা ওয়াল মাওযুয়া*, ২/১৩৬

আবু সারহ রা., ওয়ালিদ ইবনে উকবা রা., সাইদ ইবনুল আস রা. ও আবদুল্লাহ ইবনে আমের প্রমুখ রা., যাদেরকে উসমান রা. গভর্নর নিয়োগ করেছিলেন, তাদের ব্যাপারে নেতিবাচক কথা লিখে বিভিন্ন জনপদে চিঠি পাঠাতে শুরু করে। সে তার অনুসারীদের বলে, যখন তোমরা মানুষের কাছে এ বিষয়ের (গভর্নরদের ওপর মিথ্যাচারের) দাওয়াত নিয়ে যাবে, তখন বলবে, আমরা সৎ কাজের আদেশ করি এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করি। যেন তারা তোমাদের কথা প্রত্যাখ্যান করতে না পারে।[৮৯]

যারা ছিল ইবনে সাবার অনুসারী

বেশ কয়েকটি গোত্র এবং দল ইবনে সাবার অনুসরণ করে। তাদের মধ্যে একদল মুখে মুখে ইসলাম গ্রহণ করলেও ভেতরে লুকিয়ে রেখেছিল কুফর এবং নেফাক (কপটতা)। আরেকদল ছিল নেতৃত্ব এবং ক্ষমতালোভী, যাদেরকে উসমান রা. মন্দ স্বভাব কিংবা তাদের চেয়ে যোগ্য ব্যক্তি থাকার কারণে গভর্নর পদে নিয়োগ দেননি। আরেকদল হচ্ছে, যাদের ওপর অথবা তাদের নিকটস্থ কারও ওপর উসমান রা. শরয়ি শাস্তি প্রয়োগ করেছিলেন। ফলে তারা প্রতিশোধ গ্রহণে আগ্রহী ছিল। আরেকদল ছিল অজ্ঞ, যাদের ছিল জ্ঞানের স্বল্পতা। সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধের মুখরোচক স্লোগান দিয়ে ইবনে সাবা তাদের মন জয় করে নিয়েছিল, যেন সে উসমান রা.-এর হত্যাকল্পে সফল হতে পারে।

গভর্নরদের দোষারোপ করার পর সে স্বয়ং খলিফাকে দোষারোপ করতে শুরু করে। উসমান রা.-এর ব্যাপারে কিছু মিথ্যা দোষের কথা লিখে ইবনে সাবা বিভিন্ন শহর এবং জনপদে পাঠিয়ে দেয়। ব্যাপারটি মুসলিম গভর্নরবৃন্দ এবং খলিফার কাছেও পৌঁছায়। তখন তিনি বেশ কয়েকজন সাহাবিকে প্রেরণ করেন লোকদেরকে বিষয়টি বুঝিয়ে তাদের সন্দেহ দূর করার জন্য। মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা রা.-কে প্রেরণ করেন কুফায়। উসামা ইবনে যায়দ রা.-কে প্রেরণ করেন বসরায়, আম্মার ইবনে ইয়াসির রা.-কে প্রেরণ করেন মিশরে এবং আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-কে প্রেরণ করেন শামে।

শামের লোকেরাই এই ফিতনার মাধ্যমে সবচেয়ে কম প্রভাবিত হয়েছিল। সেখানে মুআবিয়া রা. অত্যন্ত প্রজ্ঞা ও সহনশীলতার সঙ্গে লোকেদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন। লোকেরাও তাকে খুব পছন্দ করত। তাই সেখানকার লোকেরা ইবনে সাবার আহ্বানকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে। এরপর সে আবু

---

৮৯. *তারিখুত তবারি*, ৪/৩৪১; *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, ৪/২৯; *আল-কামিল ফিত তারিখ*, ২/৫২৬

যর গিফারি রা.-এর নিকটে যায়। তিনি ছিলেন একজন মহান সাহাবি এবং একেবারেই দুনিয়াবিমুখ। যারা তার জীবনী পড়েছেন তারা সকলেই এ কথা জানেন। ইবনে সাবা একদিন আবু যর গিফারি রা.-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় বলে, হে আবু যর, শামের অধিবাসীরা তো দ্বীন ভুলে দুনিয়া এবং বিলাসিতায় ডুবে আছে। এ কথা বলে সে আবু যর রা.-কে উত্তেজিত করতে চেয়েছিল। আবু যর গিফারি রা. তখন মুআবিয়া রা.-এর কাছে গিয়ে বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾

হে ঈমানদারগণ, ইহুদি পণ্ডিত ও খ্রিষ্টান সংসারবিরাগীদের অনেকে লোকদের মালামাল অন্যায়ভাবে ভোগ করে এবং আল্লাহর পথ থেকে লোকদের নিবৃত রাখে। আর যারা স্বর্ণ ও রুপা জমা করে রাখে এবং আল্লাহর পথে তা ব্যয় করে না, তাদেরকে কঠোর আজাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন। [সুরা তাওবা : ৩৪]

তিনি এই আয়াতের মাধ্যমে বুঝাতে চেয়েছেন, কোনো মানুষের জন্য একদিনের বেশি খাবার সঞ্চয় করা বৈধ হবে না। তবে তার এই দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামের মূলনীতির বিপরীত। তখন মুআবিয়া রা. বললেন, আপনি মানুষের ওপর সাধ্যাতীত কাজ চাপিয়ে দিচ্ছেন। রাসুল ﷺ তো এমনটি বলেননি। তবুও আবু যর রা. তার মতের ওপর অটল থাকেন। ফলে মুআবিয়া রা. উসমান রা.-এর নিকট এ ব্যাপারে চিঠি লিখে জানালে উসমান রা. আবু যর রা.-কে ডেকে পাঠান। তাদের মধ্যে এ নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলাপচারিতা হয়। যার বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তী সময়ে দেওয়া হবে। এ ব্যাপারেও উসমান রা.-কে দোষারোপ করা হয়ে থাকে। যেসব অপবাদের ক্ষেত্রে মানুষ ইবনে সাবার অনুসরণ করেছে তন্মধ্যে এটি একটি।

ইবনে সাবা আরেক বিশিষ্ট সাহাবি উবাদা ইবনে সামিত রা.-এর কাছেও যায় এবং তার সঙ্গেও একই আচরণ করে। তখন উবাদা ইবনে সামিত রা. ইবনে সাবাকে ধরে মুআবিয়া রা.-এর কাছে নিয়ে এসে বলেন, এই লোকই আপনার বিরুদ্ধে আবু যর গিফারি রা.-কে উত্তেজিত করেছে। তখন মুআবিয়া রা. ইবনে সাবার সঙ্গে কথা বলেন। মুআবিয়া রা. ছিলেন অত্যন্ত

সহনশীল। তার কাছে ইবনে সাবা তার সমস্ত কথা প্রত্যাহার করে নেয়। কিন্তু মুআবিয়া রা. তার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে পারেননি। তাই তিনি ইবনে সাবাকে নির্বাসনে পাঠান। এরপর সে মিশরে গিয়ে আস্তানা গাড়ে।[৯০]

উসমান রা. লোকদের বুঝানো এবং তাদের সন্দেহ দূর করার জন্য যে-সকল সাহাবিকে পাঠিয়েছিলেন তাদের মধ্যে আম্মার ইবনে ইয়াসির রা. ব্যতীত সকলেই ফিরে আসেন। তিনি গিয়েছিলেন মিশরে। সেখানেই ছিল ইবনে সাবা, সাওদান ইবনে হুমরান এবং কিনানা ইবনে বিশরের অবস্থান। যারা ছিল এই ফিতনার মূলহোতা। তারা আম্মার ইবনে ইয়াসির রা.-এর সঙ্গে বসে তাকে গভর্নরবৃন্দ এবং উসমান রা.-এর ব্যাপারে দ্বিধায় ফেলে দেয়। তাই তিনি মদিনায় উসমান রা.-এর কাছে ফিরে যেতে বিলম্ব করেন। এদিকে মদিনার মুসলিমরা আশঙ্কা করেন, হয়তো তাকে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু তখনই তাদের কাছে মিশরের গভর্নর আবদুল্লাহ ইবনে সাদ ইবনে আবু সারহ রা.-এর পত্র আসে। তিনি জানান, মিশরের লোকেরা আম্মার ইবনে ইয়াসির রা.-কে দ্বিধায় ফেলে দিয়েছে। তখন উসমান রা. আম্মার ইবনে ইয়াসির রা.-কে পত্র মারফত তিরস্কার করেন। উসমান রা.-এর চিঠি পড়ার পর তার কাছে সত্য উন্মোচিত হয়ে যায়। এরপর তিনি মদিনায় উসমান রা.-এর কাছে ফিরে আসেন এবং তার সামনেই নিজের ভুল ধারণার জন্য তওবা করেন।

৩৩ হিজরি সনে প্রথমবারের মতো ফিতনার প্রকাশ ঘটে কুফা নগরীতে। সেখানে আশতার নাখায়ি ৯/১০জন লোককে নিজের সঙ্গে জুটিয়ে দিনের আলোয় প্রকাশ্যে উসমান রা.-এর ওপর বিভিন্ন দোষারোপ করা শুরু করে।

কুফার গভর্নর সাইদ ইবনুল আস রা. উসমান রা.-এর কাছ থেকে এ ব্যাপারে জানতে পারেন। তিনি আশতার ও তার সহচরদের এ থেকে নিষেধও করেন। এরপর সাইদ ইবনুল আস রা. উসমান রা.-কে আশতার এবং তার সাঙ্গপাঙ্গদের অবস্থা জানালে তিনি সাইদ ইবনুল আস রা.-কে আশতার এবং তার সহচরদের শামে মুআবিয়া রা.-এর কাছে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

আমরা আগেই বলেছি, মুআবিয়া রা. ছিলেন অত্যন্ত সহনশীল। তারা বেশ কয়েকবার প্রকাশ্যে তাকে গালি দিয়েছে। কিন্তু তিনি তাদের সঙ্গে কোমল এবং নম্র আচরণ করেন। তাদের সঙ্গে কোনোরূপ কঠোরতা করার চেষ্টা করেননি। তিনি তাদের পাঠিয়ে দেন হোমসের গভর্নর আবদুর রহমান ইবনে খালিদ ইবনুল

---

৯০. *আল-কামিল ফিত তারিখ*, ২/৪৮৪; *তারিখুত তবারি*, ৪/২৮৩

ওয়ালিদ রা.-এর কাছে। যিনি ছিলেন পিতা খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের মতোই তেজস্বী। তার মতোই সিংহপুরুষ। তিনি তাদের কঠোরভাবে তিরস্কার করেন। তারা এর জবাব দেওয়ার দুঃসাহস দেখালে তিনি তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করেন। তাদেরকে বন্দি করলে তারা তওবার কথা জানায়। তখন তিনি উসমান রা.-কে জানিয়ে দেন যে, তারা তওবা করে নিয়েছে।

উসমান রা. তাদের একজনকে তার কাছে পাঠাতে বলেন, ফলে আশতার নাখায়িকে উসমান রা.-এর কাছে পাঠানো হয়। সে উসমান রা.-এর সামনে প্রকাশ্যে তওবা করে। উসমান রা. তাকে শামে পাঠিয়ে দেন। সে তখন সহচরদের সঙ্গে সেখানেই থেকে যায়। শামে অবস্থানকালে তাদের কাছে বসরা থেকে ইয়াজিদ ইবনে কায়স নামক এক লোকের চিঠি আসে। চিঠিতে জানানো হয়, সে অচিরেই বসরায় প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে যাচ্ছে। তাই সাহায্য চেয়ে সে তাদের কাছে চিঠি পাঠিয়েছে। চিঠি হস্তগত হওয়ার পর তারা বিদ্রোহের ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। আশতার নাখায়ি তাদেরকে এ ব্যাপারে পীড়াপীড়ি করতে থাকে। একমতে তারা আশতার নাখায়ির সঙ্গে কুফায় ফিরে গিয়েছিল। আরেক মতে তারা ফিরে যায়নি। কিন্তু আশতার নাখায়ি শাম থেকে কুফায় ফিরে যায়। আগেই বলেছি আশতার নাখায়ি তার গোত্রের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের একজন ছিল।

এ সময় উসমান রা. তার গভর্নরদের কাছে ফিতনার বিষয়ে পরামর্শের আহ্বান জানিয়ে সংবাদ পাঠান। শামের গভর্নর মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রা., বসরার গভর্নর আবদুল্লাহ ইবনে আমের রা., কুফার গভর্নর সাইদ ইবনুল আস রা. এবং মিশরের গভর্নর আবদুল্লাহ ইবনে সাদ ইবনে আবু সারহ রা., তারা সকলেই মদিনা মুনাওয়ারায় উসমান রা.-এর কাছে আসেন। তাদের কাছে বিষয়টি উপস্থাপন করার পর তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ মত ব্যক্ত করেন। আবদুর রহমান ইবনে আমের রা. লোকদের জিহাদে পাঠিয়ে দেওয়ার পরামর্শ দেন; যেন এ ধরনের কাজের সুযোগ না পায়। সাইদ ইবনুল আস রা. বিশৃঙ্খলাকারীদের উচিত শিক্ষা দিয়ে তাদের মূলোৎপাটন করার পরামর্শ দেন। মুআবিয়া রা. প্রত্যেক গভর্নরকে নিজ নিজ শহরে পাঠিয়ে দেওয়ার মত দেন এবং বলেন, তাদের প্রতিরোধ করার জন্য এটিই যথেষ্ট হবে। আর আবদুল্লাহ ইবনে সাদ ইবনে আবু সারহ রা. সম্পদ প্রদানের মাধ্যমে তাদের আকৃষ্ট করার মত ব্যক্ত করেন।

উসমান রা. এসব মতের মধ্যে সমন্বয়সাধন করেছিলেন। কিছু লোককে যুদ্ধের জন্য পাঠিয়েছিলেন, কিছু লোককে দিয়েছিলেন সম্পদ এবং প্রত্যেক

গভর্নরকে দায়িত্ব দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন নিজ নিজ শহরে। কিন্তু তিনি বিশৃঙ্খলাকারীদের মূলোৎপাটন করেননি।

এ সময় পর্যন্ত ফিতনার বিষয়টি গোপনেই চলতে থাকে। কুফায় আশতার নাখায়ি, তার সহচররা এবং বসরায় ইয়াজিদ ইবনে কায়স ব্যতীত কেউ তখনও প্রকাশ্যে আসেনি। উসমান রা.-এর কাছ থেকে গভর্নরগণ নিজ নিজ শহরে ফিরে যান। সাইদ ইবনুল আস রা. কুফায় ফিরে দেখেন, আশতার নাখায়ি কল্পনাতীত কাণ্ড করে বসেছে। সে বিশাল জনবল একত্র করে বিরাট বিদ্রোহ এবং বিশৃঙ্খলা শুরু করেছে। তাদের মধ্যে ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়েছে ফিতনার অগ্নিশিখা। তারা সাইদ ইবনুল আস রা.-কে কুফায় প্রবেশে বাধা প্রদান করে এবং এই সিদ্ধান্তে অটল থাকে। সাইদ ইবনুল আস রা. এই ফিতনা দমন করাকে প্রাধান্য দিয়ে তাদের সঙ্গে যুদ্ধে যাননি; বরং তিনি উসমান রা.-এর কাছে ফিরে এসে তাকে সবকিছু অবগত করেন। উসমান রা. মধ্য ও উত্তর পারস্যে বিস্তৃত এই শহরটিতে শান্তি প্রতিষ্ঠাকে প্রাধান্য দিয়ে কুফাবাসীর সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে আবু মুসা আশআরি রা.-কে নতুন গভর্নর হিসাবে নিয়োগ দেন।

ঘটনাটি ঘটেছিল ৩৪ হিজরিতে। দিনদিন উসমান রা.-এর ওপর মিথ্যা দোষারোপের মাত্রা বাড়তেই থাকে। জনপদের পর জনপদে বিস্তার লাভ করতে থাকে ইবনে সাবার বিষাক্ত চিন্তাধারা। বিভিন্ন অঞ্চলে এ ফিতনার শেকড় মজবুত হতে থাকে। ইয়াজিদ ইবনে কায়স বসরায়, আশতার নাখায়ি ও হাকিম ইবনে জাবালা কুফায় এবং ফিতনার মূলহোতা আবদুল্লাহ ইবনে সাবা ছিল মিশরে। তার সঙ্গে ছিল কিনানা ইবনে বিশর এবং সাওদান ইবনে হুমরান-সহ বেশ কজন কুচক্রী।

মূলহোতারা ফিতনার অগ্নিশিখাকে আরও ছড়িয়ে দিয়ে ইসলামি সাম্রাজ্যকে খণ্ডবিখণ্ড করে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। আগের চেয়ে অধিক হারে তারা উসমান রা.-এর ওপর অপবাদ আরোপ করতে থাকে। সাহাবিগণের স্বাক্ষর জাল করে মিথ্যা ও অবান্তর অভিযোগ, পত্র মারফত বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচার করতে থাকে। এসব পত্রে তারা তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রা., যুবায়ের ইবনুল আওয়াম রা. ও উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রা.-এর ভুয়া স্বাক্ষর ব্যবহার করত।

দূরত্ব এবং যোগাযোগব্যবস্থা কঠিন হওয়ায় মানুষের কাছে তাদের মিথ্যা পত্র এবং সাহাবিগণের স্বাক্ষর জাল করার বিষয়টি স্পষ্ট করা সম্ভব হয়নি। এ

কারণে আরও কিছু মানুষ সাড়া দেয় ফিতনার আহ্বানে। কিছু মানুষ বিষয়টিকে স্পর্শকাতর মনে করে যাচাই করার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

ফিতনার আগুন প্রজ্বলিতকারী ওই সব অপবাদ এখনো শিয়াদের গ্রন্থাবলিতে বিদ্যমান। উসমান রা.-কে গালমন্দ এবং অপবাদ আরোপ করার সময় তারা ইসলামদ্রোহীদের এসব মিথ্যা ও বানোয়াট কথা উল্লেখ করে থাকে। এগুলোকে সত্য হিসাবে প্রচার করে। জাহিয়া কাদুরার মতো কিছু অজ্ঞ তাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগুলোকে সত্য বলে মেনেও নেয়। উসমান রা. ও আয়েশা রা.-এর ব্যাপারে অপবাদ আরোপ করে। জাহিয়া কাদুরা তার বইয়ে লিখেছে যে, আয়েশা রা. মানুষজনকে উসমান রা.-এর বিরুদ্ধে উসকানি দিয়েছিলেন। সে বুঝাতে চায় যে, বিশৃঙ্খলাকারীদের পক্ষ থেকে যেসব চিঠি প্রেরণ করা হয়েছিল সেগুলো সত্যি সত্যিই আয়েশা রা. প্রেরণ করেছিলেন।

আল্লামা ইবনে কাসির রহ. উল্লেখ করেন, আবু মুআবিয়া রহ. আমাশ রহ. থেকে, আমাশ রহ. খাইসামা রহ. থেকে এবং খাইসামা রহ. মাসরুক রহ. থেকে বর্ণনা করে বলেন, উসমান রা.-কে যখন হত্যা করা হলো, তখন আয়েশা রা. বলেন, তোমরা তাকে ময়লা থেকে পরিচ্ছন্নকৃত কাপড়ের মতো করে তারপর হত্যা করলে?

অপর বর্ণনায় আছে, তোমরা তাকে প্রথমে ময়লামুক্ত পরিচ্ছন্ন কাপড়ের মতো বানিয়ে তার নিকটে গেলে, অতঃপর তাকে দুম্বার মতো হত্যা করলে?

তখন মাসরুক রহ. আয়েশা রা.-কে বললেন, এটা তো আপনারই কাজ। আপনিই তো মানুষকে চিঠি লিখে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে বলেছেন।

আয়েশা রা. বললেন, না। ওই সত্তার শপথ! যার প্রতি বিশ্বাসীরা ঈমান এনেছে আর কাফেররা করেছে অস্বীকার। আমি এ পর্যন্ত তাদের জন্য সাদা কাগজে একটি কালো ফোঁটাও লিখিনি।

আমাশ রহ.বলেন, তারা মনে করত যে, ইবনে সাবা আয়েশা রা.-এর কাছ থেকে শুনে এসব লিখেছে।[৯১] আয়েশা রা. পর্যন্ত এ বর্ণনাটির সূত্র সহিহ।

এ ধরনের উদাহরণ থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, ওই সকল নিকৃষ্ট খারেজি[৯২] সাহাবিগণের নাম ব্যবহার করে মিথ্যা পত্র লিখে বিভিন্ন প্রান্তে পাঠিয়ে লোকদেরকে উসমান রা.-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে প্ররোচিত করেছে।

---

৯১. *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, ৩৯/৪৮৭; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/২১৮

উসমান রা.-এর ওপর আরোপিত যত অপবাদ

ওই সকল নিকৃষ্ট ইসলামদ্রোহী চক্র উসমান রা.-এর ওপর যেসব অপবাদ আরোপ করেছে, সেগুলো আজও কিছু অজ্ঞ মুসলিম এবং কিছু দলের মুখে মুখে চর্চিত হয়ে আসছে। সেগুলো হচ্ছে—

প্রথম অপবাদ : উসমান রা. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-কে আঘাত করেছিলেন। ফলে তার হাড় ভেঙে যায়। এমনকি তিনি তার ভাতাও বন্ধ করে দেন।

দ্বিতীয় অপবাদ : তিনি আম্মার ইবনে ইয়াসির রা.-কে আঘাত করে তার নাড়িভুঁড়ি বের করে ফেলেন।

তৃতীয় অপবাদ : তিনি কুরআন সংকলন করে বিদআত করেছেন এবং কুরআন পুড়িয়ে ফেলেছেন।

চতুর্থ অপবাদ : তিনি নিজের জন্য চারণভূমি সংরক্ষণ করেছেন। তাদের দাবি অনুযায়ী, তিনি সেখানে শুধু নিজের উটের পাল চরানোর অনুমতি দিয়েছেন।

পঞ্চম অপবাদ : তিনি আবু যর গিফারি রা.-কে শাম থেকে উত্তরে রবাযা অঞ্চলে নির্বাসিত করেছেন।

ষষ্ঠ অপবাদ : তিনি আবু দারদা রা.-কে শাম থেকে বিতাড়িত করেছেন।

সপ্তম অপবাদ : রাসুল ﷺ নির্বাসিত করার পরও তিনি হাকাম ইবনে আবুল আসকে ফিরিয়ে এনেছেন।

অষ্টম অপবাদ : তিনি সফরে নামাজ কসর[৯৩] করার সুন্নাহ রহিত করেছেন। কারণ, তিনি হজে গিয়ে মিনায় পূর্ণ নামাজ পড়েছেন।

নবম অপবাদ : তিনি মুআবিয়াকে গভর্নর পদে নিয়োগ দিয়েছেন। কারণ, তিনি ছিলেন তার নিকটাত্মীয়।

---

৯২. খারেজি : উসমান রা.-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী ও তার হত্যাকারীদের খারেজি বলা হয়।-সম্পাদক

৯৩. কসর : চার রাকাত ফরজ নামাজকে দুই রাকাত পড়া।-সম্পাদক

দশম অপবাদ : একই কারণে আবদুল্লাহ ইবনে আমেরকেও নিয়োগ দেন বসরার গভর্নর হিসাবে।

একাদশ অপবাদ : একই কারণে নিয়োগ দেন মারওয়ান ইবনে হাকামকে।

দ্বাদশ অপবাদ : তিনি ওয়ালিদ ইবনে উকবাকে কুফার গভর্নর নিয়োগ দিয়েছেন, অথচ সে ছিল ফাসেক।

ত্রয়োদশ অপবাদ : তিনি মারওয়ান ইবনে হাকামকে আফ্রিকা অঞ্চল থেকে অর্জিত গনিমতের (যুদ্ধলব্ধ সম্পদের) এক-পঞ্চমাংশ প্রদান করেছেন।

চতুর্দশ অপবাদ : উমর রা. ছোট লাঠি দিয়ে প্রহার করতেন। কিন্তু উসমান প্রহার করেন বড় লাঠি দিয়ে।

পঞ্চদশ অপবাদ : তিনি মিম্বরে রাসুল ﷺ-এর সিঁড়িতে বসেন, অথচ আবু বকর এবং উমর বসেছিলেন নিচের সিঁড়িতে।

ষোড়শ অপবাদ : তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি।

সপ্তদশ অপবাদ : উহুদের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পলায়ন করেছিলেন।

অষ্টাদশ অপবাদ : বাইআতে রিদওয়ানে তিনি ছিলেন অনুপস্থিত।

উনবিংশতম অপবাদ : তিনি উবাইদুল্লাহ ইবনে উমরকে হুরমুযান হত্যার বদলায় হত্যা করেননি।

বিংশতম অপবাদ : তিনি কেবল তার নিকটাত্মীয়দের দান করেন। সাধারণ মুসলিমদের দান করেন না।

এসব অপবাদ একটা বর্ণনাতেই পাওয়া গিয়েছে। অন্যান্য কিছু বর্ণনায় আরও কিছু অপবাদের কথা উল্লেখ রয়েছে, যা শুধু শিয়াদের গ্রন্থাবলিতেই নয়; বরং কিছু অজ্ঞ মুসলিমের রচনায়ও এগুলোর অস্তিত্ব পাওয়া যায়, যারা শিয়া কিংবা ইসলাম বিরোধীদের বানোয়াট বর্ণনা নকল করে থাকে। এগুলো যে বানোয়াট কথা তা বোঝার জ্ঞানও তাদের নেই। এরা চায় না, পৃথিবীতে কোনো ইসলামি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হোক। এদের দাবি হচ্ছে, যদি ইসলামি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে আবারও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। যেখানে সাহাবিগণের সময়েই এমন বিশৃঙ্খলা হয়েছে, সেখানে বর্তমান সময়ে এসে কীভাবে ইসলামি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব?

এসব মিথ্যা অপবাদ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। একমাত্র শাম ব্যতীত অন্য কোনো অঞ্চল এই ফিতনার ছোবল থেকে মুক্ত ছিল না। লোকেরা নিজেদের সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধকারী দাবি করে উসমান রা.-কে ক্ষমতা থেকে অপসারণের ষড়যন্ত্র শুরু করে। কারণ, তাদের দাবি অনুযায়ী তিনি এসব অন্যায় কাজ করেছিলেন।

আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদের তাওফিক দান করেন উসমান রা.-এর পক্ষে এসব অপবাদের জবাব দেওয়ার ও এসব মিথ্যা অপবাদ দূর করে, মুসলিমদের সংশয় মুক্ত করার। তিনি যেন আমাদের সক্ষমতা দেন, এ সত্য-ইতিহাস শিয়াদের মধ্যেও প্রচার করার। আমরা যেন ইতিহাসের পাতা থেকে প্রকৃত সত্যটি মানুষকে জানাতে পারি; যার বর্ণনা সত্য, বিশুদ্ধ, বিবেক, যুক্তি ও সঠিক চিন্তা-চেতনার সমর্থনযোগ্য। দোয়া করি, আল্লাহ যেন আমাদের এসব আবেদন কবুল করেন।

উসমান রা.-এর ওপর আরোপিত অপবাদসমূহের জবাব

প্রথম অপবাদের জবাব : উসমান রা.-এর ব্যাপারে শিয়াদের প্রথম অপবাদ হচ্ছে, উসমান রা. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-কে আঘাত করেছিলেন। ফলে তার হাড় ভেঙে যায়। এমনকি উসমান রা. তার ভাতাও বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

এ বর্ণনাটি বানোয়াট। এর কোনো ভিত্তি নেই। যখন উসমান রা.-এর জন্য বাইআত গ্রহণ করা হয়েছিল, তখন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেছিলেন, আমাদের মধ্যকার সর্বোত্তম ব্যক্তির হাতে বাইআত গ্রহণ করলাম। তার অনুসরণে আমরা কোনো ত্রুটি করব না।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. তখন সবচেয়ে উত্তম মনে করতেন উসমান রা.-কে। তিনি উসমান রা.-এর পক্ষ থেকে কুফার বায়তুল মালের রক্ষণাবেক্ষণকারী হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। সে সময় কুফার গভর্নর ছিলেন সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা.। তাদের দুজনের মধ্যে একবার একটি বিষয় নিয়ে বিরোধ দেখা দিয়েছিল। সাদ রা. বায়তুল মাল থেকে কিছু সম্পদ ঋণ নিয়েছিলেন। তবে তিনি নির্দিষ্ট সময়ে তা পরিশোধ করতে পারেননি। এ কারণে তাদের দুজনের মধ্যে তর্ক হয়।

তখন কুফাবাসী তাদের চিরায়ত অভ্যাস অনুযায়ী বিদ্রোহ করে বসে। জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ১০জন সাহাবির একজন এবং রাসুল ﷺ-এর শ্রদ্ধেয় মামা সাদ রা.-এর মর্যাদার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করেই তারা তাকে অপসারণ করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। তখন উসমান রা. গভর্নরের পদ থেকে সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা.-কে অপসারণ করেন এবং আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-কে কুফার বায়তুল মালের রক্ষক পদে বহাল রাখেন। উসমান রা. যখন সকল মানুষের জন্য এক কেরাতের কুরআন সংকলন করতে চাইলেন, তখন তিনি যায়দ ইবনে সাবেত রা.-কে এ কাজের জন্য নির্বাচন করেন। ইতিপূর্বে আবু বকর রা. এবং উমর রা. তাকেই প্রথমবার কুরআন সংকলনের কাজের জন্য নির্বাচন করেছিলেন। এর কারণ ছিল, রাসুল ﷺ-এর মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে দশম হিজরির রমজান মাসে যেভাবে তিনি ও জিবরাইল আ. একে অপরকে কুরআন শুনিয়েছিলেন, যায়দ রা. ঠিক সেভাবেই রাসুল ﷺ থেকে কুরআন শুনেছিলেন। কিন্তু কুরআনের অন্যান্য পাণ্ডুলিপিগুলো এ ধারাবাহিকতায় এভাবে লেখা হয়েছিল যে, যখনই কুরআনের কিছু অংশ অবতীর্ণ হতো, তখন সেই অংশটুকু পাণ্ডুলিপিতে লেখা হতো।

তখন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর কাছে কুরআনের যে পাণ্ডুলিপিটি ছিল, তার বিন্যাস যায়দ ইবনে সাবেত রা.-এর পাণ্ডুলিপির বিন্যাস থেকে ভিন্ন ছিল। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর পাণ্ডুলিপির বিন্যাসের প্রতি লক্ষ করলে দেখা যায়, সেখানে সুরার বিন্যাস অনেক ব্যতিক্রম। কিছু সুরার মধ্যে আয়াতের বিন্যাসেও ব্যতিক্রম রয়েছে। কিছু শব্দেও রয়েছে পার্থক্য। এমনকি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর পাণ্ডুলিপিতে সুরা ফাতেহা, সুরা নাস এবং সুরা ফালাকের মতো সুরাগুলো ছিল না। এদিকে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর উচ্চারণ ছিল হুজাইল গোত্রীয়; কুরাইশ গোত্রীয় ছিল না। সিদ্ধান্ত হয়েছিল ঐক্যবদ্ধভাবে কুরআন লিপিবদ্ধ করা হবে। যদি কোথাও ভিন্নতা দেখা দেয়, তবে কুরাইশ গোত্রের উচ্চারণকেই প্রাধান্য দেওয়া হবে। কারণ, কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল কুরাইশ গোত্রের ভাষায়। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. যখন জানতে পারলেন যে, যায়দ ইবনে সাবেত রা.-এর কেরাত অনুযায়ী কুরআন সংকলন করা হবে এবং তার পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে ফেলা হবে, তখন তিনি খুবই ক্রুদ্ধ হন। কুফার মিম্বরে দাঁড়িয়ে পাঠ করেন,

﴿وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ﴾

যে গোপন করে সে কেয়ামতের দিন যা গোপন করেছে তা নিয়েই উপস্থিত হবে। [সুরা আলে ইমরান : ১৬১]

নিশ্চয় আমি আমার সহিফাকে গোপন করে রাখব। তিনি আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন।

অবশ্য আয়াতে বর্ণিত গোপন করার অর্থ হচ্ছে গনিমত তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদকে গোপন করা। যা সর্বসম্মতিক্রমে নিষিদ্ধ; বরং কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। উক্ত আয়াত এবং অন্য দলিল-প্রমাণ থেকে তা প্রমাণিত। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলতে চেয়েছেন, তিনি তার কাছে থাকা কুরআনের পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ করবেন, তা পুড়িয়ে ফেলতে সম্মত হবেন না। এরপর কেয়ামতের দিন অবশ্যই তিনি তা নিয়ে আল্লাহ তাআলার কাছে উপস্থিত হবেন।

তিনি কুরআন সংকলনে দায়িত্বপ্রাপ্ত সাহাবিগণের মধ্যে থাকতে চেয়েছিলেন। কারণ, রাসুল ﷺ যাদের কেরাতের প্রশংসা করেছিলেন, তিনিও তাদের একজন। কিন্তু আগেই বলেছি, তার উচ্চারণ ছিল হুজাইল গোত্রের, যা কুরাইশ গোত্রের উচ্চারণের চেয়ে ভিন্ন ছিল। রাসুল ﷺ তাকে হুজাইল গোত্রের উচ্চারণে কুরআন তেলাওয়াতের অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু যখন সমস্ত মানুষের জন্য একই কেরাত নির্ধারণ করা হবে, তখন কুরআন যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে সেভাবেই সংকলন করা আবশ্যক। কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল কুরাইশের ভাষায়। তাই স্বাভাবিকভাবে কুরাইশের ভাষায় কুরআন সংকলন করা হবে।

এ ঘটনার পর উসমান রা. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর ওপর পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে ফেলার জন্য চাপ প্রয়োগ করেন। তখন তিনি মদিনায় এসে উসমান রা.-সহ সকল সাহাবির সঙ্গে এ নিয়ে তর্কে লিপ্ত হন। বিশিষ্ট সাহাবিগণ একত্র হয়ে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-কে বুঝাতে সক্ষম হন যে, এতেই মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ নিহিত রয়েছে। অবশেষে বুঝতে পেরে তিনি তার মত প্রত্যাহার করে নেন এবং উসমান রা.-এর সামনে এজন্য তওবা করেন। তাদের মধ্যকার সম্পর্ক পুনরায় আগের মতো হয়ে যায়। এ কথাগুলো এ ঘটনার সর্বসম্মত বর্ণনামতে প্রমাণিত।[৯৪]

---

৯৪. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১/৪৭৫; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/২৪৪

আমরা যদি ঘটনাটি পর্যবেক্ষণ করি তাহলে দেখতে পাব যে, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর জন্য শুরুতে এ সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া কষ্টকর ছিল। যে পাণ্ডুলিপিতে তিনি ২০ বছর ধরে রাসুল ﷺ-এর কাছ থেকে শ্রবণ করে পবিত্র কুরআনের বাণী লিখে গিয়েছেন, তা পুড়িয়ে ফেলতে তার মন সায় দিচ্ছিল না। এই পাণ্ডুলিপিটি ছিল তার জীবনের অন্যতম অর্জন। এর সঙ্গে জড়িয়ে ছিল রাসুল ﷺ এবং অন্যান্য সাহাবিগণের অগণিত স্মৃতি। এটি হয়ে গিয়েছিল তার জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ কারণেই তিনি শুরুতে এ সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেননি। কিন্তু যখন তিনি সত্য জেনেছেন ও তা মনেপ্রাণে মেনে নিয়েছেন, তখন নিজের মতকে প্রত্যাহার করে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করেছেন। মোটকথা, উসমান রা. কোনোভাবেই তার ওপর অত্যাচার করেননি। তাকে আঘাত করা কিংবা তার ভাতা বন্ধ করে দেওয়ার কথা একেবারেই অবিশ্বাস্য।

দ্বিতীয় অপবাদের জবাব : দ্বিতীয় অপবাদ হলো, উসমান রা. আম্মার ইবনে ইয়াসির রা.-কে আঘাত করে তার নাড়িভুঁড়ি বের করে ফেলেছিল।

যদি সত্যিই এমনটি ঘটত, তাহলে এ ঘটনার পর তো আম্মার রা. জীবিত থাকতেন না। কিন্তু আম্মার রা.-এরপরও জঙ্গে সিফফিনের সময় পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। এতেই বোঝা যায়, উসমান রা.-কর্তৃক আম্মার রা.-কে আঘাত করা এবং তার নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে যাওয়ার ঘটনা আদৌ ঘটেনি। তবে একবার তাকে শুধু প্রহার করা হয়েছিল। এর কারণ ছিল, আম্মার ইবনে ইয়াসির রা. এবং আব্বাস ইবনে উতবা ইবনে আবি লাহাব রা.-এর মধ্যে একবার কোনো বিষয় নিয়ে বিরোধ হয়েছিল। তখন তারা একে অপরের ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করায় উসমান রা. উভয়কেই প্রহারের শাস্তি দিয়েছিলেন। তিনি দেখেছিলেন, তাদের উভয়েই একে অপরের ক্ষেত্রে অন্যায় করেছে। এ ঘটনায় সাহাবিগণের অন্তরে একটুও প্রতিক্রিয়া অথবা ক্ষত সৃষ্টি হয়নি।

বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয় এ ঘটনার দ্বারা যে, যখন উসমান রা. জনগণের সন্দেহ দূর করার জন্য বিশিষ্ট কিছু সাহাবিকে নির্বাচন করেছিলেন, তখন তিনি আম্মার ইবনে ইয়াসির রা.-কে মিশরে পাঠানোর জন্য নির্বাচন করেছিলেন। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, মিশরে অবস্থানরত ফিতনার মূলহোতারা আম্মার রা.-কে দ্বিধাগ্রস্ত করে ফেলেছিল। তাই তিনি মিশর থেকে ফিরে আসতে বিলম্ব করেন। এদিকে উসমান রা. এবং মদিনার অন্যান্য

মুসলিমগণের মনে আম্মার রা.-এর শহিদ হওয়ার আশঙ্কা জাগে, তখনই উসমান রা.-এর কাছে পৌঁছে মিশরের গভর্নর আবদুল্লাহ ইবনে সাদ ইবনে আবু সারহ রা.-এর চিঠি। তিনি জানান, এখানকার লোকেরা আম্মার রা.-কে দ্বিধাগ্রস্ত করে ফেলেছে। এরপর উসমান রা. আম্মার রা.-এর কাছে চিঠি লিখে পাঠান। তিনি ফিরে এসে উসমান রা.-কে সেখানে যা ঘটেছে তার বিবরণ জানান। উসমান রা. তাকে বলেন, আপনাকে অপবাদ দিয়েছে তাই আপনিও ইবনে আবি লাহাবকে অপবাদ দিয়েছেন। উভয়কে প্রাপ্য শাস্তি দিয়েছি বলে আমার ওপর রাগ করেছেন। হে আল্লাহ, আমি আমার প্রজাদের ওপর কোনো জুলুম করে থাকলে আমাকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ, নিশ্চয় আমি প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই আপনার বিধান প্রয়োগ করে আপনার নিকটবর্তী হচ্ছি। কাউকেই পরোয়া করি না। আম্মার, আপনি আমার কাছ থেকে চলে যান।[৯৫]

এই ছিল আম্মার রা.-এর প্রতি উসমান রা.-এর তিরস্কার। আম্মার রা. ফিতনাবাজদের কথার প্রতি তার আকৃষ্ট হওয়ার ব্যাপারে অপারগতা প্রকাশ করেন। উসমান রা. এবং বড় বড় সাহাবিগণের সামনে প্রকাশ্যে তওবা করে তিনি তার এই মত প্রত্যাহার করে নেন।

এসবের দ্বারা বোঝা যায় যে, আম্মার রা.-কে আঘাত করা এবং তার নাড়িভুঁড়ি বের করে ফেলার ঘটনা সম্পূর্ণ মিথ্যা; বরং আমরা যা বর্ণনা করলাম এটিই প্রকৃত ঘটনা। উসমান রা. যে তাদের দুজনকে প্রহার করেছেন, এটি তাদের জন্য দোষণীয় কিছু নয়। কারণ, আল্লাহ তাআলার প্রিয় বান্দাদের কাছ থেকেও কখনো এমন কিছু অপরাধ প্রকাশ পেয়ে যায়, যার কারণে তারা হদের[৯৬] উপযুক্ত হয়ে যান। আর তাযিরের[৯৭] উপযুক্ত তো হতেই পারেন।

উমর রা.-ও এমনটি করেছিলেন। তিনি একবার নিজস্ব কেরাতে কুরআন তেলাওয়াতকারী বিশিষ্ট সাহাবি উবাই ইবনে কাব রা.-কে প্রহার করেছিলেন। কারণ, তিনি মদিনার পথে হাঁটছিলেন আর লোকেরা পিছু পিছু তার অনুসরণ করছিল। তখন উমর রা. তাকে বেত্রাঘাত করেন এবং বলেন,

---

৯৫. *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, ৬/২৯

৯৬. হদ : হদের ব্যাখ্যা একটু পরেই উল্লেখ করা হবে।-সম্পাদক

৯৭. তাযির : তাযিরের ব্যাখ্যা একটু পরেই উল্লেখ করা হবে।-সম্পাদক

নিশ্চয় এমনটি করা অনুসারীদের জন্য অপদস্থতা এবং অনুসৃত ব্যক্তির জন্য ফিতনাস্বরূপ।

উবাই ইবনে কাব রা.-কে নির্দেশ দেন, কেউ যেন তার পিছু অনুসরণ না করে। এমনইভাবে একবার রাসুল ﷺ-ও এক সাহাবিকে প্রহার করেছিলেন। সেই সাহাবি খাইবারের যুদ্ধে মদ পান করেছিলেন। তখন রাসুল ﷺ তাকে ৪০টি বেত্রাঘাত করেন। কেউ বলেছেন তিনি ৪০টি জুতার আঘাত করেছিলেন। এই প্রহারের পর যখন অন্য এক সাহাবি সেই সাহাবিকে তার কাজের জন্য অভিশাপ দেয়, তখন রাসুল ﷺ রেগে যান এবং বলেন, সে কি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে ভালোবাসে না?

এই প্রহার তাদের মর্যাদায় কোনো ঘাটতি সৃষ্টি করেনি। নিশ্চয় তারা সকলে জান্নাতে যাবেন। এতে কোনো দ্বিমত নেই।

তাযির দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে ব্যাপারে শরিয়ত নির্ধারিত কোনো হদ এবং কাফফারা[৯৮] বা জরিমানা নেই, সে ব্যাপারে কাউকে শাস্তি দিয়ে শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া।

শাস্তির দিক দিয়ে গুনাহ তিন প্রকার—

প্রথম প্রকার : যে গুনাহের কারণে শরয়ি হদ তথা শরিয়ত নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগ করা হয়। যেমন, চুরি এবং ব্যভিচার।

দ্বিতীয় প্রকার : যে গুনাহের কারণে শাস্তি নয়; বরং কাফফারা বা জরিমানা আরোপ করা হয়। যেমন, রমজানে দিনের বেলায় অথবা ইহরাম অবস্থায় সহবাস করা।

তৃতীয় প্রকার : যে গুনাহের কারণে হদ এবং কাফফারা কোনোটিই প্রয়োগ করা হয় না; বরং তাযির প্রয়োগ করা হয়। যেমন, কাউকে গালি দেওয়া। তবে কাউকে ব্যভিচারের অপবাদ দিলে শরিয়ত নির্ধারিত হদ তথা শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। অনুরূপভাবে এই পরিমাণ সম্পদ চুরি করা, যার ফলে

---

৯৮. **কাফফারা :** কাফফারা হলো পাপ মোচনের জন্য শরিয়ত নির্ধারিত একধরনের শাস্তি। এ শাস্তিটি ক্ষেত্রভেদে শরিয়ত নির্ধারিত রোজা, সদকা, মিসকিনকে খাওয়ানো, মিসকিনকে বস্ত্রদান ও দাস মুক্ত করার মাধ্যমে প্রয়োগ করা হয়।-সম্পাদক

হদ আবশ্যক হয়।[৯৯] এমনইভাবে মিথ্যা কথার ব্যাপারেও তাযির প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমাদ রহ.-এর মতে তাযির প্রয়োগ করা ওয়াজিব। ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর মতে মুস্তাহাব। হদ এবং তাযির উভয়টিই শাস্তি। উভয়টির উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের অন্তরকে পবিত্র করা, গুনাহ থেকে বিরত রাখা, যেন হদ, তাযির ও কাফফারার মাধ্যমে গুনাহমুক্ত হয়ে মানুষ কেয়ামতের দিন উপস্থিত হয়।

হদ এবং তাযিরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, হদের ক্ষেত্রে সকল মানুষই সমান। কিন্তু তাযির মানুষের ভিন্নতা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। একজন খোদাভীরু এবং সৎ ব্যক্তি যদি ভুল করে, তবে তাকে ফাসেক এবং পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তির মতো শাস্তি দেওয়া হবে না। তাদের তুলনায় লঘু শাস্তি দেওয়া হবে। হদের ক্ষেত্রে কোনো সুপারিশ ধর্তব্য হবে না। তবে তাযিরের ক্ষেত্রে সুপারিশ বৈধ। তাযির প্রয়োগ করার সময় যদি কেউ মারা যায়, তাহলে দিয়ত তথা রক্তপণ আদায়ের মতো সেটারও জরিমানা দিতে হবে। কিন্তু হদ প্রয়োগ করার সময় যদি কেউ মারা যায়, তাহলে কোনো জরিমানা দিতে হবে না। তবে কোনো কোনো ফকিহের মতে তাযিরের সময় মারা গেলেও কোনো জরিমানা নেই।

তাযিরের ধরন একাধিক হতে পারে। ধমকি, উপদেশ, বন্দি করা, প্রহার করা, নির্বাসনে পাঠানো, কাজ থেকে বরখাস্ত করা ইত্যাদি। তাযির প্রদানের ক্ষমতা শাসক অথবা বিচারকের হাতে। তিনি যেভাবে চান সেভাবে তাযির প্রয়োগ করতে পারেন। তবে এ নিয়ে ফকিহগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, ১০ বেত্রাঘাতের বেশি তাযির হতে পারবে না। কেউ বলেন, ৮০ বেত্রাঘাতের বেশি হতে পারবে না। কেউ বলেন, তাযির নির্ধারণ করবে শাসক কিংবা বিচারক।

আম্মার ইবনে ইয়াসির রা. এবং আব্বাস ইবনে উতবা রা. যখন একে অপরের ওপর অপবাদ আরোপ করেছিলেন, তখন উসমান রা. তাদের সঙ্গে এমনটিই করেছিলেন।

---

৯৯. অর্থাৎ ১০ দিরহাম (দুই তোলা সাড়ে সাত মাশা বা ৩০.৬১৮ গ্রাম রুপা) মূল্যমানের কোনো বস্তু চুরি করা।-সম্পাদক

পিতার জন্যও তাযির প্রয়োগের অধিকার রয়েছে। তিনি তার সন্তানের ওপর তাযির প্রয়োগ করতে পারবেন। তবে সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হলে কোনো পিতা সন্তানকে প্রহার করতে পারবে না।[১০০]

একজন মনিবের জন্যও রয়েছে তার গোলামের ওপর তাযির প্রয়োগ করার অধিকার। চাইলে মনিব গোলামকে প্রহার করতে পারে অথবা বন্দি রাখতে পারে। আবার ভিন্ন কোনো শাস্তিও প্রয়োগ করতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে কোনো বাড়াবাড়ি এবং অত্যাচার করা যাবে না। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সবকিছুই দেখছেন।

উসমান রা.-এর জন্য তাযির প্রয়োগ করার অধিকার ছিল। তা ছাড়া কোনো সাহাবিই উসমান রা.-এর এ বিষয়টিকে অপছন্দ করেননি কিংবা এ কাজের নিন্দা বা সমালোচনা করেননি।

তৃতীয় অপবাদের জবাব : উসমান রা.-এর ওপর আরোপিত তৃতীয় অপবাদটি হচ্ছে, তিনি কুরআন সংকলন করে বিদআত করেছেন এবং কুরআন পুড়িয়ে ফেলেছেন। ফিতনাবাজরা এভাবেই নেকির কাজকে মন্দ কাজ বলে চালিয়ে দিচ্ছে। অধিকাংশ আলেমের মতে কুরআন সংকলন ছিল উসমান রা.-এর জীবনের সবচেয়ে বড় নেক আমল। আলেমগণ বলেন, তিনি যে ইতিপূর্বে রুমা কূপ খনন করেছিলেন, এর চেয়েও অধিক নেকির কাজ ছিল এটি। তিনি যে সেনাবাহিনী প্রস্তুত করার জন্য হাজার হাজার উট দান করেছিলেন তার চেয়েও মূল্যবান নেক আমল এটি। কারণ, কেয়ামত দিবস পর্যন্ত এই আমলের প্রভাব বিদ্যমান থাকবে।

সকল সাহাবিই কুরআন সংকলনের ব্যাপারে একমত হয়েছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. শুরুতে সম্মত হননি। তবে পরবর্তী সময় তার মত প্রত্যাহার করে উসমান রা. এবং সকল সাহাবির সিদ্ধান্তে সম্মতি প্রকাশ করেছেন। নিশ্চয় সাহাবিগণ কোনো ভ্রান্ত বিষয়ে একমত হবেন না। এমনকি

---

১০০. সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হলেও পিতা তাকে প্রহার করতে পারবে। আবু বকর রা. তার মেয়ে আয়েশা রা.-কে শাসনের জন্য তার কোমরে আঘাত করেছিলেন। ইবনে উমর রা. তার ছেলে বিলাল রহ.-কে শাসনের জন্য চড় মেরেছিলেন। তবে তাকে এমনভাবে প্রহার করা যাবে না, যার ফলে হাড় ভেঙে যায় বা শরীরে দাগ পড়ে যায়। *সহিহ বুখারি*, ৩৪৬৯ (শামেলা); *মুসনাদুত তয়ালিসি*, ২০০৬ (শামেলা); *আল-জামিউ লি আহকামিল কুরআন*, ৫/১৭২ (শামেলা); *ইমদাদুল আহকাম*, ৪/১৩৪-১৩৫; -সম্পাদক

আলি রা. তার খেলাফতকালে বলেছিলেন, উসমান রা. যদি কুরআন সংকলন না করতেন, তবে আমি অবশ্যই করতাম।

শিয়াদের গ্রন্থেও এমন বর্ণনা এসেছে, যা এ বিষয়ে সাহাবিগণের ঐকমত্যকে সমর্থন করে। এ ক্ষেত্রে শত্রুদের মুখ থেকেও সত্য কথা বেরিয়ে গিয়েছে। শিয়াদের অন্যতম প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ *সাদুস সুউদ*-এ ইবনে তাউস শাহরাস্তানি থেকে বর্ণিত আছে, তিনি সুওয়াইদ ইবনে আলকামা থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমি আলি রা.-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে,

হে লোকসকল, আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা উসমান রা.-এর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি এবং তার কুরআন পুড়িয়ে দেওয়ার কথা বলা থেকে বেঁচে থাকো। আল্লাহর শপথ! তিনি সাহাবিগণের উপস্থিতিতেই এমনটি করেছেন। আমাদের তিনি একত্র করে বলেছিলেন, মানুষ কুরআনের কেরাত নিয়ে মতানৈক্য করছে। একজনের সঙ্গে আরেকজনের দেখা হলে বলছে, আমার কেরাত তার কেরাতের চেয়ে উত্তম। এভাবে একে অপরকে কুফরের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, এ ব্যাপারে আপনারা কী বলেন?

আমরা বললাম, আপনার কী মত?

তিনি বললেন, আমি চাই সকল মানুষ একই কেরাতে কুরআন তেলাওয়াত করুক। যদি আপনারাই এখন মতানৈক্যে লিপ্ত হন; তবে আপনাদের পরবর্তী সময়ে যারা আসবে, তারা আরও অধিক মতানৈক্যে লিপ্ত হবে।

আমরা সকলেই বললাম, আপনার ভাবনা অত্যন্ত সুন্দর।[১০১]

শিয়াদের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থেই আলি রা.-এর এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উপরিউক্ত গ্রন্থ-সহ শাহরাস্তানি রচিত আরও কিছু গ্রন্থে এই বর্ণনা রয়েছে। অপরদিকে তাদের কিছু গ্রন্থে বলা হয়েছে, কুরআন সংকলন করে এবং কুরআন পুড়িয়ে দিয়ে উসমান রা. বিদআতে লিপ্ত হয়েছেন। তাদের এই পারস্পরিক বৈপরীত্যই সত্যকে স্পষ্ট করে দেয়।

সাহাবিগণের ঐকমত্যসত্ত্বেও শিয়ারা মনে করে যে, উসমান রা. ব্যক্তিগত আগ্রহে কুরআন সংকলন করেছেন, আরও কিছু সাহাবি কুরআন সংকলনে তার সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছেন। শিয়ারা তাদের নাম উল্লেখ করে দাবি করে, তারা যেভাবে কুরআন সংকলন করেছেন কুরআন সেভাবে অবতীর্ণ হয়নি।

---

১০১. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/২৪৪; *আল-আওয়াসিম মিনাল কাওয়াসিম*, ১/৬৯

শিয়াদের দাবি অনুযায়ী প্রকৃত কুরআন তাদের কাছেই রয়েছে। যা বর্তমান কুরআনের তিনগুণ। সে কুরআন তাদের নিকটে একটি পাতালকুঠুরিতে সংরক্ষিত আছে। তাদের দ্বাদশ ইমাম তা নিয়ে আসবেন। তাতে আমাদের কাছে থাকা কুরআনের একটি অক্ষরও নেই। তবে কোনো কোনো শিয়া কুরআনের কিছু আয়াতের কথা স্বীকার করে এবং অন্য আয়াতগুলোকে রহিত বলে।

শিয়াগোষ্ঠীকর্তৃক আবু বকর রা.-এর কুরআন সংকলনের বিষয়টি অস্বীকার করা এবং আমাদের কাছে থাকা কুরআন উসমান রা.-এর যুগে সংকলিত হয়েছে বলে তাদের যে দাবি, এটি খ্রিষ্টান সম্প্রদায় কর্তৃক কুরআনের ওপর আঘাতের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখে। খ্রিষ্টানরা অনেক আগে থেকেই কুরআনের ওপর আঘাত করার চেষ্টা করে আসছে। ইবনে হাজম আন্দালুসি রহ.-এর সময়ে খ্রিষ্টানরা এ প্রসঙ্গে অধিক হারে মুসলিমদের সমালোচনা করেছিল এবং তারাও দাবি করেছিল যে, কুরআন উসমান এবং সামসময়িক সাহাবিগণের যুগে সংকলন হয়েছে। এ ক্ষেত্রে খ্রিষ্টানদের দলিল হচ্ছে শিয়াদের গ্রন্থাবলি। যেখানে শিয়ারা দাবি করেছে, প্রকৃত কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে রাসুল ﷺ-এর ইন্তেকালের ছয় মাস পর ফাতেমা রা.-এর ওপর। এরপর আলি ইবনে আবু তালেব রা. এবং পরবর্তী ইমামগণ তা সংরক্ষণ করেছেন।

ইবনে হাজম আন্দালুসি রহ. তার গ্রন্থ *আল-ফাসল*-এর মধ্যে বলেন, শিয়া রাফেজিরা কিছুতেই মুসলিম নয়। কুফরের দিক দিয়ে এরা ইহুদি এবং খ্রিষ্টানদের মতোই।[১০২]

হাদিসে বর্ণিত সাত হরফের পর্যালোচনা

> নিশ্চয় এই কুরআন সাত হরফে অবতীর্ণ হয়েছে। তাই তোমরা তা থেকে যা সহজ মনে হয় তাই পাঠ করো।[১০৩]

এই হাদিসটি সহিহ। ২০জনের অধিক সাহাবি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। এই হাদিসের একাধিক ব্যাখ্যাও রয়েছে। ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতি রহ. *আল-ইতকান ফি উলুমিল কুরআন*-এ এই হাদিসের ৪০টি ব্যাখ্যা উল্লেখ

---

১০২. *আল-ফাসল ফিল-মিলালি ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল*, ২/৬৫

১০৩. *সহিহ বুখারি*, ২৪১৯; *সহিহ মুসলিম*, ৮১৮; *সুনানু আবি দাউদ*, ১৪৭৫; *সুনানুত তিরমিজি*, ২৯৪৩

করেছেন। ইমাম ইবনে হাজার আসকালানি রহ. এবং ইবনে হিব্বান রহ. এই হাদিসের ব্যাখ্যায় ৩৫টি অভিমত উল্লেখ করেছেন। হাদিসে বর্ণিত সাত হরফ সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে।

কেউ বলেন, এই সাত হরফ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে সাত কেরাত।[১০৪]

কেউ কেউ বলেন সাত হরফ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে সাত ধরনের উচ্চারণ।

কেউ বলেন, এই সাত ধরনের উচ্চারণ হচ্ছে মুজার গোত্রের।

কেউ বলেন, এই সাত ধরনের উচ্চারণ হচ্ছে কুরাইশ গোত্রের।

কেউ বলেন, সাত হরফের দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে কুরআন কারিমের মুশকিল তথা কঠিন আয়াতগুলো সর্বোচ্চ সাত ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে।

কেউ বলেন, সাত হরফের দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে শব্দ অথবা আকৃতির ভিন্নতা।

কেউ বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, (কুরআনের আয়াতের কোনো শব্দ) কমবেশি করা অথবা ইরাব তথা বাক্যের শেষ অবস্থার পরিবর্তন অথবা কোনো আয়াত আগপিছ করা।

ইমাম তহাবি রহ.-এর মতে এই হাদিসের মাধ্যমে মুসলিমদের জন্য কুরআন তেলাওয়াতের বিষয়টি সহজ করা হয়েছে। কারণ, বিভিন্ন গোত্রের জন্য একই উচ্চারণে কুরআন তেলাওয়াত করা ছিল কঠিন। তবে সাহাবিগণ যখন দেখতে পেলেন, এসব গোত্রে কুরআন ছড়িয়ে পড়েছে এবং তা যথাযথ মুখস্থ ও আয়ত্ব করা হচ্ছে; তখন তারা এক কেরাতকেই বহাল রাখলেন। এটাই সে কেরাত, যে কেরাতে উসমান রা. কুরআন সংকলন করেছেন।

এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনে জারির তবারি রহ. বলেন, কুরআন সংকলন কোনো হারাম কাজ ছিল না। এর দ্বারা কোনো ওয়াজিবও ছেড়ে দেওয়া হয়নি। রাসুল ﷺ-এর ইন্তেকালের কয়েক মাস পূর্বে দশম হিজরির রমজান মাসে

---

১০৪. **সাত হরফ :** প্রণিধানযোগ্য মতানুসারে সাত হরফ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কেরাতের সাত ধরনের ভিন্নতা। এ মতটিই গ্রহণ করেছেন ইমাম মালেক রহ., ইবনে কুতাইবা রহ., আবু বকর বাকিল্লানি রহ., ইবনে জাযারি রহ. ও আবুল ফজল রাজি রহ.। আর সাত ধরনের ভিন্নতা হলো—১. একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন, পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ নিয়ে ভিন্নতা। ২. অতীতকালবাচক, ভবিষ্যৎকালবাচক, বর্তমানকালবাচক ও আদেশবাচক ক্রিয়া নিয়ে ভিন্নতা। ৩. হরকত নিয়ে ভিন্নতা। ৪. শব্দ কমবেশি করা নিয়ে ভিন্নতা। ৫. শব্দ আগে-পরে হওয়া নিয়ে ভিন্নতা। ৬. শব্দ নির্ধারণ নিয়ে ভিন্নতা। ৭. উচ্চারণপদ্ধতি নিয়ে ভিন্নতা। *মানাহিলুল ইরফান*, ১/১৫৫-১৫৭; *উলুমুল কুরআন* (মুফতি তাকি উসমানি), পৃ. ১০৬-১০৯।-সম্পাদক

যেভাবে তিনি ও জিবরাইল আ. একে অপরকে কুরআন শুনিয়েছিলেন, সেভাবেই তা সংকলন করেছেন। আর সাহাবিগণ এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন।

অতএব, আমাদের সামনে যে কুরআন রয়েছে তা উসমান রা.-এর সময়ে সংকলিত। এটি রাসুল ﷺ-এর মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে দশম হিজরির রমজান মাসে যেভাবে তিনি ও জিবরাইল আ. একে অপরকে কুরআন শুনিয়েছিলেন এবং নবীজির ওপর যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছিল, ঠিক সেভাবেই সংকলিত হয়েছে।

চতুর্থ অপবাদের জবাব : শিয়ারা উসমান রা.-এর ওপর অপবাদ আরোপ করে যে, তিনি কিছু উটের জন্য চারণভূমি নির্ধারণ করেছিলেন। সেখানে শুধু তার উটই চরানো হতো। অন্যদের উট চরানোর কোনো অনুমতি ছিল না। তাদের দাবি অনুযায়ী এমনটি করে তিনি বিদআত তথা নব্য প্রথা চালু করেছেন। তারা আরও বলে, তিনি নিজের উট এবং ঘোড়ার জন্য এই চারণভূমি নির্ধারণ করেছিলেন।

তাদের এ দাবি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, রাসুল ﷺ-এর আগমনের পূর্বে জাহেলি যুগেও চারণক্ষেত্র নির্ধারণের প্রথা ছিল। মালিক যে ভূমিকে উটের চারণভূমি বানাতে চাইত, সেখানে তিনি কুকুর নিয়ে প্রবেশ করত। এরপর যে পর্যন্ত কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাক পৌঁছত ততটুকুতে সীমানা দেওয়া হতো। সেই সীমানার মধ্যে তার উট ব্যতীত অন্য কারও উট চরানো যেত না। এই ছিল সে সময়কার চারণভূমি নির্ধারণের পদ্ধতি। রাসুল ﷺ এসে এ প্রথা রহিত করেন। তবে তিনি সদকার উটের জন্য নির্দিষ্ট চারণভূমির প্রথা চালু রাখেন। রবাযা অঞ্চলে রাসুল ﷺ-এর একটি চারণভূমি ছিল। রবাযা ছিল হিজাযের শেষ প্রান্তে, নাজদের নিকটবর্তী একটি মরু অঞ্চল। যার দৈর্ঘ্য ছিল সাত মাইল এবং প্রস্থ ছিল এক মাইল। এখানে সদকা, জিহাদ এবং জনগণের সুবিধার জন্য পালিত উট চরানো হতো।

সাব ইবনে জাসসামা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেছেন, একমাত্র আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল ব্যতীত অন্য কারও জন্য নির্দিষ্ট চারণভূমি নেই।[১০৫]

---

১০৫. *সহিহ বুখারি*, ২৩৭০; *সুনানু আবি দাউদ*, ৩০৮৩

আবু বকর রা. এ ব্যাপারে রাসুল ﷺ-এর পদ্ধতিই অনুসরণ করেছেন। উমর রা. এসে চারণভূমির আয়তন আরও বৃদ্ধি করেন এবং এর সঙ্গে আরও বেশ কিছু জায়গা সংযুক্ত করেন। কারণ, উমর রা.-এর যুগে মুসলিমদের বিজয় অভিযান ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ফলে জিহাদের ঘোড়াও বেড়ে গিয়েছিল। তাই জিহাদের উট এবং ঘোড়া চরানোর জন্য প্রয়োজন ছিল বিশাল এক অঞ্চল। উসমান রা.-এর যুগে এসে ইসলামি সাম্রাজ্যের পরিধি আরও বেড়ে যায়। মুসলিমরা হয়ে ওঠে পূর্বের তুলনায় অধিক সচ্ছল। অনেক সম্পদের পাশাপাশি অনেক উটেরও মালিক হন তারা। ফলে চারণভূমিকে আরও বেশি প্রশস্ত করা হয়। অতএব চারণভূমি মূলত রাসুল ﷺ-এরই সুন্নাহ। এর আয়তন বৃদ্ধি করা ছিল উমর রা.-এর সুন্নাহ। প্রয়োজন অনুযায়ীই এই বৃদ্ধি ঘটানো হয়েছিল। এর সঙ্গে নবীজির পূর্বোক্ত হাদিস—আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ব্যতীত অন্য কারও জন্য নির্দিষ্ট চারণভূমি নেই—এর কোনো বিরোধ নেই।

উসমান রা.-এর ব্যক্তিগত উটের পালকে এই চারণভূমিতে চরানো হতো না। এ ভূমিতে কেবলই সদকার উটগুলো চরানো হতো। উসমান রা.-এর উটগুলো চরানো হতো দূরে অন্য স্থানে। এ ব্যাপারে উসমান রা. ছিলেন খুবই কঠোর এবং সতর্ক। তিনি সদকার উটের জন্য নির্ধারিত চারণভূমিতে অন্য যেকোনো ধনী ব্যক্তির উট প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছিলেন। তবে অসচ্ছলদের তিনি এই চারণভূমিতে উট চরানোর সুযোগ দিয়েছিলেন। কারণ, অসচ্ছলতার কারণে মালিক খাবার দিতে অক্ষম হলে কখনো কখনো উট মারা যেত।

খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বেই উসমান রা. আরবের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উটের মালিক ছিলেন। শাহাদাতবরণের সময় তার কাছে কেবল দুটি উট ছিল। যা তিনি হজের সফরের জন্য রেখে দিয়েছিলেন। বাকি উটগুলো তিনি খলিফা থাকাকালীন মুসলিমদের কল্যাণে ব্যয় করে দিয়েছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর থেকে শাহাদাত পর্যন্ত এ ব্যাপারে তিনি সকল মুসলিমের চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন।

পঞ্চম অপবাদের জবাব : উসমান রা.-এর ওপর আরোপিত পঞ্চম অপবাদ হচ্ছে, তিনি আবু যর রা.-কে শাম থেকে রবাযায় নির্বাসিত করেছিলেন।

পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, আবদুল্লাহ ইবনে সাবা শামে তার মতাদর্শ প্রচারের কোনো সুযোগ না পেয়ে আবু যর গিফারি রা.-এর কাছে যায়। আবু যর

গিফারি রা. ছিলেন একেবারেই দুনিয়াবিমুখ। দুনিয়ার প্রতি কোনো মোহ তার ছিল না। এদিকে ইবনে সাবা চেয়েছিল শামের ভূখণ্ডে ফিতনার আগুন প্রজ্বলিত করতে। তাই সে আবু যর গিফারি রা.-কে গিয়ে বলে, মুআবিয়া রা. বলেছেন, এই সম্পদ কেবল আল্লাহ তাআলার। এ কথা বলে তিনি মুসলিমদের বঞ্চিত করতে চাইছেন।

মুআবিয়া রা. বাস্তবেই এ কথা বলেছিলেন। কিন্তু ইহুদি ইবনে সাবা আবু যর রা.-এর কাছে গিয়ে এর ভিন্ন ব্যাখ্যা করে, যা মুআবিয়া রা.-এর উদ্দেশ্য ছিল না। তখন আবু যর রা. মুআবিয়া রা.-এর কাছে গিয়ে বলেন,

আপনি কি বলেছেন সম্পদ আল্লাহ তাআলার?

মুআবিয়া রা. বললেন, হ্যাঁ।

আবু যর রা. বললেন, সম্পদ মুসলিমদের।

মুআবিয়া রা. অত্যন্ত সহনশীল বলে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাই সহনশীলতার সঙ্গে জবাব দিলেন, হে আবু যর, আল্লাহ আপনাকে দয়া করুন। আমরা সবাই কি আল্লাহ তাআলার বান্দা নই? সমস্ত সম্পদ তো তাঁরই। সমস্ত সৃষ্টি কি আল্লাহর নয়? সবকিছু কি আল্লাহর নির্দেশে হয় না?

আবু যর রা. বললেন, আপনি সে কথা আর বলবেন না।

মুআবিয়া রা. তখন অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে জবাব দিলেন, সম্পদ আল্লাহ তাআলার নয় এ কথা আমি বলব না। তবে আমি বলব যে, সম্পদ মুসলিমদের।[১০৬]

আবু যর রা. একবার শামের ধনী এবং শামের বিভিন্ন প্রান্তে নিযুক্ত মুআবিয়া রা.-এর দায়িত্বশীলদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি তাদের শুনিয়ে এ আয়াত পড়তে থাকেন—

﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾

আর যারা স্বর্ণ-রৌপ্য সঞ্চয় করে এবং তা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে না, তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সুসংবাদ প্রদান করো। [সুরা তাওবা : ৩৪]

---

১০৬. *আল-কামিল ফিত তারিখ*, ২/৪৮৪; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/১৭৫

তাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, যে ব্যক্তি একদিনের খাবারের চেয়ে বেশি সম্পদের মালিক হবে, সে সম্পদ সঞ্চয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং এই আয়াতের আওতাভুক্ত হবে।

আবু যর রা. মনে করতেন, যদি কেউ একদিনের খাবারের চেয়ে বেশি সম্পদের মালিক হয়, তাহলে আল্লাহ তাআলার রাস্তায় দান করে দেওয়া ফরজ। এর ব্যতিক্রম করার সুযোগ নেই। যারা এমনটি করবে না, তারাই আয়াতে ঘোষিত শাস্তির আওতাভুক্ত হবে। মুআবিয়া রা.-কেও তিনি একই কথা বলেছিলেন। মুআবিয়া রা. তাকে বলেছিলেন, সুবহানাল্লাহ! কী বলছেন আপনি! মানুষ তো এমনটি পারবে না। আপনি যা বলছেন তা তো ওয়াজিবও নয়। এরপর মুআবিয়া রা. ব্যাপারটি উসমান রা.-কে জানিয়ে দেন।[১০৭]

আবু যর রা.-এর এই অবস্থান নিয়ে আমাদের একটু ভাবা উচিত। কারণ, আবু যর রা. ছিলেন অত্যন্ত খোদাভীরু ব্যক্তি, দুনিয়াবিমুখ ও আখেরাতের প্রতি আগ্রহী। অপরদিকে আমরা দেখি যে, (মদিনার একজন ফকিহ সাহাবি) আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলছেন, যে সম্পদের জাকাত দেওয়া হয় তা সঞ্চিত সম্পদ নয়।

তা ছাড়া শরিয়তের নিয়ম অনুযায়ী একজন মুসলিম কতটুকু ধনী হবেন, তা নিয়ে কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। একজন মুসলিম যা ইচ্ছা তাই নিজের মালিকানায় রাখতে পারে। তবে শর্ত হচ্ছে, এই সম্পদ হালাল পন্থায় উপার্জন করতে হবে। ব্যয় করতে হবে হালাল খাতে। অপচয় করা যাবে না এবং সেই সম্পদের জাকাতও আদায় করতে হবে।

তবে এ ক্ষেত্রে আবু যর রা.-এর এই অবস্থান ছিল অধিক সতর্কতামূলক এবং জান্নাতের জন্য নিকটতম। একজন মানুষ যত বেশি দুনিয়াবিমুখ হবে তার জন্য তা ততই কল্যাণজনক হবে। রাসুল ﷺ আমাদেরকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের দুনিয়াবিমুখতায় উৎসাহিত করেছেন। এমনকি তিনি খালি চাটাইয়ে ঘুমিয়েছেন। তার পিঠে সেই চাটাইয়ের দাগ বসে যেত। ক্ষুধার কারণে তিনি পেটে একটি অথবা দুটি পাথর বেঁধে রাখতেন। লাগাতার দুই মাস তার চুলায় আগুন জ্বলেনি। আবু বকর রা.-ও ছিলেন এমনই। উমর রা.-ও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। এমনইভাবে অনেক সাহাবি ছিলেন এ পর্যায়ের

১০৭. *তারিখুত তবারি*, ৪/২৮৩; *আল-কামিল ফিত তারিখ*, ২/৪৮৪; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/১৭৫

দুনিয়াবিমুখ এবং খোদাভীরু। রাসুল ﷺ যদি চাইতেন, আল্লাহ তাকে উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ দিয়ে দিতেন। বিশুদ্ধ হাদিস থেকে এমনটি জানা যায়। রাসুল ﷺ প্রায়ই বলতেন, দুনিয়ার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক?

আবু যর রা. এ ক্ষেত্রে রাসুল ﷺ-কে পূর্ণ অনুসরণ করার চেষ্টা করেছেন। অন্যদেরও উদ্‌বুদ্ধ করেছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে এ পর্যায়ে উন্নীত হওয়া সম্ভব নয়। এ ছাড়া বিষয়টি ফরজও ছিল না। ফরজ হচ্ছে, মানুষ যে সম্পদের মালিক হবে তা যেন হালাল পন্থায় উপার্জন করে, হালাল খাতে ব্যয় করে এবং সেই সম্পদের জাকাত আদায় করে। একজন মুসলিম যদি হালাল সম্পদ জমা করে তা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে, তাহলে এটি যে মুসলিমদের জন্য উপকারী এবং কল্যাণজনক হবে তা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। এতে সে যে কল্যাণ অর্জন করবে, তা কোনো দরিদ্র ব্যক্তি অর্জন করতে পারবে না।

উসমান রা., আবু বকর রা. এবং আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. প্রমুখ সাহাবিগণের ধনাঢ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করার সুযোগ নেই। ইসলাম প্রচারের কল্যাণে তাদের সম্পদ ব্যয় হয়েছে। তাই একজন মুসলিম হিসাবে হালাল সম্পদ অর্জন এবং তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ বিষয়। ইসলাম তাতে উৎসাহিত করে। তবে শর্ত হচ্ছে, দুনিয়ার লোভে, অথবা সঞ্চয় করার উদ্দেশ্যে কিংবা নিছক সম্পদ বাড়ানোর লক্ষ্যে এসব সম্পদ অর্জন করা যাবে না।

একজন মুসলিম যদি নিজেকে আদর্শবান এবং অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তাহলে তার উচিত, আল্লাহ তাআলার ইবাদত যেমন, নামাজ আদায়, অন্যকে দ্বীন শেখানো, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা ও জীবিকা উপার্জন ইত্যাদির জন্য সময় বণ্টন করে নেওয়া। একজন মুসলিমের জন্য তার সময়কে অপরের প্রয়োজন, নিজের প্রয়োজন এবং আল্লাহ তাআলার ইবাদতের জন্য বণ্টন করে নেওয়া উচিত। সম্পদ উপার্জনের ক্ষেত্রে এই নিয়ত থাকবে যে, এই সম্পদের মাধ্যমে নিজেকে এবং পরিবারকে অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে রক্ষা করবে, হালাল উপার্জন থেকে তাদের প্রয়োজন নির্বাহ করবে এবং তা ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর জন্য খরচ করবে। ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর জন্য খরচ করাটা তার অনুগ্রহ নয়; বরং কাউকে খোঁটা ও কষ্ট না দিয়ে এটি করা তার কর্তব্য। কারণ, এ

সম্পদ তো আল্লাহ তাআলারই। তিনি তাকে এর প্রতিনিধি বানিয়েছেন, সে কীভাবে তা ব্যয় করে তা দেখার জন্য।

ধনসম্পদ বণ্টনের কথা বলায় সোশ্যালিস্ট তথা সমাজতান্ত্রিকরা আবু যর রা.-কে তাদের ইসলামিক গুরু মনে করে। আল্লাহ তাআলা তাকে তাদের একজন সদস্য হওয়া থেকে পবিত্র রেখেছেন; তিনি তাদের গুরু হওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না। তার ইচ্ছা ছিল, তিনি দুনিয়াবিমুখ থাকবেন এবং দুনিয়ার প্রতি আগ্রহী হবেন না। তার ইচ্ছা ছিল প্রত্যেকেই যেন আল্লাহ তাআলার রাস্তায় তাদের ধনসম্পদ ব্যয় করে। তার ইচ্ছা এটা ছিল না যে, সকল সম্পদ লোকদের মধ্যে সমানভাবে বন্টন করে দেওয়া হোক; যে কাজ করে আর যে কাজ করে না তাদের সবাকেই সম্পদ দেওয়া হোক।

উসমান রা. মুআবিয়া রা.-এর কাছ থেকে এ কথা শোনার পর আবু যর রা.-কে ডেকে পাঠান। তিনি উসমান রা.-এর কাছে আসেন এবং তার সঙ্গে এ ব্যাপারে তর্কে লিপ্ত হন। আবু যর রা. শুরুতে বলেন, রাসুল ﷺ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, সাল নামক স্থানে যখন বাড়িঘর হবে, তখন আমি যেন সেখান থেকে বেরিয়ে যাই, সাল মদিনার প্রান্তে অবস্থিত একটি এলাকার নাম। রাসুল ﷺ-এর যুগে সেখানে তেমন জনবসতি ছিল না।

রাসুল ﷺ ছিলেন লোকদের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত। তিনি ভালোভাবেই জানতেন যে, যখন মদিনায় নাগরিক সভ্যতা গড়ে উঠবে এবং মানুষের জীবনযাপন উন্নত হতে শুরু করবে, তখন আবু যর রা. সেখানে বসবাস করতে পারবে না। আর এটা তিনি যে খোদাভীরুতা এবং দুনিয়াবিমুখতা আঁকড়ে ধরেছেন সেটার কারণেই সম্ভব হবে না। যদি তিনি লোকেদর মধ্যে অবস্থান করেন, তাহলে নিজেকেও কষ্টে ফেলবেন এবং লোকদেরও কষ্টে ফেলবেন। এজন্যই রাসুল ﷺ তাকে চলে যাওয়ার উপদেশ দিয়েছেন।

সাল থেকে চলে যাওয়ার কথা বললে উসমান রা. আবু যর রা.-কে বললেন, তাহলে এখন আপনার সিদ্ধান্ত কী?

আবু যর রা. বললেন, আমি রবাযায় চলে যেতে চাই।

দেখা গেল যে, আবু যর রা. নিজেই রবাযায় চলে যেতে চেয়েছেন।

তখন উসমান রা. তাকে বলেছেন, তবে তা-ই করুন।[১০৮]

অর্থাৎ, এখানে উসমান রা. আবু যর রা.-এর ইচ্ছার সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন।

আবু যর রা. স্বেচ্ছায় এবং সজ্ঞানে রবাযার উদ্দেশে বেরিয়েছিলেন। এখানে কোনো নির্বাসন অথবা বিতাড়িত করার ঘটনা ঘটেনি। যেমনটি উসমান রা.-এর সময়ের ফিতনাবাজরা দাবি করেছে। পরবর্তী সময়ে শিয়ারাও এ দাবি করে এবং তা আজও পর্যন্ত তাদের গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ আছে। অনেক অজ্ঞ এবং অসচেতন মুসলিমও এ ফাঁদে পা দিয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে সামিত রহ.-এর বর্ণনা আমাদের উক্ত বক্তব্যকে আরও শক্তিশালী করে তোলে। তিনি বলেন,

উম্মে যর রা. বলেছেন, আল্লাহর শপথ! উসমান রা. আবু যর রা.-কে সফরের নির্দেশ দেননি। বরং রাসুল ﷺ-ই তাকে বলেছিলেন, যখন সাল নামক স্থানে জনবসতি গড়ে উঠবে, তখন তুমি সেখান থেকে বেরিয়ে যাবে।[১০৯]

হাকিম রহ. বলেন, ইমাম বুখারি রহ. ও মুসলিম রহ.-এর শর্ত অনুযায়ী হাদিসটি সহিহ। যদিও তারা বর্ণনা করেননি। ইমাম যাহাবি রহ.-ও এ কথার সঙ্গে একমত হয়েছেন।

উসমান রা. আবু যর রা.-এর ইচ্ছা ও আগ্রহের প্রতি সম্মান দেখিয়ে তাকে সফরের জন্য উট প্রদান করেছেন। তার সেবায় দুজন গোলাম নিয়োজিত করেছেন এবং ভাতা চালু করেছেন। এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে, আবু যর রা. প্রায়ই মদিনা মুনাওয়ারা ভ্রমণে আসতেন। যদি তিনি নির্বাসিত হতেন, তবে তিনি কখনোই মদিনায় প্রবেশ করতে পারতেন না। এ ছাড়া রবাযা অঞ্চলটি মরুভূমির বিচ্ছিন্ন কোনো অঞ্চল ছিল না। ইয়াকুত হামাকি রহ. এ অঞ্চল সম্পর্কে বলেন, মক্কা এবং মদিনার মধ্যকার গমনপথে রবাযা ছিল একটি উত্তম বিশ্রামস্থল। মদিনা থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। সেখানে ছিল মানুষের বসবাস। নির্মিত করা হয়েছিল মসজিদ।[১১০] মসজিদ

---

১০৮. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/১৭৫; *তারিখু ইবনি খালদুন*, ২/৫৮৮; *তারিখুত তবারি*, ৪/২৮৪
১০৯. *আল-মুসতাদরাক লিল হাকিম*, ৫৪৬৮
১১০. *তারিখুল বুলদান*, ৩/২৪

নির্মাণের মাধ্যমেই বোঝা যায় আবু যর রা. এখানে একা বসবাস করতেন না।

অতএব বোঝা গেল, তাদের দাবি সম্পূর্ণ অবাস্তব। নির্বাসন, বিতাড়ন এবং বরখাস্তকরণ—এ সবই ছিল মিথ্যা অপবাদ। আবু যর রা. স্বেচ্ছায় সেখানে গিয়েছিলেন।

ষষ্ঠ অপবাদের জবাব : তাদের দাবি হচ্ছে উসমান রা. আরেক সম্মানিত সাহাবি আবু দারদা রা.-কে শাম থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। তিনি শামের কাজি তথা বিচারক ছিলেন। তাকে বরখাস্ত করে জোরপূর্বক নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন। ফিতনার সময়ে তারা এ কথা বলেছিল। তবে পরবর্তী শিয়াদের গ্রন্থাবলিতে এ ঘটনার তেমন চর্চা হয়নি। কারণ, আবু দারদা রা.-এর প্রতি শিয়ারা সন্তুষ্ট ছিল না।

আসল কথা হচ্ছে, আবু দারদা রা. ছিলেন শামের বিচারক। সত্যের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন খুবই কঠোর। এমনকি এজন্য কেউ কেউ তাকে উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর সঙ্গেও তুলনা করেছেন। আল্লাহ তাআলার হকের ক্ষেত্রে তিনি কাউকেই বিন্দুমাত্র ছাড় দিতেন না। তিনি শামের অধিবাসীদের কিছুটা কঠোরতার সঙ্গে সম্বোধন করতেন। লোকেরা এটা অপছন্দ করে। সে সময় শামের গভর্নর ছিলেন মুআবিয়া রা.। তিনি ছিলেন কোমল এবং সহনশীল প্রকৃতির। তাই একজন সম্মানিত সাহাবি হিসাবে আবু দারদা রা.-কে তিনি নিষেধ করেননি। এদিকে উসমান রা.-এর কাছে আসতে থাকে একের পর এক অভিযোগ। অবশেষে উসমান রা. আবু দারদা রা.-এর সঙ্গে আলোচনা করে তাকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নেন। আবু দারদা রা. নিজের ইচ্ছাতেই শাম ত্যাগ করে উসমান রা.-এর প্রতিবেশী হয়ে মদিনা মুনাওয়ারায় জীবনযাপনের সিদ্ধান্ত নেন।

ইতিহাসের গ্রন্থাবলিতে এ অভিযোগকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। এসব অবান্তর অভিযোগ উত্থাপন করে তারা সাধারণ লোকদের উসমান রা.-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তুলতে চাইত। এ ক্ষেত্রে ফিতনাবাজগোষ্ঠীর নেতৃস্থানীয়দের নীতি ছিল, তারা প্রথমে উসমান রা. কর্তৃক নিযুক্ত গভর্নরদের ওপর অপবাদ আরোপ করত। তাদের নিন্দায় লিপ্ত হতো এবং বিভিন্ন দোষারোপ করত। যদি কোনো বিশিষ্ট সাহাবি গভর্নর হতেন, তাহলে তারা চেষ্টা করত উসমান রা. এবং তাদের মধ্যে বিরোধ ঘটাতে। এসব সাহাবির

মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা., আম্মার ইবনে ইয়াসির রা., আবু দারদা রা. এবং আবু যর গিফারি রা. প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবিগণ।

তাদের দাবি অনুযায়ী উসমান রা.-কর্তৃক নিযুক্ত অন্যান্য গভর্নরগণ হয়তো তার নিকটাত্মীয় ছিলেন, নয়তো ফাসেক অথবা অত্যাচারী ছিলেন। তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল, সব দিক থেকে উসমান রা.-কে প্রশ্নবিদ্ধ করা। এ ক্ষেত্রে তারা এ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল যে, যখন তারা কিছুসংখ্যক লোক-সহ উসমান রা.-কে বরখাস্ত করার দাবি নিয়ে যায়, তখন মুসলিম উম্মাহ একপর্যায়ে তাদের এ জঘন্যতম দাবির পক্ষে সম্মতিও দিয়েছিল, যা ইতিপূর্বে কখনো ঘটেনি।

সপ্তম অপবাদের জবাব : শিয়াদের দাবি হচ্ছে, রাসুল ﷺ নির্বাসিত করার পরও উসমান রা. হাকাম ইবনে আবুল আস রা.-কে ফিরিয়ে এনেছে।

শিয়াদের গ্রন্থাবলির বর্ণনা অনুযায়ী রাসুল ﷺ হাকাম ইবনে আবুল আস রা. এবং তার পুত্র মারওয়ানকে মদিনা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আবু বকর রা. এবং উমর রা.-এর আমলেও তারা বিতাড়িতই ছিলেন। কিন্তু উসমান রা. তাদের দুজনকে মদিনায় ফিরিয়ে এনে আশ্রয় দিয়েছেন।

এর উত্তর হচ্ছে—

এক. রাসুল ﷺ-কর্তৃক হাকাম ইবনে আবুল আস রা. এবং তার পুত্রকে বিতাড়িত করার বিবরণ সিহাহ সিত্তাহ তথা হাদিসের ছয় বিশুদ্ধ কিতাবের কোনোটিতেই আসেনি। হাদিসের অন্যান্য গ্রন্থগুলোতে যে বিবরণ এসেছে, তা এসেছে মুরসাল সূত্রে। কোনো তাবেয়ি যদি সাহাবিগণের নাম উল্লেখ করা ব্যতীত সরাসরি রাসুল ﷺ-এর দিকে সম্বন্ধ করে হাদিস বর্ণনা করে, তাহলে সেটিকে মুরসাল হাদিস বলা হয়। কোনো কোনো হাদিসবেত্তার মতে মুরসাল হাদিস দুর্বল। এর মাধ্যমে দলিল দেওয়া যায় না। ইমাম নববি রহ. *আত-তাকরিব ওয়াত তাইসির* গ্রন্থে এটাকে অধিকাংশ মুহাদ্দিস এবং উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ফকিহ ও উসুলবিদের[১১১] মত আখ্যা দিয়েছেন।

---

১১১. উসুলবিদ : ইসলামি ফিকহের উৎসসমূহ নিয়ে গবেষণায় পারদর্শী ব্যক্তিকে উসুলবিদ বলা হয়।-সম্পাদক

দুই. এই বর্ণনার মধ্যে এমন বর্ণনাকারী রয়েছেন, যাদের ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। কারও কারও ব্যাপারে মিথ্যা বলার অভিযোগও আছে।

আসুন, হাকাম ইবনে আবুল আস রা.-এর বিষয়টি আমরা গভীরভাবে পর্যালোচনা করি—

হাকাম ইবনে আবুল আস রা. ছিলেন মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন। অষ্টম হিজরিতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণকারীদের ইতিহাসে তুলাকা (ক্ষমাপ্রাপ্ত) নামে অভিহিত করা হয়। সংখ্যায় তারা ছিলেন ২ হাজার। হাকাম ইবনে আবুল আস রা. মক্কায় বসবাস করতেন, মদিনায় নয়। তাহলে রাসুল ﷺ কীভাবে তাকে মদিনা থেকে বিতাড়িত করবেন?

কেউ কেউ বলেন, তিনি মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেছিলেন। তাদের উদ্দেশে বলব, *সহিহ বুখারি*-তে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসুল ﷺ বলেছেন, মক্কা বিজয়ের পর আর কোনো হিজরত নেই। এখন শুধু জিহাদ এবং নিয়তের সময়। অতএব যখন তোমাদের আহ্বান করা হবে তখন তোমরা বেরিয়ে পড়বে।

এই হাদিসের মাধ্যমে মক্কা বিজয়ের পর মদিনায় হিজরতকে সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করা হয়েছে। মক্কা বিজয়কালে ইসলাম গ্রহণকারী সফওয়ান ইবনে উমাইয়া রা. যখন মদিনায় হিজরত করেন, তখন রাসুল ﷺ তাকে অভ্যর্থনা জানান। কিন্তু যখন তাকে সংবাদ দেওয়া হলো যে, সফওয়ান রা. মক্কা থেকে হিজরত করেছেন, তখন তাকে মক্কার দিকে ফিরিয়ে দেন এবং বলেন, মক্কা বিজয়ের পর আর কোনো হিজরত নেই। এখন শুধু জিহাদ এবং নিয়তের সময়।

মক্কা বিজয়ের পর আব্বাস রা. রাসুল ﷺ-এর কাছে এক লোককে নিয়ে যান এবং শপথ করেন যে, নবীজি ওই ব্যক্তি থেকে হিজরতের বাইআত নেবেন। এ ঘটনা ছিল মক্কা বিজয়ের পর। তখন রাসুল ﷺ ওই ব্যক্তির হাত ধরে বললেন, আমি আমার চাচাকে শপথ থেকে মুক্ত করলাম। তবে মক্কা বিজয়ের পর আর কোনো হিজরত নেই।[১১২]

---

১১২. *আল-মুসনাদ লিল ইমাম আহমাদ*, ১৫৫৫০

সুতরাং বোঝা গেল যে, হাকাম ইবনে আবুল আস রা. ছিলেন মূলত মক্কার অধিবাসী। মদিনার অধিবাসী ছিলেন না। তাই রাসুল ﷺ তাকে মদিনা থেকে বিতাড়িত করার প্রশ্নই ওঠে না।

কিছু আলেম বলেন, হাকাম রা. স্বেচ্ছায় তায়েফ গমন করেছিলেন, নির্বাসিত হয়ে নয়। এই মতটি বিশুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। কারণ, হাকাম রা. রাসুল ﷺ-এর জীবনের শেষদিকে কিছুকাল তায়েফে অবস্থান করেছিলেন।

শিয়াদের পূর্বোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী হাকাম ইবনে আবুল আস রা. এবং তার পুত্র মারওয়ানকে মদিনা থেকে তায়েফে নির্বাসিত করা হয়েছিল। কিন্তু আমরা দেখতে পাই, অষ্টম হিজরিতে মক্কা বিজয়ের সময় মারওয়ানের বয়স ছিল সাত বছর। যদি রাসুল ﷺ তার জীবনের শেষ দিনে এসেও তাদেরকে নির্বাসিত করেন, তখন মারওয়ানের বয়স সর্বোচ্চ ১০ বছর হওয়ার কথা। সে হিসাবে তার ওপর শরিয়তের কোনো আদেশ প্রয়োগ করা যায় না। এমন কাউকে রাসুল ﷺ নির্বাসিত করবেন তা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার।

তর্কের খাতিরে না হয় ধরে নিলাম শিয়াদের গ্রন্থাবলিতে পাওয়া এই বর্ণনা সঠিক। রাসুল ﷺ হাকাম ইবনে আবুল আস রা.-কে তায়েফে নির্বাসিত করেছিলেন। কিন্তু শরিয়তে এমন কোনো অপরাধ নেই, যার কারণে স্থায়ীভাবে নির্বাসিত করা হয়। নির্বাসনের থাকে নির্দিষ্ট মেয়াদ, যা শেষ হওয়ার পর নির্বাসিত ব্যক্তি পুনরায় ফিরে আসে কিংবা নির্বাসিত ব্যক্তি যদি তওবা করে এবং বিচারক তার তওবাকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন, তাহলে তাকে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই ফিরিয়ে আনা হয়। তাই হাকাম রা. যদি নির্বাসিত হয়ে থাকেন এবং উসমান রা. তাকে ফিরিয়ে আনেন, তবে এতে সমস্যার কিছু নেই।

প্রশ্ন উঠতে পারে, আবু বকর রা. এবং উমর রা. কেন ফিরিয়ে আনলেন না? অথচ এক বর্ণনা অনুযায়ী জানা যায়, উসমান রা. তাদের দুজনের কাছে এজন্য সুপারিশও করেছিলেন।

তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম, আবু বকর রা. এবং উমর রা.-এর সময়েও হাকাম ইবনে আবুল আস রা. নির্বাসিত ছিলেন এবং তারা দুজন তাকে ফিরিয়ে আনেননি। এর কারণ হতে পারে তিনি তখনও তওবা করেননি, পরবর্তী সময় তওবা করেছেন। কিংবা এটাও হতে পারে যে, তার নির্বাসনের মেয়াদ তখনও যথেষ্ট হয়নি। কিন্তু উসমান রা.-এর সময়ে এসে তা যথেষ্ট

হয়েছে। আবার এটাও হতে পারে যে, হাকাম ইবনে আবুল আস রা. প্রথম দুই খলিফার কাছে আবেদন করেননি। কিন্তু উসমান রা.-এর কাছে আবেদন করেছিলেন।

যদি কেউ বলে যে, হাকাম ইবনে আবুল আস রা.-কে স্থায়ীভাবে নির্বাসন করা হয়েছিল, তাহলে উসমান রা. তাকে ফিরিয়ে এনেছেন এমন ধারণা করাও অসম্ভব। কারণ, রাসুল ﷺ-এর নির্দেশের ব্যাপারে উসমান রা. ছিলেন খুবই সতর্ক। যদি এমনটি তিনি করতেনই তাহলে সকল সাহাবিই এ নিয়ে প্রশ্ন তুলতেন। এ কাজে উসমান রা.-এর বিরোধিতা করতেন যে, রাসুল ﷺ তাকে যে স্থায়ী নির্বাসনের নির্দেশ দিয়েছেন, আপনি তা লঙ্ঘন করেছেন। অথচ অন্যান্য সাহাবিগণের সঙ্গে আলি রা. নিজেও এ কাজে সহমত পোষণ করেছিলেন।

যদি প্রশ্ন করা হয়, তাহলে একজন অপরাধীর ক্ষেত্রে উসমান রা. কেন সুপারিশ করলেন?

উত্তরে বলব, এটি একপ্রকারের আত্মীয়তা রক্ষা। হাকাম রা. ছিলেন উসমান রা.-এর চাচা। *সহিহ বুখারি*-তে উরওয়া রহ.-এর সূত্রে আসমা রা. থেকে বর্ণিত আছে, কুরাইশরা যখন রাসুল ﷺ-এর সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করেছিল, (হুদাইবিয়ার সন্ধি), সে সময় আমার মা তার পুত্রকে নিয়ে আমাকে দেখতে এলেন। তখন তিনি মুশরিক ছিলেন। আমি রাসুল ﷺ-কে বললাম, আমার মা এসেছেন। তিনি আমাকে দেখতে আগ্রহী। আমি কি তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখব? তিনি বললেন, হ্যাঁ তোমার মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখো।[১১৩]

উম্মুল মুমিনিন সফিয়্যা বিনতে হুয়াই রা. তার মৃত্যুর পূর্বে কিছু ইহুদি নিকটাত্মীয়ের জন্য অসিয়ত করে গিয়েছিলেন। এ ঘটনার দ্বারা ফকিহগণ দলিল দিয়েছেন যে, একজন মুসলিম তার বিধর্মী জিম্মি[১১৪] আত্মীয়দের জন্য অসিয়ত করতে পারবে। অতএব, যদি একজন বিধর্মীর সঙ্গে আত্মীয়তা রক্ষা বৈধ হয়ে থাকে, তাহলে মুসলিমের সঙ্গে আত্মীয়তা রক্ষা কেন বৈধ হবে না?

তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম এই সুপারিশ করে উসমান রা. ভুল করেছেন। তিনি হাকাম রা.-কে মদিনায় ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে ইজতেহাদ করেছেন।

---

১১৩. *সহিহ বুখারি*, ৫৯৭৯; *সহিহ মুসলিম*, ১০০৩

১১৪. জিম্মি : ইসলামি রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক অনুমতিপ্রাপ্ত বসবাসকারী অমুসলিম।-সম্পাদক

উত্তম ছিল তাকে ফিরিয়ে না আনা। কিন্তু এই কারণে কি উসমান রা.-কে আদৌ দোষারোপ করা যায়?

রাসুল ﷺ এবং হাতিব ইবনে আবি বালতাআ রা.-এর ঘটনার দিকে আমরা একটু লক্ষ্য করি—

হাতিব ইবনে আবি বালতাআ রা. মক্কা বিজয়ের লক্ষ্যে রাসুল ﷺ-এর প্রস্তুতির কথা মক্কার কাফেরদের কাছে ফাঁস করে দিয়েছিলেন। মক্কায় তার পরিবার-পরিজন এবং সম্পদ ছিল। তিনি এসবের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। তাই চেয়েছিলেন, মক্কার অধিবাসীরা যেন এসবের কোনো ক্ষতি না করে। তাই তিনি তাদেরকে রাসুল ﷺ-এর প্রস্তুতির সংবাদ জানিয়ে দিয়েছিলেন। *সহিহ বুখারি*-তে আলি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল ﷺ আমাকে এবং আবু মারসাদ গানাবি ও যুবায়ের ইবনুল আওয়াম রা.-কে পাঠালেন। তিনজনই ছিলাম অশ্বারোহী। তিনি বললেন, তোমরা যেতে থাকবে। যখন তোমরা রওজায়ে খাখ[১১৫] নামক স্থানে পৌঁছবে, সেখানে এক মুশরিক মহিলাকে দেখতে পাবে। তার সঙ্গে হাতিবের পক্ষ থেকে মুশরিকদের কাছে প্রেরিত একটি চিঠি রয়েছে।

আলি রা. বলেন, রাসুল ﷺ যে স্থানের কথা বলেছেন সেখানেই আমরা সেই মহিলাকে দেখতে পেলাম; সে একটি খচ্চরের পিঠে চড়ে যাচ্ছিল। আমরা তাকে বললাম, চিঠি কোথায়?

সে বলল, আমার সঙ্গে কোনো চিঠি নেই।

আমরা তাকে থামিয়ে খোঁজাখুঁজি করে কোনো চিঠি পেলাম না। অতঃপর বললাম, রাসুল ﷺ কখনো মিথ্যা বলেন না। হয়তো তুমি চিঠি বের করবে, নইলে আমরা তোমাকে বিবস্ত্র করে হলেও চিঠি বের করব।

আমাদের এ কথা শুনে সে কোমরের কাপড়ের নিচ থেকে চিঠিটি বের করে দিলো। আমরা সেই চিঠি নিয়ে রাসুল ﷺ-এর কাছে চলে গেলাম।

তখন উমর রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, নিশ্চয় সে আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও সকল মুমিনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান ছিন্ন করে দেবো।

---

১১৫. **রওজায়ে খাখ :** মদিনা মুনাওয়ারা থেকে পায়ে হেঁটে একদিনের দূরত্বে অবস্থিত একটি স্থান, যে স্থানটিকে রাসুল ﷺ-সহ পরবর্তী খলিফাগণ চারণভূমি বানিয়েছিলেন। (উইকিপিডিয়া)-সম্পাদক

রাসুল ﷺ হাতিব রা.-কে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন তুমি এমন কাজ করলে?

হাতিব রা. বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের প্রতি কিছুতেই অবিশ্বাসী নই। আমি চেয়েছিলাম, কোনো মক্কার অধিবাসীর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আমার পরিবার এবং সম্পদের নিরাপত্তা দিক। আপনার সাহাবিগণের প্রত্যেকেরই সেখানে কেউ না কেউ আছে, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাদের পরিবার এবং সম্পদের নিরাপত্তা দেবেন।

রাসুল ﷺ বললেন, সে সত্য বলেছে। তাই কেউ তাকে মন্দ বলবে না।

উমর রা. আবারও বললেন, নিশ্চয় সে আল্লাহ, তাঁর রাসুল এবং সমস্ত মুমিনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান ছিন্ন করে দেবো।

রাসুল ﷺ তখন বললেন, সে কি বদরে অংশগ্রহণ করেনি?

তিনি আরও বললেন, নিশ্চয়! আল্লাহ বদরে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশে বলেছেন, তোমরা যা ইচ্ছা তাই করো, তোমাদের জন্য জান্নাত আবশ্যক হয়ে গিয়েছে। অথবা বলেছেন, তোমাদেরকে আমি ক্ষমা করে দিয়েছি।

এ কথা শুনে উমর রা.-এর চক্ষুদ্বয় অশ্রুসজল হয়ে যায়। তিনি বলেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলই ভালো জানেন।[১১৬]

উসমান রা. হাকাম ইবনে আবুল আস রা.-এর ব্যাপারে যা করেছেন, এর তুলনায় হাতিব ইবনে আবি বালতাআ রা.-এর কাজ অনেক বেশি গুরুতর ছিল। তবুও রাসুল ﷺ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। হাকাম ইবনে আবুল আস রা.-কে ফিরিয়ে আনাকে ভুল তখনই বলা যাবে, যদি আমরা ধরে নিই যে, তাকে আসলেই নির্বাসিত করা হয়েছিল।

হাতিব ইবনে আবি বালতাআ রা.-এর তুলনায় উসমান রা.-এর মর্যাদা অনেক বেশি। রাসুল ﷺ-এর সাক্ষ্যমতে, তিনি, আবু বকর রা. ও উমর রা.-এর পরে উসমান রা.-এর ঈমানের শক্তি পুরো মুসলিম উম্মাহর ঈমানের শক্তির সমপর্যায়ের।

---

১১৬. *সহিহ বুখারি*, ৩৯৮৩; *সহিহ মুসলিম*, ২৪৯৪

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, রাসুল ﷺ থাকা অবস্থায় আমরা আবু বকর রা., উমর রা. ও উসমান রা.-এর সঙ্গে কারও তুলনা করতাম না। তাদের পরে অন্য সাহাবিগণের মধ্যে কোনো পার্থক্য করতাম না।[১১৭]

রাসুল ﷺ হাতিব ইবনে আবি বালতাআ রা.-এর এই মারাত্মক অপরাধ, যাকে আমরা বর্তমানে ভয়ানক বিশ্বাসঘাতকতা আখ্যা দিয়ে থাকি, তা ক্ষমা করেছেন। এমনকি তিনি হাতিব রা.-কে বিশ্বাসঘাতক বলাও সহ্য করেননি। তাহলে আমরা উসমান রা.-এর একটি ইজতেহাদকে কেন গ্রহণ করতে পারছি না? অথচ তার এই ইজতেহাদে ভুল হাতিব রা.-এর অপরাধের চেয়ে খুবই সামান্য।

মজবুত ঈমান এবং সুস্থ আকিদাসম্পন্ন একজন মুসলিমের কাছে এ বিষয়টি স্পষ্ট। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, সাহাবিগণ সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস হতে হবে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ। অপরদিকে মুসলিম উম্মাহর প্রতি সাধারণ কোনো সাহাবির বিরূপ ধারণা ছিল না। উসমান রা.-এর এমন ধারণা থাকার তো কোনো প্রশ্নই আসে না।

শিয়ারা উসমান রা.-কে শুধু বিশ্বাসঘাতকতা অথবা নেফাকের (কপটতার) অভিযোগে অভিযুক্ত করে না; বরং দ্ব্যর্থহীনভাবে সরাসরি তাকে কাফের হিসাবে সাব্যস্ত করে। আবু বকর রা. এবং উমর-রা.-কেও একইভাবে কাফের আখ্যা দেয় তারা। তাদের এই মিথ্যা অপবাদ কতই-না নিকৃষ্ট।

অষ্টম অপবাদের জবাব : শিয়াদের দাবি হচ্ছে উসমান রা. সফরে নামাজ কসর করার সুন্নাহকে রহিত করেছেন। এই অভিযোগের ভিত্তি হচ্ছে, ২৯ হিজরিতে হজের মৌসুমে উসমান রা. মিনায় পূর্ণ নামাজ আদায় করেছেন। কিন্তু রাসুল ﷺ-এর সুন্নাহ ছিল মিনায় এবং প্রতি সফরে নামাজ কসর তথা সংক্ষিপ্ত করা। রাসুল ﷺ কোনো সফরে পূর্ণ নামাজ আদায় করেছেন বলে প্রমাণিত হয়নি। তাই উসমান রা.-এর এই বিষয়টি ছিল সাধারণ নীতির বিপরীত। তখন আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. এ ব্যাপারে উসমান রা.-এর সঙ্গে তর্ক করেন। আলি ইবনে আবু তালেব রা. এবং আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. প্রমুখ সাহাবিগণও আপত্তি পেশ করেন। তখন উসমান রা. পূর্ণ নামাজ আদায়ের কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন, মক্কায় আমার পরিবার আছে।

---

১১৭. *সহিহ বুখারি*, ২৬৯৭; *সুনানু আবি দাউদ*, ৪৬২৭

এখানে আমি বিয়ে করেছি, এ হিসাবে তো আমি মক্কার অধিবাসী। তখন আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. বলেন, আপনার তো মদিনাতেও পরিবার রয়েছে। আপনি মদিনাতেই আপনার পরিবারের সঙ্গে অবস্থান করে থাকেন। তখন উসমান রা. বলেন, তায়েফে আমার সম্পদ রয়েছে।

আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. বলেন, আপনার এবং তায়েফের মধ্যে তিন দিনের দূরত্ব। তাই তায়েফকে আপনার শহর হিসাবে গণ্য করতে পারেন না।

উসমান রা. বললেন, ইয়ামেনিদের একটি দল বলে থাকে, নিজ শহরেও নামাজ দুই রাকাত পড়া হবে।

অর্থাৎ, ইলম এবং ফিকহ সম্পর্কে অজ্ঞ কিছু গ্রাম্য বেদুইন মনে করে থাকে যে, সফর এবং নিজ এলাকায় অবস্থান; উভয় অবস্থায় নামাজে কসর করা হবে। তাই তারা নিজ এলাকায়ও নামাজ কসর করে।

উসমান রা. বলেন, তাই যদি তারা আমাকে নামাজ কসর করতে দেখে, তাহলে আমার মাধ্যমে দলিল পেশ করবে।

আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. বললেন, যখন রাসুল ﷺ-এর ওপর ওহি অবতীর্ণ হতো এবং যখন মুসলিমদের সংখ্যা কম ছিল, তখন তিনি এখানে দুই রাকাত নামাজ আদায় করেছেন। আবু বকর রা. এখানে দুই রাকাত আদায় করেছেন। এমনইভাবে উমর রা.-ও দুই রাকাত আদায় করেছেন। এমনকি আপনিও আপনার শাসনামলের শুরুতে এখানে দুই রাকাত নামাজ আদায় করেছেন।

উসমান রা. কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলেন, এটি আমার মত, আমি চিন্তাভাবনা করেই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি।[১১৮]

কথা শেষে আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. উসমান রা.-এর কাছ থেকে চলে যান। এরপর তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার কাছে উসমান রা. এবং তার মধ্যকার আলোচনার কথা ব্যক্ত করেন। তখন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, আমি আমার সঙ্গীদের নিয়ে দুই রাকাত নামাজ পড়েছিলাম। এরপর জানতে পারি যে, তিনি তার সাথিদের

---

১১৮. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/১৭৩; *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, ৩৯/২৫৬

নিয়ে চার রাকাত পড়েছেন। তখন আমিও চার রাকাত পড়েছি। কারণ, বিরোধিতা একটি মন্দ কাজ।

আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. বলেন, তিনি যে চার রাকাত পড়েছেন তা আমি জানতে পেরেছিলাম। তবুও আমি দুই রাকাত আদায় করেছি। এখন আপনি যেমনটি বললেন তাই হবে। অর্থাৎ, আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা.-ও চার রাকাত নামাজ পড়বেন, যেন তাদের মধ্যে কোনো বিরোধ না ঘটে।(১১৯) প্রকৃতপক্ষে এ ঘটনায় সাহাবিগণের গভীর জ্ঞানের প্রমাণ পাওয়া যায়। আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. এবং আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. উভয়েই কসর সম্পর্কে নিজেদের মত সঠিক হওয়া সত্ত্বেও বলেছিলেন, বিরোধিতা একটি মন্দ কাজ।(১২০)

অথচ কিছু মানুষ বলে বেড়ায় যে, আমার উম্মতের মতানৈক্য রহমতস্বরূপ।

তারা মনে করে এটি একটি হাদিস। অথচ এই কথাটির কোনো ভিত্তি নেই;(১২১) বরং কথাটি অনর্থক। কারণ, বিরোধিতা হচ্ছে মন্দ কাজ। এতে কোনো রহমত নেই।

---

১১৯. *আল-কামিল ফিত তারিখ*, ২/৪৭৬; *তারিখুত তবারি*, ৪/২৬৮

১২০. **বিরোধিতা একটি মন্দ কাজ :** এখানে ইবনে মাসউদ রা. বোঝাতে চেয়েছেন, তার মত ও উসমান রা.-এর মত উভয়টি ইজতেহাদসম্মত ও বৈধ। তবুও নিজের ইজতেহাদসম্মত মত ছেড়ে দিয়ে উসমান রা.-এর মত গ্রহণ করেছেন। কারণ, ইজতেহাদের আওতাভুক্ত ক্ষেত্রে খলিফার মত গ্রহণ করা আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে বিপরিত আমল মন্দ ও নিন্দনীয়।-সম্পাদক

১২১. **আমার উম্মতের মতানৈক্য রহমতস্বরূপ :** এ কথাটির উদ্দেশ্য হচ্ছে আমার উম্মতের মুজতাহিদ আলেমগণের মতানৈক্য রহমতস্বরূপ। সূত্র : *আস-সিরাজুল মুনির শারহুল জামিয়িস সগির*, ১/৬৪

এ কথাটি কিছু গ্রন্থে রাসুল ﷺ-এর হাদিস হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু এর কোনো সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাই এটিকে হাদিস বলা যাচ্ছে না। তবে এটি হাদিস না হলেও মনীষীদের বক্তব্য থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন ইমাম মালেক রহ. বলেছেন— «اختلاف العلماء رحمة من الله على هذه الامة»—নিঃসন্দেহে আলেমগণের মতপার্থক্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এ উম্মতের জন্য রহমত। *কাশফুল খফা*, ১/৬৬ (শামেলা)

খুব সম্ভব গ্রন্থকার এখানে বুঝাতে চেয়েছেন যে, সাধারণ ব্যক্তিদের মতানৈক্য একটি গর্হিত কাজ আর মুজতাহিদ আলেমগণের মতানৈক্য রহমত। এজন্য তিনিও একটু পরেই কসর নামাজ বিষয়ে মুজতাহিদ ফকিহগণের মতামত উল্লেখ করেছেন।-সম্পাদক

এই কসরের ব্যাপারে ফকিহগণের মন্তব্য জেনে নেওয়া যাক। শাফেয়ি এবং হাম্বলি মাজহাব অনুযায়ী নামাজ কসর করা এবং পূর্ণ করা উভয়টিই জায়েজ। যদিও কসর করাই উত্তম।

মালেকি মাজহাব অনুযায়ী কসর হচ্ছে সুন্নতে মুয়াক্কাদা। তাদের মতানুযায়ী সফর অবস্থায় নামাজে কসর করা জামাতের সঙ্গে নামাজ আদায় করার সুন্নাহ থেকেও গুরুত্বপূর্ণ।

এর ওপর ভিত্তি করেই তারা বলেন যে, যদি আপনি মুসাফির হন এবং লোকদেরকে জামাতের সঙ্গে নামাজ আদায় করতে দেখেন, তখনও মুকিমদের সঙ্গে জামাতে শরিক হওয়ার চেয়ে একাকী নামাজ কসর করাই আপনার জন্য উত্তম হবে। তবে যদি আপনার মতোই কোনো মুসাফিরকে দেখতে পান তবে তার ইকতেদা করুন। দুজনই দুরাকাত করে নামাজ আদায় করুন।

হানাফি মাজহাব অনুযায়ী সফর অবস্থায় নামাজে কসর করা ওয়াজিব। যদি আপনি চার রাকাত পড়ে ফেলেন, তাহলে নামাজ হয়ে যাবে, কিন্তু এমনটি করার মাধ্যমে আপনি ইচ্ছাকৃতভাবে সুন্নাহর বিরোধিতা করলেন। তাই কেয়ামতের দিন নবীজি ﷺ-এর সুপারিশ থেকে বঞ্চিত হতে পারেন। এমনকি তাদের মত হচ্ছে, যদি আপনি নামাজের প্রথম বৈঠক না করেন, তবে আপনার নামাজ বাতিল হয়ে যাবে।[১২২]

দেখা গেল যে, এখানে ব্যাপারটি ইজতেহাদের। উসমান রা. এ বিষয়ে ইজতেহাদ তথা নিজ থেকে চিন্তা-গবেষণা করেছিলেন। যদিও সফরে কসর করা উত্তম এবং রাসুল ﷺ থেকে এটা প্রমাণিত যে, তিনি কখনো সফরে নামাজ পূর্ণ করেননি। তবে এ বিষয়টি নিয়ে ইজতেহাদের সুযোগ ছিল। এজন্যই অন্যান্য সাহাবিগণ তার বিপরীত জবাব দিয়েও এই ইজতেহাদকে সমর্থন করেছেন। যদি এটি হারাম হতো তাহলে তারা কখনোই এমনটি করতেন না।

উসমান রা. যদি ইজতেহাদে ভুলও করে থাকেন তবুও তিনি একটি সওয়াব পাবেন। কিন্তু সঠিক হয়ে থাকলে পাবেন দুটি সওয়াব। এখানে উসমান রা. নিজের মতের বেশ কিছু ব্যাখ্যাও দিয়েছিলেন। যেমন, মক্কায় তার বৈবাহিক

---

১২২. আর যদি প্রথম বৈঠক করেন তাহলে সাহু সেজদা দিয়ে নিলেই নামাজ আদায় হয়ে যাবে। *হাশিয়াতু ইবনি আবিদিন*, ২/১২৮; (শামেলা)-সম্পাদক

সম্পর্ক থাকা, তায়েফে তার সম্পদ থাকা এবং কসর নিয়ে মানুষের বিভ্রান্তি। অতএব এ ইজতেহাদের কারণে কোনোভাবেই উসমান রা.-কে হত্যা করা বৈধ হয়ে যায় না।

নবম অপবাদের জবাব : উসমান রা. স্বজনপ্রীতি করে মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রা.-কে গভর্নর হিসাবে নিয়োগ দিয়েছেন। কারণ, তিনি ছিলেন উসমান রা.-এর নিকটাত্মীয়।

এটি স্পষ্ট অপবাদ।

মুআবিয়া রা. সম্পর্কে আমরা সিফফিনের যুদ্ধ এবং মুআবিয়া রা.-এর খেলাফতের আলোচনায় এ নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোকপাত করব। তবুও এখানে আমরা মুআবিয়া রা.-এর জীবনের সামান্য একটু আলোচনা উপস্থাপন করছি।

রাসুল ﷺ-এর যুগে মুআবিয়া রা. ছিলেন তার ওপর অবতীর্ণ ওহির অন্যতম লেখক। রাসুল ﷺ এই মহাগুরুত্বপূর্ণ কাজে তার ওপর আস্থা রেখেছিলেন। আবু বকর রা. নিজের খেলাফতকালে তাকে শামে রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানে বের হওয়া সেনাবাহিনীতে তার ভাই ইয়াজিদ ইবনে আবু সুফিয়ান রা.-এর স্থলাভিষিক্ত হিসাবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। উমর রা. আমর ইবনে সাদ রা.-কে বরখাস্ত করে তাকে হোমসের গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। আমর ইবনে সাদ রা. ছিলেন একজন দুনিয়াবিমুখ এবং প্রথমসারির আনসার সাহাবি। তখন লোকেরা বলাবলি করেছিল, সাদকে বরখাস্ত করে মুআবিয়াকে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে!

মুআবিয়া রা. ষষ্ঠ বা অষ্টম হিজরিতে ইসলাম গ্রহণ করেন, যার আলোচনা যথাস্থানে আসবে। উমাইর ইবনে সাদ রা. বলেন, তোমরা মুআবিয়ার ব্যাপারে কেবল উত্তম কথাই আলোচনা করো। আমি রাসুল ﷺ-কে তার ব্যাপারে বলতে শুনেছি, হে আল্লাহ, তাকে হেদায়েতের মাধ্যম বানিয়ে দাও।

ইমাম তিরমিজি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।[১২৩] একই হাদিস উমর রা. থেকেও বর্ণিত হয়েছে।

---

১২৩. *সুনানুত তিরমিজি*, ৩৮৪৩

হোমসের গভর্নর হিসাবে নিয়োগের পর উমর রা. তাকে সমগ্র শাম অঞ্চলের গভর্নরের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। ভয়াবহ আমওয়াস মহামারিতে একের পর এক গভর্নরের ইন্তেকালের পর তাকে এ দায়িত্বে নিয়োগ দেওয়া হয়। আমরা জানি যে, গভর্নর নির্বাচনের ক্ষেত্রে উমর রা. ছিলেন খুবই বিচক্ষণ। তিনি কাউকে বরখাস্ত করার ক্ষেত্রে কোনো দ্বিধাবোধ করতেন না, চাই তিনি যত বড় সাহাবিই হন না কেন। সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা.-এর মতো বড় সাহাবিকেও তিনি বরখাস্ত করেছিলেন। ২৩ হিজরিতে শাহাদাতবরণের পূর্ব পর্যন্ত উমর রা. মুআবিয়া রা.-কে গভর্নর পদে বহাল রেখেছিলেন। উসমান রা.-এর মৃত্যুর পর এবং মুআবিয়া রা.-এর খেলাফতের সময় সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা. বলেছিলেন, উসমান রা.-এর পর আমি এই ঘরের মালিকের চেয়ে অধিক যথাযথ ফয়সালাকারী কাউকে দেখিনি।

এ কথা বলে তিনি মুআবিয়া রা.-এর ঘরের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন।[১২৪]

মুসলিম উম্মাহর অন্যতম বিচক্ষণ ব্যক্তিত্ব আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, আমি মুআবিয়া রা.-এর চেয়ে রাজ্য পরিচালনার অধিক যোগ্য আর কাউকে দেখিনি।[১২৫]

মুআবিয়া রা. ছিলেন একজন ন্যায়পরায়ণ, প্রাজ্ঞ এবং সহনশীল ব্যক্তি। নিজ রাজত্বের প্রতিরক্ষায় তিনি ছিলেন উত্তম ব্যবস্থাপক। মুসলিমদের সীমানার বাইরে গিয়ে ইসলাম প্রচারে তার ছিল উল্লেখযোগ্য অবদান। এ ক্ষেত্রে তিনি সর্বদা আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। তিনি ছিলেন একজন প্রথম শ্রেণির মুজাহিদ। তার হাত ধরে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে প্রবেশ করেছেন অনেক অনেক লোক; বরং অনেক জাতি।

প্রজাদের সঙ্গেও তার আচরণ ছিল উত্তম। প্রজারাও তাকে অনেক ভালোবাসত। ইমাম মুসলিম রহ.-সহ অনেক মুহাদ্দিস, আউফ ইবনে মালেক আশজায়ি রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আমি রাসুল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের মধ্যে উত্তম নেতা হচ্ছে যাদের তোমরা ভালোবাসো এবং তারাও তোমাদের ভালোবাসে। যাদের জন্য তোমরা দোয়া করো এবং তারাও তোমাদের জন্য দোয়া করে। আর নিকৃষ্ট নেতা হচ্ছে যাদের তোমরা

---

১২৪. *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, ৫৯/১৬১; *তারিখুল ইসলাম*, ৪/১৬২; *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ৩/১৫০; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৮/১৪২

১২৫. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৮/১৪৩

ঘৃণা করো এবং তারাও তোমাদের ঘৃণা করে। যাদের তোমরা অভিসম্পাত করো এবং তারাও তোমাদের অভিসম্পাত করে।[১২৬]

যখন প্রজা শাসককে ভালোবাসবে এবং শাসকও প্রজাদের ভালোবাসবে, সেই শাসক হবে উত্তম শাসক। কিন্তু যদি কোনো শাসককে প্রজারা ঘৃণা করে সে হবে নিকৃষ্ট। রাসুল ﷺ এই মানদণ্ড প্রণয়ন করে গিয়েছেন।

এখানে মুআবিয়া রা. সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব নয়। তা যথাস্থানে আলোচনা করা হবে। তবে এখানে যে গুরুত্বপূর্ণ কথাটি উল্লেখ করতে চাই তা হচ্ছে, উসমান রা.-ই প্রথম ব্যক্তি নন, যিনি মুআবিয়া রা.-কে গভর্নর হিসাবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। ইতিপূর্বে উসমান রা.-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিও তাকে গভর্নর হিসাবে নিয়োগ দিয়েছিলেন।

দশম অপবাদের জবাব : উসমান রা. তার নিকটাত্মীয় আবদুল্লাহ ইবনে আমের ইবনে কুরাইজ রা.-কে স্বজনপ্রীতি করে বসরার গভর্নর হিসাবে নিয়োগ দিয়েছিলেন।

এটিও তার ওপর একটি অপবাদ।

আবদুল্লাহ ইবনে আমের রা. ছিলেন পিতার দিক দিয়ে বনু উমাইয়া এবং মায়ের দিক দিয়ে বনু হাশেম বংশোদ্ভূত। তার দাদির মা ছিলেন রাসুল ﷺ-এর ফুফু। তিনি যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন তাকে রাসুল ﷺ-এর কাছে নিয়ে আসা হয়। তাকে দেখে নবীজি রাসুল ﷺ বলেছিলেন, এ তো দেখছি তোমাদের চেয়ে আমাদের সঙ্গে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ।

এরপর নবীজি ﷺ তার মুখে লালা দিলে আবদুল্লাহ ইবনে আমের রা. সেই লালা গিলতে শুরু করেন। রাসুল ﷺ তখন বলেন, আমি আশা করি সে হবে মানুষের পানি লাভের মাধ্যম।[১২৭]

তিনি যেখানেই পা ফেলতেন সেখানেই পানির ক্ষেত্র দেখা যেত। ইমাম ইবনে হাজার আসকালানি রহ. *আল-ইসাবা* গ্রন্থে এ কথা উল্লেখ করেছেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আমের রা.-কে ইসলামের প্রসিদ্ধ বিজেতাদের একজন গণ্য করা হয়। তার হাতেই পুরো খোরাসান অঞ্চল, পারস্য ও সিজিস্তানের

---

১২৬. *সহিহ মুসলিম*, ১৮৫৫; *সুনানুদ দারিমি*, ২৮৩৯

১২৭. *আল-মুসতাদরাক লিল হাকিম*, ৩/৭৪১; *আল-ইসতিয়াব*, ৩/৯৩২; *আল-ইসাবা*, ৫/14

একাংশ জয় হয়েছিল। কিরমান[১২৮] অঞ্চল চুক্তি ভঙ্গ করার পর তিনি পুনরায় সে অঞ্চল জয় করেন। পারসিক অগ্নিপূজারিরা তাদের রাজত্ব পুনরুদ্ধারের যে স্বপ্ন দেখছিল, তার এই বিজয়ের মধ্য দিয়ে সেই স্বপ্নের প্রদীপ একেবারেই নিভে যায়। এ কারণেই তার প্রতি পারসিকদের হৃদয়ে ছিল প্রবল বিদ্বেষ। শিয়ারা যখন সেই অঞ্চলে গমন করে তখন তারা আবদুল্লাহ ইবনে আমের রা.-সহ যেসব সাহাবি পারসিকদের রাজত্ব ধসিয়ে দিয়েছিলেন, তাদের নামে নিন্দাচার শুরু করে। যখন তিনি গভর্নর হিসাবে নিয়োগ পান, তখন তার বয়স ২৫-ও পেরোয়নি। *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* গ্রন্থে ইমাম ইবনে কাসির রহ. তার সম্পর্কে বলেন, তিনিই প্রথম আরাফায় বায়তুল্লাহর হাজিগণের জন্য হাউজের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং হাউজগুলোতে পানি প্রবাহের ব্যবস্থা করেছিলেন।

মিনহাজুস সুন্নাহ গ্রন্থে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. তার সম্পর্কে বলেন, তার অনেক প্রশংসনীয় অবদান রয়েছে, লোকদের অন্তরে তার জন্য যে ভালোবাসা ছিল তা অস্বীকার করার সুযোগ নেই।[১২৯]

একাদশ অপবাদের জবাব : তিনি স্বজনপ্রীতি করে তার নিকটাত্মীয় মারওয়ান ইবনে হাকামকে গভর্নর হিসাবে নিয়োগ দিয়েছেন।

বাস্তবতা হচ্ছে, মারওয়ান ইবনে হাকামকে গভর্নর হিসাবে কখনো নিয়োগ দেওয়া হয়নি। উসমান রা. অনেক বিষয়ে তার কাছে পরামর্শ চাইতেন এবং তাকে কাছে রাখতেন। সাম্রাজ্যের কোনো অঞ্চলের গভর্নরের দায়িত্ব তাকে দেওয়া হয়নি। কাজি ইবনে আরাবি রহ. *আল-আওয়াসিম মিনাল কাওয়াসিম* গ্রন্থে বলেন, মারওয়ান ইবনে হাকাম ছিলেন একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি। সাহাবি, তাবেয়ি ও ফকিহগণের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র।

সাহাবিগণের মধ্যে অনেকেই তার কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। যেমন সাহল ইবনে সাদ আনসারি রা. তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, যা *সহিহ বুখারি*-তে উল্লেখ করা হয়েছে। যাইনুল আবিদিন আলি ইবনে হুসাইন ইবনে আলি ইবনে আবু তালেব রহ.-ও তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। যেহেতু যাইনুল আবিদিন মারওয়ান ইবনে হাকামের হাদিসকে নির্ভরযোগ্য বিবেচনা করেছেন, সেহেতু এটিই হতে পারে শিয়াদের বিপক্ষে অন্যতম শক্তিশালী

১২৮. কিরমান : বর্তমান ইরানের একটি শহর।-সম্পাদক

১২৯. *মিনহাজুস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যা*, ৬/২৪৮

দলিল। কারণ, যাইনুল আবিদিন রহ. শিয়াদের চতুর্থ ইমাম হিসাবে গণ্য। তাদের কাছে তিনি নিষ্পাপ। তাবেয়িগণের ইমাম সাইদ ইবনে মুসাইয়িব রহ., বড়মাপের তাবেয়ি ইমাম উরওয়া ইবনে যুবায়ের রহ. ও ইরাক ইবনে মালেক রহ. প্রমুখ বিশিষ্ট তাবেয়িগণ-সহ আরও অনেকেই মারওয়ান ইবনে হাকামের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। কেউ যদি এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিত জানতে চান, তাহলে ইহসান ইলাহি জহির রচিত *আশ-শিয়াতু ওয়াত তাশাইয়ু* গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে পারেন।

জঙ্গে জামালের ঘটনায় মারওয়ান ইবনে হাকাম বন্দি হলে আলি রা. ও তার অনুসারীরা তাকে কোনো কষ্ট দেননি। মুসলিম সমাজে তার অবস্থান বিবেচনা করেই তিনি এমনটি করেছিলেন। হাসান রা. এবং হুসাইন রা. উভয়েই তাদের পিতার কাছে সুপারিশ করেছিলেন মারওয়ানকে মুক্ত করে দেওয়ার জন্য। হ্যাঁ, এমনটিই ঘটেছিল। শিয়াদের দৃষ্টিতে হাসান রা. ও হুসাইন রা. নিষ্পাপ, তাহলে তো তাদের পিতার অবস্থান নিয়ে কোনো প্রশ্নই আসতে পারে না। সত্য তো সেটাই যে ব্যাপারে শত্রুও সাক্ষ্য দেয়।

এখন এ বিষয়ে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন থেকে যায়—

এক. বনু উমাইয়া গোত্রের কাউকে গভর্নর নিয়োগে ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো সমস্যা আছে কি?

দুই. উসমান রা.-কর্তৃক নিযুক্ত গভর্নরদের অধিকাংশই কি তার নিকটাত্মীয় ছিলেন?

তিন. নিকটাত্মীয়দের দায়িত্ব প্রদান করা ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে হালাল না হারাম?

১ম প্রশ্নের উত্তর : বনু উমাইয়া ছিল সে সময়কার আরব গোত্রগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ একটি গোত্র। তাদের মধ্যে ছিল অনেক বিজ্ঞ এবং নেতৃস্থানীয় লোকের উপস্থিতি। তাদের ছিল সম্মান ও আভিজাত্য। রাসুল ﷺ নিজেও বহু কাজে তাদের দায়িত্ব দিয়েছেন। আমরা দেখতে পাই যে, রাসুল ﷺ-এর জীবদ্দশায় মক্কা বিজয়ের পর বনু উমাইয়া গোত্রের আত্তাব ইবনে আসিদ রা.-কে সেখানকার গভর্নর নিয়োগ করা হয়েছিল। তখন তার বয়স ২০-ও পেরোয়নি। কিন্তু রাসুল ﷺ তাকেই নিয়োগ দিয়েছিলেন পৃথিবীর সর্বোত্তম শহর মক্কার গভর্নর হিসাবে। এমনইভাবে রাসুল ﷺ নাজরানে নিয়োগ

দিয়েছিলেন বনু উমাইয়া গোত্রের আবু সুফিয়ান ইবনে হারব রা.-কে। সানআ, ইয়ামেন এবং বনু মাজহিজ গোত্রের সদকা সংগ্রহের দায়িত্ব দিয়েছিলেন খালিদ ইবনে সাইদ ইবনুল আস উমাবি রা.-কে। তাইমা, খাইবার এবং উরাইনা জনপদে নিয়োগ দিয়েছিলেন উসমান ইবনে সাইদ ইবনুল আস উমাবি রা.-কে। বাহরাইনে নিয়োগ দিয়েছিলেন আবান ইবনে সাইদ ইবনুল আস রা.-কে। এর আগে এ দায়িত্ব দিয়েছিলেন আলা ইবনে হাদরামি রা.-কে। আলা ইবনে হাদরামি রা.-ও ছিলেন বনু উমাইয়ার মিত্র। রাসুল ﷺ-এর পর আবু বকর সিদ্দিক রা. এবং উমর রা. উভয়েই উপরিউক্ত ব্যক্তিদের মাধ্যমে কাজ নিয়েছেন। উমর রা. তাদের সঙ্গে ইয়াজিদ ইবনে আবু সুফিয়ান রা. এবং মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রা.-কে যোগ করেছেন। এমনইভাবে আবু বকর রা.-ও শামের দিকে প্রেরিত মুসলিম বাহিনীর এক-চতুর্থাংশের নেতৃত্বের জন্য ইয়াজিদ ইবনে আবু সুফিয়ান রা.-এর ওপর আস্থা রেখেছেন।

তাই ইতিহাসের পাতায় বনু উমাইয়ার শ্রেষ্ঠত্ব এবং অবদান অনস্বীকার্য। তারা ইসলামি সাম্রাজ্যের ভিত মজবুত করেছে এবং বহু অঞ্চলে ইসলামের বাণী প্রচার করেছে। যথাস্থানে এই আলোচনা আসবে।

২য় প্রশ্নের উত্তর : উসমান রা.-এর খেলাফতকালে, নির্দিষ্ট করে যখন ফিতনার মূলহোতারা উসমান রা.-কে অপসারণ করতে চেয়েছিল, তখন ইসলামি সাম্রাজ্যের উচ্চপদে যারা আসীন ছিলেন তাদের তালিকা নিম্নরূপ—

বিচারকের দায়িত্বে ছিলেন যায়দ ইবনে সাবেত আনসারি রা. বায়তুল মাল তথা রাষ্ট্রীয় কোষাগারের দায়িত্বে ছিলেন উকবা ইবনে আমের জুহানি রা., হজের আমির ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস হাশেমি রা., খারাজের[১৩০] দায়িত্বে ছিলেন জাবের ইবনে ফুলান মুজানি রা. ও সিমাক আনসারি (আবু দুজানা) রা., সামরিক বিষয়াদির দায়িত্বে ছিলেন কাকা ইবনে আমর তামিমি রা. এবং পুলিশ বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন বনু তাইম গোত্রের আবদুল্লাহ ইবনে কুনফুজ।

খেলাফতের উল্লেখিত এই ছয় উচ্চপদে বনু উমাইয়ার কেউ ছিলেন না।

এ ছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলে উসমান রা. কর্তৃক নিযুক্ত গভর্নরগণ হলেন,

---

১৩০. **খারাজ :** অমুসলিমদের ওপর ধার্যকৃত ভূমিকরকে খারাজ বলা হয়।-সম্পাদক

- **ইয়ামেন :** ইয়ালা ইবনে উমাইয়া তামিমি রা.
- **মক্কা :** আবদুল্লাহ ইবনে আমর হাদরামি রা.
- **হামাদান :** জারির ইবনে আবদিল্লাহ বাজালি রা.
- **তায়েফ :** কাসিম ইবনে রবিআ সাকাফি
- **কুফা :** আবু মুসা আশআরি রা.
- **বসরা :** আবদুল্লাহ ইবনে আমের ইবনে কুরাইজ রা.
- **মিশর :** আবদুল্লাহ ইবনে সাদ ইবনে আবু সারহ রা.
- **শাম :** মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রা.
- **হোমস :** আবদুর রহমান ইবনে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ মাখযুমি রা.
- **কিননাসরিন :**[১৩১] হাবিব ইবনে মাসলামা কুরাশি হাশেমি রা.
- **জর্ডান :** আবুল আওয়ার সুলামি রা.
- **ফিলিস্তিন :** আলাকামা ইবনে হাকাম কিনানি
- **ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল :** আবদুল্লাহ ইবনে কায়স ফাজারি
- **আজারবাইজান :** আশআস ইবনে কায়স কিন্দি
- **পারস্যের হুলওয়ান :** উতাইবা ইবনুন-নাহহাস ইজলি রা.
- **পারস্যের মধ্যভাগে অবস্থিত ইস্পাহান :** সায়িব ইবনে আকরা সাকাফি রা.

এসব গভর্নরদের মধ্যে উসমান রা.-এর নিকটাত্মীয় কেবল দুজনকেই দেখতে পাই। তারা হলেন আবদুল্লাহ ইবনে আমের ইবনে কুরাইজ রা. এবং মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রা.।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, মারওয়ান ইবনে হাকাম রা.-কে গভর্নর পদে নিয়োগ দেওয়া হয়নি। এদিকে ওয়ালিদ ইবনে উকবা রা., যিনি মায়ের দিক দিয়ে উসমান রা.-এর আত্মীয় ছিলেন, তবে বনু উমাইয়া গোত্রের ছিলেন না। তাকে এই ফিতনার সময়ে বরখাস্ত করা হয়েছিল। তার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা যথাস্থানে আসবে।

---

১৩১. **কিননাসরিন :** বর্তমান সিরিয়ার আলেপ্পোতে অবস্থিত একটি বিলুপ্ত ঐতিহাসিক অঞ্চল।-অনুবাদক

বনু উমাইয়ার আভিজাত্য, মর্যাদা এবং প্রশাসনিক পদের যোগ্যতাসত্ত্বেও আমরা তাদের মধ্য থেকে কেবল দুজনকেই প্রশাসনিক পদে দেখতে পেয়েছি। যা শিয়াদের আরোপিত এই অভিযোগকে সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণিত করে।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর : নিকটাত্মীয় যদি যোগ্য হয় তাহলে তাদের নিয়োগ দেওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে শরিয়তের কোনো দলিল-প্রমাণ নেই। যে শিয়ারা এ নিয়ে উসমান রা.-কে অভিযুক্ত করে তাদের উদ্দেশে আমরা বলব, যদি আমরা আলি রা.-এর খেলাফতকালীন গভর্নরদের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাই যে, প্রথমে ইয়ামেনে এবং পরবর্তী সময় বসরায় গভর্নর হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-কে। যিনি ছিলেন আলি রা.-এর চাচাতো ভাই। মক্কার গভর্নর ছিলেন কুসাম ইবনে আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব রা., তিনিও ছিলেন আলি রা.-এর চাচাতো ভাই। মিশরের গভর্নর ছিলেন মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর রা. (তিনি ছিলেন আলি রা.-এর ঘরে প্রতিপালিত এবং তার স্ত্রীর পুত্র। যে স্ত্রী প্রথমে আবু বকর রা.-এর বিবাহ বন্ধনে ছিলেন। আবু বকর রা.-এর মৃত্যুর পর আলি রা.-এর সঙ্গে তার বিয়ে হয়)।

খোরাসানের গভর্নর ছিলেন জাদ ইবনে হুবাইরা রা.। তিনি ছিলেন আলি রা.-এর জামাতা এবং ভাগ্নে। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে মদিনা মুনাওয়ারার গভর্নর হিসাবে ছিলেন তামাম ইবনে আব্বাস রা. এবং সাহল ইবনে হুনাইফ রা., সামরিক বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন আলি রা.-এর পুত্র মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়্যা রহ.। তাকে ইবনে হানাফিয়্যা বলার কারণ হলো, তার মা ছিলেন ইয়ামামার যুদ্ধে বন্দি হওয়া বনু হানাফিয়্যা গোত্রের। তার সময়ে ৩৬ হিজরিতে হজের দায়িত্বে ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা., ৩৭ হিজরিতে কুসাম ইবনে আব্বাস রা. এবং ৩৮ হিজরিতে উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.।

এসব ব্যক্তিদের দায়িত্ব দেওয়ার কারণে আলি রা.-এর ওপর অভিযোগ উত্থাপন করা হয় না। কারণ, তারা সকলেই ছিলেন দায়িত্বের উপযুক্ত। পাশাপাশি তারা ছিলেন মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব এবং দায়িত্ব গ্রহণের যোগ্য। কিন্তু আলি রা. মুসলিম উম্মাহর কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য করে যে কাজ করে গিয়েছেন, সেই একই কাজকে কেন্দ্র করে শিয়ারা উসমান রা.-এর ওপর

অপবাদ আরোপ করার ঘৃণ্য অপচেষ্টা চালায়। অথচ শিয়ারা এই ধারণাও পোষণ করে যে, আলি রা. তার মৃত্যু-পরবর্তী সময়ে হাসান রা.-এর জন্য, তারপর হুসাইন রা., এরপর হুসাইন রা.-এর ছেলের জন্য, এভাবে আরও অনেকের জন্য খেলাফতের অসিয়ত করে গিয়েছেন। তাদের কথিত এই মিথ্যা অসিয়ত স্বজনপ্রীতি থেকেও গুরুতর।

সুতরাং বোঝা গেল, একজন আমিরুল মুমিনিন মুসলিম উম্মাহর কল্যাণের প্রতি লক্ষ রেখে চিন্তাভাবনা করে প্রশাসনিক দায়িত্ব প্রদান করে থাকেন। চাই দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিকটাত্মীয় হোক বা না হোক। বরং মুসলিম উম্মাহর কল্যাণের লক্ষ্যে অথবা বিশৃঙ্খলা দমনে অপেক্ষাকৃত মর্যাদাবান লোককে বরখাস্ত করে তার তুলনায় কম মর্যাদার লোককে নিয়োগ দেওয়ার অধিকারও আমিরুল মুমিনিনের রয়েছে। যেমন, উমর রা. বরখাস্ত করেছিলেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ১০জন সাহাবির একজন এবং রাসুল ﷺ-এর সম্মানিত মামা সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা.-কে। তিনি একমাত্র সাহাবি যার ওপর নবীজি ﷺ তাঁর মাতাপিতাকে উৎসর্গ করেছিলেন। তাকে বরখাস্ত করে উমর রা. নিয়োগ দিয়েছিলেন তার তুলনায় কম মর্যাদার আবদুল্লাহ ইবনে উতবান রা.-কে, এরপর যিয়াদ ইবনে হানজালা রা.-কে, এরপর আম্মার ইবনে ইয়াসির রা.-কে। উমর রা.-এর এই সিদ্ধান্তে কেউই অসন্তুষ্ট হননি।

আলি রা. নিজেও যিয়াদ ইবনে আবু সুফিয়ান রহ., আশতার নাখায়ি এবং মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর রা. প্রমুখকে গভর্নর হিসাবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে তাদের তুলনায় মুআবিয়া রা. ছিলেন অধিক মর্যাদাবান। তা সত্ত্বেও নিজের চিন্তা এবং মত অনুযায়ী আলি রা. তাদের নিয়োগ দিয়েছিলেন।

দ্বাদশ অপবাদের জবাব : শিয়াদের দাবি হলো, উসমান রা. ওয়ালিদ ইবনে উকবা রা.-কে ফাসেক হওয়া সত্ত্বেও কুফার গভর্নর নিয়োগ দিয়েছিলেন।

এর জবাবে কাজি ইবনুল আরাবি *আল-আওয়াসিম মিনাল কাওয়াসিম* গ্রন্থে বলেন, যারা ওয়ালিদ ইবনে উকবা রা.-কে ফাসেক বলবে তারা নিজেরাই ফাসেক।[১৩২] আবু বকর রা. তার খেলাফতকালে তাকে মিজারের যুদ্ধ চলাকালীন খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা.-এর সঙ্গে পত্র আদান-প্রদানের জন্য বিশ্বস্ত দূত বানিয়েছিলেন। পারসিক বাহিনী এবং মুসলিম বাহিনীর মধ্যকার

---

১৩২. *আল-আওয়াসিম মিনাল কাওয়াসিম*, ৮৯

এ যুদ্ধের ব্যাপারে সেসব চিঠিতে ছিল অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং নির্দেশনা, যা পারসিকদের হস্তগত হলে মুসলিমদের জন্য খুব বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াত। আবু বকর রা.-এর খেলাফতকালেই দুমাতুল জান্দাল যুদ্ধে তাকে সাহায্যকারী বাহিনীর আমির বানিয়ে ইয়াজ ইবনে গানম রা.-এর সাহায্যে প্রেরণ করা হয়েছিল। ১৩ হিজরিতে আবু বকর রা. তাকে সদকা সংগ্রহের দায়িত্বে নিয়োগ দেন। তিনিই আবু বকর রা.-কে সদকা সংগ্রহ করে দিতেন। দায়িত্বশীল নিয়োগের ক্ষেত্রে আবু বকর রা. ছিলেন খুব সতর্ক ও বিচক্ষণ।

উমর ইবনুল খাত্তাব রা. ওয়ালিদ ইবনে উকবা রা.-কে বনু তাগলিব, বনু তানুখ, বনু রবিয়া এবং আরব উপদ্বীপের গোত্রসমূহের প্রতিরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত করেন। তিনি অত্যন্ত উত্তমরূপে এ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ওই অঞ্চলে বিদ্যমান খ্রিষ্টান গোত্রগুলোর মধ্যে ইসলাম প্রচার করতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু ওই সকল খ্রিষ্টান গোত্র এসে উমর রা.-এর কাছে অভিযোগ করে যে, ওয়ালিদ ইবনে উকবা রা. তাদের গোত্রের যুবক এবং শিশুদের ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করছেন। এ ছিল স্পষ্ট অপবাদ। তিনি ছিলেন একজন উত্তম চরিত্রের তরুণ মুজাহিদ এবং আল্লাহর রাস্তায় একজন নিবেদিত দাঈ।

উসমান রা.-এর খেলাফতকালে তাকে কুফার গভর্নর হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়। পুরো পাঁচ বছর তিনি গভর্নর পদে বহাল ছিলেন। কুফার জনগণ তাকে ভালোবাসত। তিনিও তাদের ভালোবাসতেন। আতিথেয়তায় তিনি ছিলেন অনন্য। যারাই তার বাড়িতে আসত তিনি তাদের জন্য উত্তম আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতেন। তার সময়ে কুফার মানুষ বেশ সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে ছিল। পারস্য অঞ্চলে বেশ কিছু বিজয় অভিযানে তিনি ছিলেন কাণ্ডারির ভূমিকায়। আল্লাহ তাআলার পথে কারও তিরস্কারের তিনি পরোয়া করতেন না।

তাহলে শিয়ারা কেন তাকে অপবাদ দিলো এবং ফাসেক হিসাবে আখ্যায়িত করল?

তারা প্রথমত এই আয়াতের মাধ্যমে দলিল দিয়ে থাকে—

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ

فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾

হে মুমিনগণ, যদি কোনো পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তোমরা যাচাই করে দেখবে। যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোনো সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে না বসো। ফলে নিজেদের কৃতকর্মের কারণে তোমাদেরকে অনুতপ্ত হতে হয়।

[সুরা হুজুরাত : ০৬]

শিয়াদের দাবি অনুযায়ী রাসুল ﷺ ওয়ালিদ ইবনে উকবা রা.-কে বনু মুসতালিকের সদকা সংগ্রহের জন্য পাঠিয়েছিলেন। বনু মুসতালিকের কাছে যখন তার আগমন সংবাদ পৌঁছল তখন তারা আনন্দিত হয় এবং রাসুল ﷺ-এর দূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য বেরিয়ে আসে। এ দেখে ওয়ালিদ ইবনে উকবা রা. এই ধারণা করেন যে, বনু মুসতালিক তাকে হত্যা করার জন্য আসছে। তাই তিনি সদকা না নিয়েই ফিরে আসেন। এসে বলেন, হে আল্লাহর রাসুল, বনু মুসতালিক সদকা প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

এ কথা শুনে রাসুল ﷺ অত্যন্ত রাগান্বিত হন। তিনি যখন নিজের ব্যাপারে বলছিলেন, তখনই বনু মুসতালিকের প্রতিনিধি দল এসে পৌঁছে। তারা এসে বলে, আমরা জানতে পেরেছি যে, আপনার দূত মাঝপথ থেকেই ফিরে এসেছে। আমরা আশঙ্কা করছি যে, আপনার পক্ষ থেকে প্রেরিত দূত ফিরে আসায় আপনি খুবই রাগান্বিত হবেন। নিশ্চয় আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে তাঁর এবং তাঁর রাসুলের ক্রোধ থেকে আশ্রয় চাই। তখনই আল্লাহ তাআলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন।

এই আয়াত ওয়ালিদ ইবনে উকবা রা. সম্পর্কে অবতীর্ণ হওয়ার স্বপক্ষে রাসুল ﷺ থেকে সরাসরি কোনো সহিহ হাদিস পাওয়া যায় না। নেই কোনো মুত্তাসিল হাদিসও[১৩৩]। ওয়ালিদ ইবনে উকবা রা. ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন মক্কা বিজয়ের বছর অষ্টম হিজরিতে। তখন তিনি ছিলেন ছোট্ট বালক। তাহলে তার মতো কাউকে রাসুল ﷺ এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য কীভাবে প্রেরণ করতে পারেন? সুতরাং, এটা স্পষ্ট যে, তিনি তখন ছোট ছিলেন। এর মাধ্যমে এটিও প্রমাণ হয়ে গেল যে, আবু বকর রা. এবং উমর রা.-এর সময়ে গভর্নর থাকাকালীন তার বয়স ছিল ২০ বছরেরও কম। তারা দুজনই ওয়ালিদ ইবনে উকবা রা.-এর প্রতি খুবই আস্থাশীল ছিলেন। কুরআন যদি

---

১৩৩. মুত্তাসিল হাদিস : অবিচ্ছিন্ন সূত্র পরম্পরায় বর্ণিত হাদিস।-সম্পাদক

তাকে ফাসেক বলে থাকে, তাহলে এ দুজন ব্যক্তি কখনোই তার ওপর আস্থা রাখতেন না। এটি অসম্ভব ব্যাপার।

তা ছাড়া শিয়ারা তার ব্যাপারে মদ পান করার অপবাদও আরোপ করেছে। তাকে এই অপবাদের লক্ষ্য বানানোর কারণ ছিল, তিনি আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে কাউকে পরোয়া করতেন না। কুফার অধিবাসীদের মধ্যে যারা হদের উপযুক্ত অপরাধ করেছিল, তাদের ওপর হদ প্রয়োগে তিনি কোনো চিন্তাভাবনা করেননি। এমনইভাবে তিনি এক ব্যক্তিকে হত্যার অপরাধে তিনজনকে হত্যার দণ্ড প্রয়োগ করেছিলেন। এ হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে একজন সাহাবি এবং ওয়ালিদ ইবনে উকবা রা.-এর পুত্র সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। এতে হত্যার সাজাপ্রাপ্ত ওই তিন খুনির পিতারা রাগে ফুঁসে ওঠে।

তারা ছিল কুফার প্রসিদ্ধ দুষ্ট লোক। এদের একজনের ওপর উসমান রা. একবার খুব রেগে গিয়েছিলেন এবং তাকে মদিনা থেকে বিতাড়িত করে দিয়েছিলেন। এরপর সে কুফায় এসে বাস করতে থাকে। তাকে বিতাড়িত করার কারণ ছিল, সে এক মহিলার ইদ্দতের[১৩৪] সময় শেষ হওয়ার পূর্বেই তাকে বিয়ে করেছিল। সেই তিন পাপিষ্ঠ ব্যক্তি উসমান রা.-এর কাছে গিয়ে ওয়ালিদ ইবনে উকবা রা.-এর বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগ করে। তার ব্যাপারে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে বলে যে, তারা তাকে মদ পান করতে দেখেছে। উসমান রা. তাকে ডেকে পাঠান। তিনি এসে উপস্থিত হলে উসমান রা. বলেন, তারা সাক্ষ্য দিচ্ছে, তোমাকে তারা মদ পান করে মাতাল হয়ে বমি করতে দেখেছে।

তখন ওয়ালিদ রা. শপথ করে বলেন, তিনি এমনটি করেননি। তখন উসমান রা. বলেন, আমি হদ প্রয়োগ করব। যদি তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে থাকে তাদের প্রত্যাবর্তনস্থল হবে জাহান্নাম।

তিনি মায়ের দিক দিয়ে উসমান রা.-এর নিকটাত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও তার ওপর হদ প্রয়োগ করেন। বর্ণিত আছে, আলি রা. তাকে বেত্রাঘাত করেন। এরপর উসমান রা. তাকে বরখাস্ত করেন।

---

১৩৪. **ইদ্দত :** কোনো মহিলা তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার পর বা স্বামী মারা যাওয়ার পর নির্ধারিত কিছু নিয়ম মেনে নির্দিষ্ট সময় পার করাকে বুঝায়, যা ক্ষেত্রভেদে তিন মাসিক, তিন মাস, সন্তান প্রসব ও চার মাস ১০ দিন পর্যন্ত দীর্ঘ হয়ে থাকে।-সম্পাদক

যদি ধরেও নেওয়া হয়, তার কাছ থেকে এই গুনাহ সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু কোনো গুনাহ একজন ব্যক্তির ন্যায়পরায়ণতা এবং গ্রহণযোগ্যতাকে তখনই রহিত করে, যখন সেই ব্যক্তি গুনাহ থেকে তওবা না করে। উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বিশিষ্ট সাহাবি কুদামা ইবনে মাজউন রা.-কে হদ প্রয়োগ করেছিলেন। তিনি ছিলেন ওই সব সাহাবিগণের একজন, যারা দুই হিজরত করেছিলেন। অংশগ্রহণ করেছিলেন বদর যুদ্ধেও। তিনি যখন মদ পান করেন তখন উমর রা. তার ওপর হদ প্রয়োগ করেন। এতে তার মর্যাদা কমে যায়নি। কারণ, তিনি এই গুনাহ থেকে তওবা করে নিয়েছিলেন।

এই হলো ওয়ালিদ ইবনে উকবা রা.-এর বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগের স্বরূপ। যিনি ছিলেন মহান মুজাহিদ এবং ইসলামের বিজয়ে যার রয়েছে অসামান্য অবদান।

ত্রয়োদশ অপবাদের জবাব : উসমান রা.-এর ওপর আরেকটি অপবাদ হলো, তিনি মারওয়ান ইবনে হাকামকে আফ্রিকা থেকে অর্জিত গনিমতের (যুদ্ধলব্ধ সম্পদের) পাঁচ ভাগের এক ভাগ প্রদান করেছিলেন।

প্রথমত, এই বর্ণনার কোনো সূত্র নেই। এই বর্ণনার সমর্থনে কোনো সহিহ বর্ণনা পাওয়া যায় না। যদি আমরা ওপরের এই তথ্য প্রদানকারী বর্ণনাগুলো অধ্যয়ন করি, তবে দেখতে পাব যে, এগুলোর মূলে ঘুরেফিরে পূর্বোল্লেখিত সেই চারজনের কোনো একজনকে পাওয়া যাবে। হয়তো ওয়াকিদি, নতুবা মুহাম্মাদ ইবনে হিশাম কালবি, নয়তো আবু মিখনাফ লুত ইবনে ইয়াহইয়া। এদের কেউ না কেউ সূত্রে থাকবেই। আমরা জানি যে, এদের সবাই ছিল শিয়া। রাসুল ﷺ-এর নামে হাদিস জাল করা এবং সাহাবিগণের নামে মিথ্যারোপ করার ব্যাপারে এরা ছিল সিদ্ধহস্ত।

সঠিক কথা হচ্ছে, উসমান রা. এক-পঞ্চমাংশের এক-পঞ্চমাংশ দিয়েছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে সাদ ইবনে আবু সারহ রা.-কে। উসমান রা. তাকে বলেছিলেন, তিনি যদি আফ্রিকা জয়ে সাহসিকতাপূর্ণ অবদান রাখেন, তবে তাকে গনিমতের এক-পঞ্চমাংশের এক-পঞ্চমাংশ দান করবেন। এ কথা বলে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে সাদ ইবনে আবু সারহ রা.-কে উৎসাহ প্রদান করেছিলেন। এরপর আবদুল্লাহ ইবনে সাদ ইবনে আবু সারহ রা. সত্যিই আফ্রিকা জয় করেন এবং উসমান রা. পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাকে গনিমতের এক-পঞ্চমাংশের এক-পঞ্চমাংশ দান করেন। এরপর আবদুল্লাহ

ইবনে সাদ ইবনে আবু সারহ রা.-এর অধীনে থাকা কিছু সৈন্য উসমান রা.-এর কাছে অভিযোগ করে যে, আবদুল্লাহ ইবনে সাদ ইবনে আবু সারহ রা. গনিমতের এক-পঞ্চমাংশ দখল করেছেন।

তখন উসমান রা. বলেন, আমিই তাকে এমনটি করার নির্দেশ দিয়েছি।

আগত লোকেরা বললেন, এতে আমরা খুবই ক্রুদ্ধ হয়েছি।

উসমান রা. বলেন, যদি তিনি রাজি হন তবে আমি তাকে ফিরিয়ে দিতে বলব।

উসমান রা. আবদুল্লাহ ইবনে সাদ ইবনে আবু সারহ রা.-কে ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বললে তিনি সেই এক-পঞ্চমাংশের এক-পঞ্চমাংশ ফিরিয়ে দেন।[১৩৫] যদিও শরিয়ত অনুযায়ী তার জন্য এটা গ্রহণ করা বৈধ ছিল এবং উসমান রা.-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি অর্থাৎ রাসুল ﷺ, আবু বকর রা. এবং উমর রা.-ও এমনটি করেছিলেন। তারা কারও কারও জন্য জায়গির নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। কাউকে দিয়েছিলেন বিশাল কোনো পুরস্কার। এভাবে তারা লোকদের উৎসাহ প্রদান করতেন। ইসলামের প্রতি তাদের হৃদয়কে আকৃষ্ট করতেন। উত্তম কাজের পুরস্কার প্রদান করতেন। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. তার *আল-খারাজ* গ্রন্থে এমন অনেক উদাহরণ উল্লেখ করেছেন।

চতুর্দশ অপবাদের জবাব : উসমান রা.-এর ব্যাপারে অপবাদ আরোপ করা হয় যে, উমর রা. ছোট লাঠি দিয়ে প্রহার করতেন, কিন্তু উসমান রা. প্রহার করেন বড় লাঠি দিয়ে।

এই অভিযোগের কোনো ভিত্তি নেই। নেই কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্র। এ ব্যাপারে কোনো গ্রহণযোগ্য হাদিসও নেই।

পঞ্চদশ অপবাদের জবাব : পঞ্চদশ অপবাদ ছিল, তিনি মিম্বরে রাসুল ﷺ-এর সিঁড়িতে বসেন, অথচ আবু বকর রা. এবং উমর রা. বসেছিলেন নিচের সিঁড়িতে।

কাজি ইবনুল আরাবি রহ. *আল-আওয়াসিম মিনাল কাওয়াসিম* গ্রন্থে বলেছেন, এই বর্ণনার কোনো সহিহ সূত্র নেই। যদি সহিহ সূত্র থেকেও থাকে, তাহলে সাহাবিগণের মধ্যে কেউই উসমান রা.-এর এই কাজে আপত্তি করেননি। আর যদি সাহাবিগণ আপত্তি করতেন, তাহলে আমরা বলতাম, এই আপত্তির

---

১৩৫. *আল-কামিল ফিত তারিখ*, ২/৪৬২; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/১৭০; *তারিখুল ইসলাম*, ৩/১০৭

কারণে কিছুতেই উসমান রা.-এর রক্ত হালাল হয়ে যায় না। তাকে হত্যা করা বৈধ হয়ে যায় না।

মুহিব্বুদ্দিন খতিব রহ. *আল-আওয়াসিম মিনাল কাওয়াসিম* নামক গ্রন্থের টীকায় বলেন, যদি উসমান রা. সম্পর্কে এই বর্ণনা সহিহ হয়ে থাকে, তবে এর পক্ষে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা রয়েছে। উসমান রা.-এর সময়ে এসে মসজিদে নববির আয়তন অনেক বৃদ্ধি করা হয়েছিল। উসমান রা. এই সংস্কার কাজে তার নিজস্ব সম্পদ ব্যয় করেছিলেন। এ সময় মসজিদে নববির আয়তন দাঁড়ায় ১২০×১০০ গজ। তখন যদি উসমান রা. মিম্বরের নিচের সিঁড়িতে বসতেন তাহলে মসজিদে আগত সকল মুসল্লি তাকে দেখতে পেত না। ফলে তিনি মিম্বরের ওপরের সিঁড়িতে বসেছেন, যেন সবাই সমানভাবে দেখতে পায়। এই ব্যাখ্যা তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন 'উসমান রা. রাসুল ﷺ-এর সিঁড়িতে বসেছেন' এই বর্ণনা প্রমাণিত হবে।

ষোড়শ অপবাদ : উসমান রা. বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি।

সপ্তদশ অপবাদ : তিনি উহুদের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পলায়ন করেছিলেন।

অষ্টাদশ অপবাদ : বাইআতে রিদওয়ানে তিনি ছিলেন অনুপস্থিত।

ইতিপূর্বে উসমান রা.-এর জীবনী নিয়ে আলোচনা করার সময় আমরা উপরিউক্ত এই তিনটি অপবাদের জবাব দিয়েছি। এ ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. যে কথা বলেছেন তা উল্লেখ করাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। *সহিহ বুখারি*-তে উসমান ইবনে মাওহাব রহ.-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, মিশরের এক ব্যক্তি হজের উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহ শরিফে আসেন। তিনি এসে কিছু লোককে একসঙ্গে বসা দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ওই লোকেরা কারা?

উপস্থিত লোকেরা জবাব দিলেন, তারা কুরাইশ গোত্রের লোক।

লোকটি বললেন, তাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি কে?

লোকেরা জবাব দিলো, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.।

এরপর লোকটি আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর কাছে গিয়ে বললেন, ইবনে উমর, আমি আপনাকে একটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে চাই। আশা করি আপনি আমাকে উত্তর দেবেন। উহুদ যুদ্ধে উসমান রা.-এর পলায়নের ব্যাপারে কি আপনি জানেন?

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, হ্যাঁ, জানি।

লোকটি বললেন, আপনি কি জানেন, তিনি যে বদর যুদ্ধেও ছিলেন না?

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, হ্যাঁ, জানি।

লোকটি বললেন, আপনি কি জানেন, তিনি বাইআতে রিদওয়ানেও ছিলেন না।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, হ্যাঁ, জানি।

লোকটি বললেন, আল্লাহু আকবার।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. লোকটিকে বললেন, আসুন, আপনাকে শোনাই সে কথা। উহুদ যুদ্ধে তিনি যে পালিয়েছিলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

যদি বদর যুদ্ধে তার অনুপস্থিতির কথা বলি, রাসুল ﷺ-এর কন্যা ছিলেন উসমান রা.-এর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ। বদর যুদ্ধের সময় নবীজির কন্যা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। উসমান রা.-কে থাকতে হয়েছিল অসুস্থ স্ত্রীর দেখাশোনায়। তখন রাসুল ﷺ তাকে বলেছিলেন, যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে তুমিও তাদের মতোই সওয়াব পাবে এবং গনিমতের অংশ পাবে।

বাইআতে রিদওয়ানে তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। কারণ, মক্কার লোকদের কাছে তিনি ছিলেন মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠ। এজন্য রাসুল ﷺ তাকে পাঠিয়েছিলেন মক্কার লোকদের সঙ্গে সমঝোতা করার জন্য। তিনি মক্কায় যাওয়ার পর বাইআতে রিদওয়ান সংঘটিত হয়েছিল। তখন রাসুল ﷺ তার ডান হাত রেখে বলেছিলেন, এটি হচ্ছে উসমানের হাত। এরপর তিনি তার অপর হাতে আঘাত করে বললেন, এই হাত উসমানের জন্য।

এরপর আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. লোকটিকে বললেন, এখন আপনি এই কথাগুলো গভীরভাবে ভেবে দেখুন।[১৩৬]

উনবিংশতম অপবাদের জবাব : উসমান রা. হুরমুযান হত্যার বদলায় উবাইদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-কে হত্যা করেননি।

এখানে খুবই জটিল একটি বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। উমর ইবনুল খাত্তাব রা. ২৩ হিজরিতে অগ্নিপূজারি আবু লুলুর হাতে শহিদ হন। সেদিন

---

১৩৬. *সহিহ বুখারি*, ৩৬৯৮; *সুনানুত তিরমিজি*, ৩৭০৬; *আল-মুসনাদ লিল ইমাম আহমাদ*, ৫৭৭২

আবু লুলু আরও সাতজন সাহাবিকে হত্যা করে এবং আরও কিছু সাহাবিকে আহত করে। একই সঙ্গে সে নিজেও আত্মহত্যা করে।

উমর রা.-কে আঘাত করা হয় ২৩ হিজরির ২৭ জিলহজ। সেদিনই তিনি ইন্তেকাল করেননি। জিলহজের শেষ রাতে ইন্তেকাল হয়েছিল তার। এই সময়ের মধ্যে আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর রা. উমর রা.-এর কাছে আসেন। তিনি এসে বলেন, আমি একবার হুরমুযানকে আবু লুলুর সঙ্গে কানাঘুষা করতে দেখলাম। তখন তাদের ব্যাপারে আমার সন্দেহ সৃষ্টি হলে আমি তাদের কাছাকাছি যাই এবং অতর্কিতভাবে তাদের ওপর হামলা করে বসি। তখন তাদের কাছ থেকে দুই মাথাবিশিষ্ট একটি খঞ্জর পড়ে যায়।

এ ঘটনা শোনার পর উপস্থিত লোকেরা গিয়ে উমর রা.-কে যে খঞ্জর দিয়ে আঘাত করা হয়েছে তা অনুসন্ধান করে দেখতে পায় যে, আবদুর রহমান রা.-এর বর্ণনার সঙ্গে খঞ্জরটির বৈশিষ্ট্য হুবহু মিলে যাচ্ছে। তখন সবাই নিশ্চিত হয়ে যায় যে, আবু লুলুর সঙ্গে হুরমুযানও এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল। হুরমুযান ছিল এক প্রবীণ পারসিক সেনাপতি। সে প্রথমে রাসুল ﷺ-এর সঙ্গে ওয়াদা ভঙ্গ করে। এরপর উমর রা.-এর সঙ্গে তিন বার ওয়াদা ভঙ্গ করে। এরপর ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিয়ে মদিনাতেই স্থায়ী হয়ে যায়। হত্যাকাণ্ডে হুরমুযানের জড়িত থাকার কথা উমর রা.-এর পুত্র উবাইদুল্লাহ রা.-এর কানে পৌঁছে যায়। তখনই তিনি কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। কিন্তু উমর রা.-এর ইন্তেকালের পর তিনি তার তরবারি নিয়ে বেরিয়ে যান এবং হুরুমুযানকে হত্যা করেন। মূলত এটি খুবই জটিল একটি বিষয়।

এখন আমরা লক্ষ্য করি, ইসলামি সাম্রাজ্যের ন্যায়পরায়ণতার পরিধির প্রতি। এ ঘটনার পর উসমান রা. বিশিষ্ট মুহাজির এবং আনসার সাহাবিগণকে নিয়ে একত্র হন। তাদের আলোচনার বিষয় ছিল, উবাইদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর পিতা এবং খলিফার হত্যাকাণ্ডে যে ব্যক্তির জড়িত থাকার ব্যাপারে সকলেই নিশ্চিত, এমন ব্যক্তিকে হত্যা করার কারণে উবাইদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর ওপর শরয়ি হদ তথা শাস্তি প্রয়োগ করা হবে কি না? সাহাবিগণের মধ্যে এ নিয়ে বিভিন্ন ধরনের কথা চলতে থাকে। তখন উসমান রা. উপস্থিত লোকদের উদ্দেশে বলেন,

এই ব্যক্তির (উবাইদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর) ব্যাপারে আপনারা আমাকে পরামর্শ দিন। সে ইসলামের যা ক্ষতি করার, তা তো করেছেই। উমর রা.-

এর মৃত্যুর তিন দিন পর এই বৈঠক বসে। এ সময় উবাইদুল্লাহ ইবনে উমর রা. সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা.-এর ঘরে বন্দি ছিলেন।

তখন আলি ইবনে আবু তালেব রা. বলেন, আমার মত হচ্ছে, তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া।

তখন অন্যান্য মুহাজির এবং আনসারি সাহাবিগণ বললেন, গতকালই উমর ইবনুল খাত্তাব শহিদ হলেন, আজ তার ছেলেকেও হত্যা করা হবে!

তখন আমর ইবনুল আস রা. বললেন, আমিরুল মুমিনিন, আল্লাহ তাআলা আপনাকে এ থেকে পরিত্রাণ দিয়েছেন। এ ঘটনা যখন সংঘটিত হয়; তখন আপনার হাতে ক্ষমতা ছিল না। তাই আপনার পক্ষ থেকে এটি ছেড়ে দিতে পারেন।

তখন উসমান রা. খানিক নীরবতা অবলম্বন করে বললেন, আমি নিহত ব্যক্তির অভিভাবক। আমি এই হত্যার জন্য দিয়তের (রক্তপণ) ফয়সালা করলাম এবং তা আমার নিজস্ব সম্পদ থেকে পরিশোধ করব।[১৩৭]

ইবনে তাইমিয়া রহ. *মিনহাজুস সুন্নাহ* গ্রন্থে এ ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, যদি হত্যাকারী ইজতেহাদ করেন এবং বাহ্যিক নিদর্শনের ভিত্তিতে হত্যা করা বৈধ মনে করে থাকেন, তাহলে এই ইজতেহাদকে এমন সংশয় আখ্যা দেওয়া যেতে পারে, যার ফলে হত্যার বিধান রহিত হয়ে যায়[১৩৮]

এ ঘটনার ব্যাখ্যা খুবই শক্তিশালী। আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর রা.-এর সাক্ষ্য থেকে স্পষ্ট যে, হুরমুযান আবু লুলুর সঙ্গে উমর রা.-কে হত্যার ষড়যন্ত্রে যুক্ত ছিল। তিনি আবু লুলুর হাতে যে খঞ্জর দেখতে পেয়েছিলেন, হুবহু সেই খঞ্জর দিয়েই উমর রা.-কে আঘাত করা হয়েছে। এ থেকে সন্দেহ নিশ্চয়তায় রূপ নেয়। উমর রা.-এর মৃত্যুর পর তখনও উসমান রা.-কে খলিফা হিসাবে নির্বাচিত করা হয়নি। তাই উবাইদুল্লাহ রা.-ই ছিলেন পিতার অভিভাবক। তাই তিনি নিজের ইজতেহাদ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সাহাবিগণের মধ্যে কেউই উবাইদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর এই ইজতেহাদ এবং ব্যাখ্যার সঙ্গে সহমত পোষণ করেননি। তথাপি যেহেতু ইজতেহাদের ভিত্তিতেই হত্যা

---

১৩৭. *আল-ইসাবা*, ৫/৪২-৪৩; *আল-কামিল ফিত তারিখ*, ২/৪৪৭; *তারিখু ইবনি খালদুন*, ২/৫৭১

১৩৮. *মিনহাজুস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যা*, ৬,

করা হয়েছে, তাই উসমান রা. নিজস্ব সম্পদ থেকে উবাইদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর পক্ষে দিয়ত তথা রক্তপণ আদায় করেছেন।

এর আগে হাবরুল উম্মাহ তথা মুসলিম উম্মাহর জ্ঞানী ব্যক্তি হিসাবে খ্যাত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর সঙ্গে উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর একটি কথোপকথন হয়েছিল। আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার পর উমর রা. ইবনে আব্বাস রা.-কে ডেকে বলেছিলেন, তুমি এবং তোমার পিতা আশা করতে, মদিনায় পারসিকদের বসবাস বৃদ্ধি পাক।

অর্থাৎ, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এবং তার পিতা আব্বাস রা. উভয়েই চাইতেন যে, মদিনা মুনাওয়ারায় পারসিকদের আগমন বৃদ্ধি পাক। ইসলাম গ্রহণ করে এখানেই স্থায়ী হয়ে তারা ইসলামি অনুশাসনের কাছাকাছি অবস্থান করুক। উমর ইবনুল খাত্তাব রা. এমনটি অপছন্দ করতেন এবং আগে থেকেই পারসিকদের বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা করতেন।

উমর রা.-এর কথার জবাবে ইবনে আব্বাস রা. বলেছিলেন, আপনি যদি চান তাদের সবাইকে আমরা হত্যা করি, তবে তাই করব।

শুধু হুরমুযানকেই নয়; বরং মদিনায় অবস্থানরত সকল পারসিকদের কথা বলেছেন তিনি। কারণ, তারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণে তাদের ওপর হদ প্রয়োগে শরয়ি কোনো বাধা নেই। শাসক চাইলে তাদের হত্যাও করতে পারেন।

তখন উমর রা. বললেন, তুমি ভুল বললে। তারা তোমাদের ভাষায় কথা বলার পর এবং তোমাদের কেবলামুখী হয়ে নামাজ আদায় করার পর তোমরা কি এমনটি করতে পারবে?[১৩৯]

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, উমর রা.-এর হত্যাকাণ্ডের সময় মুসলিমদের মধ্যে এমন লোকও ছিলেন, যিনি একজনের কারণে মদিনায় অবস্থানরত সকল পারসিকদের হত্যা করা বৈধ মনে করতেন। কারণ, তারা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে এবং খলিফাতুল মুসলিমিন উমর রা.-কে হত্যার চক্রান্ত করেছে। যে ব্যক্তি এমনটি মনে করতেন, তিনি সাধারণ কোনো লোক ছিলেন না। তিনি ছিলেন মুসলিম উম্মাহর জ্ঞানী হিসাবে খ্যাত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.। নিঃসন্দেহে এবং নিশ্চিতভাবেই তিনি ছিলেন উবাইদুল্লাহ

---

১৩৯. *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, ৪৪/৪১৬; *উসদুল গাবা*, ৪/১৫৩

ইবনে উমর রা. থেকে অধিক প্রজ্ঞাবান। তাই উসমান রা. নিজস্ব সম্পদ থেকে রক্তপণ আদায় করে দেন এবং হুরমুযানকে হত্যার কারণে উবাইদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-কে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া থেকে বিরত থাকেন।

বিংশতম অপবাদের জবাব : উসমান রা. কেবল তার নিকটাত্মীয়দেরই দান করতেন। অন্যান্য সাধারণ মুসলিমদের দান করতেন না। এটিও তার ওপর একটি অপবাদ।

উসমান রা. বলেন, আমি আমার পরিবার-পরিজনকে ভালোবাসি ও তাদের দান করি। তবে তাদের প্রতি এই ভালোবাসা আমাকে কোনো অন্যায়ের প্রতি ধাবিত করেনি। বরং আমি তাদের প্রাপ্য অধিকার যথাযথ আদায় করি। তাদের আমি দান করি আমার নিজস্ব সম্পদ থেকে। মুসলিমদের সম্মিলিত সম্পদ থেকে কিঞ্চিৎ পরিমাণও আমি নিজের জন্য অথবা অন্য কোনো মুসলিমের জন্য বৈধ মনে করি না। আমি রাসুল ﷺ, আবু বকর রা. ও উমর রা.-এর সময়েও আমার সম্পদ থেকে অনেক দান করেছি। অথচ তখন আমি ছিলাম সম্পদের প্রতি আগ্রহী। এখন আমি বার্ধক্যে উপনীত হয়েছি। আমার পরিবারের দায়ভার আমার কাঁধে এসেছে। আমি আমার সম্পদ পরিবারের জন্য ব্যয় করেছি, এ সময়ে এসে বেদ্বীন ব্যক্তিরা এমন আপত্তিকর কথা বলছে।[১৪০]

এ কথা প্রসিদ্ধ যে, উসমান রা. প্রতি শুক্রবারে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একজন করে দাস মুক্ত করতেন। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা., আম্মার ইবনে ইয়াসির রা., খাব্বার ইবনে আরাত রা. এবং যুবায়ের ইবনুল আওয়াম রা. প্রমুখ সাহাবিকে জায়গির প্রদান করেছিলেন, যারা তার আত্মীয় ছিলেন না। অপরদিকে তিনি তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রা.-এর কাছে প্রাপ্য ৫০ হাজার দিরহাম মাফ করে দিয়েছিলেন।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. *মিনহাজুস সুন্নাহ* গ্রন্থে এর সঙ্গে যোগ করে আরও বলেন,

মারওয়ান ইবনে হাকাম রা.-কে আফ্রিকার গনিমতের এক-পঞ্চমাংশ প্রদানের যে অভিযোগ করা হয়েছে, তা যদি সত্যও হয়ে থাকে, তবে এতে উসমান রা.-এর কোনো অন্যায় নেই। কারণ, উসমান রা. এখানে মুসলিমদের

---

১৪০. *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, ৩৯/৩১৪; *তারিখুত তবারি*, ৪/৩৪৭; *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১/১৯১

সদকার সম্পদ থেকে বণ্টন করেছেন। তিনি ধনী হলেও এই সম্পদে তারও অধিকার রয়েছে।

তিনি সুরা আনফালের নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লেখিত আত্মীয়দের অংশের কথা উল্লেখ করেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَاعْلَمُوٓا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَٰمَىٰ وَالْمَسَٰكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾

> জেনে রাখো, যা-কিছু তোমরা গনিমত হিসাবে পাবে তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ তাআলা, তাঁর রাসুল, নিকটাত্মীয়, এতিম-অসহায় এবং মুসাফিরদের জন্য বরাদ্দ। [সুরা আনফাল : ৪১]

হাসান বসরি রহ. ও আবু সাওর রহ. প্রমুখের মতে উক্ত আয়াতে যে আত্মীয়ের কথা বলা হয়েছে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, যিনি নেতা অথবা শাসক হবেন তার আত্মীয়। রাসুল ﷺ-ও তাঁর আত্মীয়দের এ থেকে দান করতেন। কারণ, তিনি তখন মুসলিমদের নেতা ছিলেন। রাসুল ﷺ-এর পরবর্তী প্রত্যেক শাসকের জন্যই এই অধিকার রয়েছে। তিনি চাইলে এই এক-পঞ্চমাংশ থেকে তার আত্মীয়স্বজনকে দান করতে পারেন।[১৪১] এই জবাব তখনই দেওয়া যেতে পারে, যখন শিয়াদের আরোপিত এই অপবাদকে সত্য বলে ধরা হবে। যদিও শুরু থেকেই তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে।

বিদ্রোহীরা উসমান রা.-এর বিরুদ্ধে এ ২০টি অভিযোগ একত্র করে বসরা, কুফা এবং মিশর থেকে সংঘবদ্ধ হয়ে মদিনায় উসমান রা.-এর উদ্দেশে রওনা হয়। ৩৫ হিজরির জিলকদ মাসের চাঁদ উদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তারা মদিনায় এসে পৌঁছে এবং এসব অভিযোগ নিয়ে উসমান রা.-এর মুখোমুখি হয়।

---

১৪১. *মিনহাজুস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যা*, ৬/৩৫৫

বিদ্রোহীরা মদিনায়

ইতিমধ্যে আমরা উসমান রা. এবং বিভিন্ন প্রান্তে তার গভর্নরদের ব্যাপারে বিদ্রোহীদের উত্থাপিত অভিযোগগুলো খণ্ডন করেছি।

বসরা, কুফা এবং মিশর থেকে সংগঠিত হয়ে এই কুচক্রী মহল বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মদিনা মুনাওয়ারার দিকে যাত্রা শুরু করে। বাহ্যিকভাবে উসমান রা.-এর কাছে এসব অভিযোগ উত্থাপন করে জবাবদিহিতা চাওয়ার আড়ালে তাদের উদ্দেশ্য ছিল, খেলাফতের রাজধানী মদিনা মুনাওয়ারায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা। মদিনা অভিমুখে যাত্রা শুরুর সময়ও তারা এ ঘোষণা দিয়েছিল যে, তারা হজের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছে। যখন তারা মদিনার উদ্দেশে পথ চলতে শুরু করে, তখনও তাদের বক্তব্য এটিই ছিল। সময়টা ছিল ৩৫ হিজরির শাওয়ালের শেষ এবং জিলকদের শুরু।

বিদ্রোহীদের নেতৃত্বে ছিল যারা

প্রতিটি শহর থেকে চারটি করে দল বের হয়। বসরার চার দলের নেতৃত্বে ছিল হাকিম ইবনে জাবালা, বিশর ইবনে শুরাইহ, যুরাইহ ইবনে আব্বাদ এবং ইবনে মুহাররিক হানাফি। এদের সবার নেতৃত্বে ছিল হুরকুস ইবনে যুহাইর সাদি। এরা সংখ্যায় ছিল ৬০০ থেকে ১ হাজারের মতো।

কুফা থেকে বের হওয়া চার দলের নেতৃত্বে ছিল আশতার নাখায়ি, যায়দ ইবনে সাওহান, যিয়াদ ইবনে নাযর হারেসি এবং আবদুল্লাহ ইবনে আসাম্ম। এদের সকলের নেতৃত্বে ছিল আমর ইবনুল আসাম্ম। এরাও সংখ্যায় ছিল ৬০০ থেকে ১ হাজারের মতো।

মিশর থেকে যে দলটি বের হয়, এ দলের প্রধান নেতা ছিল গাফেকি ইবনে হারব আক্কি। তার অধীনে থাকা চারটি দলের নেতৃত্বে ছিল আবদুর রহমান ইবনে উদাইছ, কিনানা ইবনে বিশর, সাওদান ইবনে হুমরান এবং কুতাইরা সাকুনি। এরাও ছিল সংখ্যায় ৬০০ থেকে ১ হাজারের মতো।

সব মিলিয়ে কমপক্ষে ২ হাজার বিদ্রোহী মদিনা অভিমুখে যাত্রা করেছিল। প্রত্যেকেই নিজের শহর থেকে হজের কথা বলে বেরিয়েছিল। এর আড়ালে তাদের নিকৃষ্ট উদ্দেশ্যের কথা কেউই জানত না। তবে মিশরে নিযুক্ত গভর্নর

আবদুল্লাহ ইবনে সাদ ইবনে আবু সারহ রা. তা ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন। মিশরের ভ্রান্ত বিদ্রোহীরা যখন মিশর থেকে বেরিয়ে পড়ে, তখন তিনি উসমান রা.-এর কাছে চিঠি পাঠিয়ে জানিয়ে দেন যে, বিদ্রোহীরা মিশর থেকে মদিনার উদ্দেশে বেরিয়ে গিয়েছে। এদের উদ্দেশ্য হজ নয়; বরং এদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ফিতনা সৃষ্টি করা। কিন্তু এই চিঠি পৌঁছে কিছুটা দেরিতে। এমনইভাবে আবদুল্লাহ ইবনে সাদ ইবনে আবু সারহ রা. মিশর থেকে সামরিক সাহায্য প্রদানের নিশ্চয়তা দিয়ে আরেকটি চিঠি প্রেরণ করেছিলেন।

বিদ্রোহীদের মূলহোতাদের মধ্যে ইতিপূর্বে আমরা আশতার নাখায়ি, হাকিম ইবনে জাবালা এবং সাওদান ইবনে হুমরান প্রমুখের কথা আলোচনা করেছি। হাকিম ইবনে জাবালা ছিল দুশ্চরিত্র এবং বসরার প্রসিদ্ধ চোর। সাওদান ইবনে হুমরান; যে মিশর থেকে বেরিয়েছিল, সে ছিল মূলত ইয়ামেনের সাকুন গোত্রের অধিবাসী। আশ্চর্যের কথা হচ্ছে, ১৪ হিজরিতে উমর রা. যখন জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হওয়া গোত্রগুলোর খোঁজ নিচ্ছিলেন, তখন সাকুন গোত্র উমর রা.-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করে। সাওদান ইবনে হুমরান তখন এই গোত্রেই ছিল। উমর রা. তাদের দিকে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এরপর আবার তাদের দিকে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এভাবে তিনবার করলেন। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি। নিশ্চয় আমি এই গোত্র থেকে বারবার মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছি। কারণ, আল্লাহর শপথ! এদের চেয়ে অধিক অপছন্দনীয় কোনো গোত্র আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করেনি।[১৪২]

সেদিন এদের মধ্যে থাকা সাওদান ইবনে হুমরান এবং খালিদ ইবনে মুলজিম প্রমুখ ব্যক্তি পরবর্তী সময়ে উসমান রা.-এর হত্যার ফিতনায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এই ঘটনার মাধ্যমে উমর রা.-এর দূরদর্শিতার বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মিশরের বিদ্রোহীদের নেতৃত্বে বাহ্যিকভাবে গাফেকি থাকলেও পেছন থেকে এদের কলকাঠি নাড়ছিল ইবনে সাবা। গাফেকি ইবনে হারব ছিল ইয়ামেনের অধিবাসী। মিশর বিজয়ের পর সেখানেই সে বসবাস শুরু করে। তার ছিল নেতৃত্ব ও মর্যাদার লোভ। তবে সে একজন মেধাবী এবং ধর্মীয় আলেমও ছিল।

১৪২. *তারিখু মদিনাতি দিমাশক*, ১৪/৩৮৪; *তারিখুত তাবারি*, ৩/৪৮৫; *আল-কামিল ফিত তারিখ*, ২/২৮৭

তিন শহরের পৃথক পৃথক এই দলগুলো একত্রিত হওয়ার পর এদের সকলের আমির নিযুক্ত হন গাফেকি ইবনে হারব আক্কি। বিদ্রোহীরা মদিনার নিকটবর্তী হয়ে ঘাঁটি স্থাপন করে। আবদুল্লাহ ইবনে সাবা ছিল মিশর থেকে আগত দলের সদস্য। তবে সে তার নাম ঘোষণা করেনি।

বিদ্রোহীদের উদ্দেশ্যসমূহ

সকল বিদ্রোহীই উসমান রা.-কে বরখাস্ত করার ব্যাপারে ছিল একমত। তবে তার পরবর্তী সময়ে কে খলিফা হবেন এ নিয়ে তাদের মধ্যে মতানৈক্য ছিল। মিশরের অধিবাসীরা চেয়েছিল আলি রা.-কে খলিফা বানাতে। তারা ইতিমধ্যেই ইহুদি আবদুল্লাহ ইবনে সাবার মাধ্যমে প্রভাবিত হয়ে পড়ে এবং এই প্রবঞ্চনার শিকার হয় যে, রাসুল ﷺ আলি রা.-এর পক্ষে অসিয়ত করে গিয়েছেন। তাই তিনিই খেলাফতের সবচেয়ে উপযুক্ত। এদিকে কুফাবাসীদের ইচ্ছা, যুবায়ের ইবনুল আওয়াম রা.-কে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করা। কারণ, তিনি একসময় কুফার শাসক ছিলেন। বসরার অধিবাসীদের পছন্দ ছিল তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রা.-কে। কারণ, একসময় তিনি বসরাবাসীদের শাসক ছিলেন।

তারা যখন মদিনায় পৌঁছে এবং সাধারণ মুসলিমরা তাদের অসৎ উদ্দেশ্যের কথা জেনে যায়, তখন উসমান রা. প্রতিটি দলের সঙ্গে কথা বলার জন্য তাদের পছন্দনীয় ব্যক্তিকে পাঠিয়ে দেন। তারা প্রত্যেকে ওই দলের কাছে চলে যান, যারা তাকে খলিফা হিসাবে দেখতে চায়।

আলি রা. যান মিশর থেকে আগত দলের কাছে। মদিনা থেকে কয়েক মাইল দূরে যখন তাদের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেন, তখন তারা আলি রা.-কে উষ্ণ অভিবাদন জ্ঞাপন করে এবং তাকে নিজেদের আমির মেনে নিয়ে স্বাগত জানায়। কিন্তু আলি রা. তাদের কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেন। তিনি বলেন, সৎ ব্যক্তিগণ অবগত আছেন যে, তোমরা মুহাম্মাদ ﷺ-এর ভাষায় অভিশপ্ত; তাই তোমরা ফিরে যাও। আল্লাহ যেন তোমাদের মঙ্গল না করেন।

তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রা. বসরা থেকে আগত দলকে এবং যুবায়ের ইবনুল আওয়াম রা. কুফা থেকে আগত দলকে একই কথা বলেন।[১৪৩]

---

১৪৩. *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, ৩৯/৩১৯; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/১৯৪; *তারিখুল ইসলাম*, ৩/১২০

বিদ্রোহীরা নিজেদের পছন্দের তিন সাহাবির কাছে অনুরোধ করে, তারা যেন উসমান রা.-এর সঙ্গে মুখোমুখি হতে পারে ও উসমান রা.-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলো তার কাছে পেশ করতে পারে।। এরপর (অনুরোধ গ্রহণ করার পর) তারা মদিনা মুনাওয়ারায় প্রবেশ করে উসমান রা.-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং তাকে বলে, কুরআন শরিফ খুলুন এবং নবম সুরাটি পাঠ করুন। অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর পাণ্ডুলিপি অনুযায়ী সুরা ইউনুস পাঠ করতে বলা হয়। উসমান রা. মুখস্থ সুরা ইউনুস পড়তে শুরু করেন। যখন এই আয়াতে এসে পৌঁছান—

﴿آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾

আল্লাহ তাআলা কি তোমাদের অনুমতি দিয়েছেন, নাকি তোমরা আল্লাহ তাআলার ওপরই মিথ্যাচার করছ? [সুরা ইউনুস : ৫৯]

এই আয়াতে এসে উসমান রা.-কে থামতে বলা হয়। এরপর তারা উসমান রা.-কে বলে, আপনি যে চারণভূমি নির্ধারণ করেছেন, আল্লাহ তাআলা কি আপনাকে এর অনুমতি দিয়েছেন, নাকি আপনি আল্লাহ তাআলার ওপর মিথ্যাচার করছেন?

এভাবেই বিদ্রোহীরা তাদের আরোপিত অভিযোগগুলো উত্থাপন করতে শুরু করে। আমরা পূর্বে যেগুলোর খণ্ডন করে এসেছি। তারা অভিযোগ করছিল আর উসমান রা. জবাব দিচ্ছিলেন। তিনি তাদেরকে বলেন, উক্ত আয়াত চারণভূমির ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়নি। এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মুশরিকদের ব্যাপারে। চারণভূমির সীমানা উমর রা. বৃদ্ধি করেছিলেন। উটের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় আমিও চারণভূমির সীমানা বৃদ্ধি করেছি।[১৪৪]

এভাবে তারা একের পর এক অভিযোগ উত্থাপন করতে থাকে আর উসমান রা. জবাব দিতে থাকেন।

বর্ণনাকারীদের ভাষ্য অনুযায়ী উসমান রা. তাদের ওপরে বিজয়ী হন এবং সব প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব দিয়ে তাদেরকে নিশ্চুপ করে দেন। জবাব পাওয়ার পর তারা আর কিছু বলতে সক্ষম হয়নি। কথোপকথন শেষ হওয়ার পর উসমান রা. তাদের বলেন, তোমরা কী চাও?

---

১৪৪. *তারিখু খলিফা ইবনি খাইয়াত*, ১/১৬৯; *তারিখুত তবারি*, ৪/৩৫৪

তারা বলল, যাদের নির্বাসিত করা হয়েছে তারা ফিরে আসবে। বঞ্চিতদের দান করা হবে। বিশ্বস্ত এবং যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ দেওয়া হবে এবং বণ্টনে সমতা বিধান করতে হবে।

যদিও উসমান রা. পূর্বে কখনো তাদের উত্থাপনকৃত এসব বিষয়ে সামান্য পরিমাণও সীমালঙ্ঘন করেননি। তার শাসনামলে কাউকে বঞ্চিত বা নির্বাসিত করা হয়নি, তবুও তিনি তাদের কথায় সম্মত হন এবং তা চুক্তিনামায় লিপিবদ্ধ করে রাখেন।[১৪৫] এসব দাবির পাশাপাশি মিশর থেকে আগত বিদ্রোহীরা আরও দাবি করে, আপনি আবদুল্লাহ ইবনে সাদ ইবনে আবু সারহ রা.-কে বরখাস্ত করবেন এবং মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর রা.-কে গভর্নর নিযুক্ত করবেন। আশ্চর্যের কথা হচ্ছে, মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর রা. আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর পুত্র হওয়া সত্ত্বেও মিশরে উসমান রা.-এর বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। আগত বিদ্রোহীদের মধ্যে তিনিও ছিলেন।

উসমান রা. মিশরীয় বিদ্রোহীদের এই দাবিতেও সম্মত হন। মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর রা.-কে মিশরের গভর্নর পদে নিয়োগ দিয়ে কাগজে স্বাক্ষর করে দেন এবং আবদুল্লাহ ইবনে সাদ ইবনে আবু সারহ রা.-কে বরখাস্ত করেন। তবে শর্ত প্রদান করেন যে, তাদের নামে যেন কখনো অবাধ্যতার অভিযোগ না আসে। তারা যেন মুসলিমদের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি না করে। তারা এ বিষয়ে উসমান রা.-কে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং সন্তুষ্টচিত্তে মদিনা থেকে চলে যায়।[১৪৬]

মদিনার মুসলিমগণ মনে করেন, ফিতনার আগুন এখন পুরোপুরি নিভে গিয়েছে। দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে চলতে থাকা ফিতনার আগুন নিভে যাওয়ার পর মদিনায় ফিরে আসে প্রশান্তিময় রাত।

আমরা সেই বিদ্রোহীদের দিকে তাকালে দেখতে পাই, তাদের মধ্যে থাকা আবদুল্লাহ ইবনে সাবার মতো আরও অনেকেরই উদ্দেশ্য ছিল, ইসলামের ওপর আঘাত করা এবং ইসলামের ধ্বংস দেখা। কেউ কেউ ছিল নিজের গোত্রীয় উন্মাদনায় মত্ত। বিশেষত ইয়ামেনের গোত্রগুলো, যারা কুরাইশের মতো সম্মান, মর্যাদা অর্জন করতে না পারায় হিংসায় জ্বলে-পুড়ে মরছিল। এদের সংখ্যা ছিল তুলনামূলক বেশি। এদের অধিকাংশই ইয়ামেনের সাকুন

---

১৪৫. *তারিখুল ইসলাম*, ৩/১২২

১৪৬. *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, ৩৯/৩২৪

গোত্রের লোক ছিল। বিদ্রোহীদের মধ্যে কিছু লোক উসমান রা.-এর ওপর এই কারণে ক্ষিপ্ত ছিল যে, উসমান রা. তাদের ওপর অথবা তাদের আত্মীয়স্বজনের ওপর শরয়ি হদ প্রয়োগ করেছেন। ফলে তারা উসমান রা.-এর ওপর প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠে। তাদের কাউকে কাউকে উসমান রা. ব্যক্তিগতভাবে শাস্তি দিয়েছিলেন। তাই তারা প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য এসেছে। তাদের মধ্যে ছিল গাফেকি, আশতার নাখায়ির মতো ব্যক্তি। এরা ছিল শক্তিশালী মেধাবী এবং বাগ্মী। কিন্তু নেতৃত্বের লোভ তাদের এই ঘৃণ্য চক্রান্তে অংশ নিতে উদ্‌বুদ্ধ করেছে।

নিজেদের যোগ্যতায় আত্মতৃপ্ত হয়ে তারা ভেবেছে যে, এসব যোগ্যতাই তাদের নেতৃত্ব লাভের জন্য যথেষ্ট। ফলে তাদেরকে শাসনক্ষমতায় নিয়োগ প্রদান না করায় তারা বিস্ময় প্রকাশ করে। তাদের মধ্যে এমন লোকও ছিল যাদেরকে উসমান রা. খুবই সম্মান এবং সমাদর করতেন। কিন্তু এতেও তাদের মন ভরেনি। তারা আরও বেশি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে বসে। প্রত্যাশা করে উসমান রা. তাদেরকে গভর্নর নিয়োগ করবেন। কিন্তু তাদেরকে গভর্নর হিসাবে নিয়োগ না দেওয়ায় তারা প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠে। যেমন মুহাম্মাদ ইবনে আবু হুজাইফা। সে ছিল উসমান রা.-এর পালকপুত্র। শৈশবকালে উসমান রা. তার পেছনে অনেক সম্পদ ব্যয় করেছেন। কিন্তু সে উসমান রা.-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে।

উসমান রা.-এর বিরুদ্ধে গোপনে গোপনে মানুষকে উসকানি দিতে শুরু করে। সাহাবিগণের নামে যারা মিথ্যা চিঠি লিখেছিল, তাদের মধ্যে সে ছিল অন্যতম। সে তার নিকটস্থ লোকদের এসব মিথ্যা চিঠি দিয়ে নিকটবর্তী জনপদে পাঠাত। পাঠানোর আগে সে চিঠিবাহকদের দীর্ঘক্ষণ সূর্যের আলোয় দাঁড় করিয়ে রাখত। ফলে লোকেরা মনে করত যে তারা অনেক দূর থেকে সফর করে এসেছে। এভাবে ওই সব চিঠির মাধ্যমে তারা ধোঁকায় পড়ে যেত। উল্লিখিত অপরাধী এবং মুনাফেকরা ছিল ফিতনার মূলহোতা এবং নেতৃস্থানীয় পর্যায়ের। এ ছাড়া অন্যান্য যারা ছিল তাদের মধ্যে ছিল দুই ধরনের লোক।

এক. যারা দ্বীনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে। সামান্য ভুলকে বিরাট আকারে উপস্থাপন করে। এমনকি ছোটখাটো ভুলের ব্যাপারেও ছাড় দেয় না। এরা

মনে করে, উসমান রা. ভুল করেছেন তাই তাকে বরখাস্ত করতে হবে। তা না হলে ব্যাপারটি হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত গড়াবে।

দুই. যারা প্রকৃতপক্ষেই অজ্ঞ এবং নির্বোধ ছিল। ফিতনার মূলহোতারা তাদের যা বলেছে, ধোঁকায় পড়ে তা-ই তারা মেনে নিয়েছে। যোগাযোগব্যবস্থা দুর্বল হওয়ায় এসব ভ্রান্ত ধারণা দূর করার মতো পর্যাপ্ত উপায়-উপকরণ তখন তাদের ছিল না। এর পাশাপাশি তাদের অবস্থান ছিল বিভিন্ন দূরবর্তী স্থানে। সাহাবি, আলেম এবং ফকিহগণের আবাসস্থল মদিনা মুনাওয়ারা থেকেও অনেক দূরে।

এসব মানুষ সাহাবিগণ এবং উসমান রা.-এর সঙ্গে কথা বলে নিজেদের এতদিনের ভুল স্বীকার করে সন্তুষ্টচিত্তে নিজেদের বাসস্থানে ফিরে যেতে শুরু করে। কিন্তু ফিতনার মূলহোতা যারা ছিল, তারা মূলত উসমান রা. এবং বিশিষ্ট সাহাবিগণের কথায় বশ্যতা মেনে নিতে আসেনি। তারা এসেছে ফিতনার উদ্দেশ্যে।

মিথ্যা চিঠি ও বিদ্রোহীদের প্রত্যাবর্তন

বিদ্রোহীরা সবাই মদিনা থেকে নিজ নিজ দেশের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ে। শুধু আশতার নাখায়ি এবং হাকিম ইবনে জাবালা মদিনায় থেকে যায়। সবার সঙ্গে ফিরে না গিয়ে এ দুই ব্যক্তির মদিনায় থেকে যাওয়ার বিষয়টি অনেক প্রশ্নের জন্ম দেয়। মিশর থেকে আগত দল উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল দিয়ে ফেরার পথ ধরে। অপরদিকে কুফা ও বসরা থেকে আগত দল ফিরে যায় উত্তর-পূর্ব দিক দিয়ে। এভাবে যাত্রাপথে তারা ক্রমেই একে অপরের থেকে দূরে সরতে থাকে।

ইত্যবসরে মিশরীয় দলের পথে এক উষ্ট্রারোহী ব্যক্তির দেখা পাওয়া যায়। বেশ কয়েক বার সে মিশরীয় দলের কাছে ঘেঁষে আবার পৃথক হয়ে যায়। ফলে মিশরীয়দের মধ্যে লোকটিকে নিয়ে সন্দেহ দেখা দেয়। তখন তারা লোকটিকে থামিয়ে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে।

সে বলে, আমি আমিরুল মুমিনিনের পক্ষ থেকে তার মিশরীয় গভর্নরের নিকট প্রেরিত দূত।

এ কথা স্পষ্ট যে, লোকটির এমন আচরণের কোনো উদ্দেশ্য রয়েছে। মিশরীয়দের কাছে কোনো বিষয় ব্যাখ্যা করতে চাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে সে

খলিফার দূত নয়। কারণ, বর্ণনা অনুযায়ী সে বারবার মিশরীয়দের কাছে ঘেঁষে আবার দূরে চলে যেত।

খলিফার দূত পরিচয় দেওয়ায় তাকে তল্লাশি করা হয়। তার সঙ্গে একটি চিঠি পাওয়া যায়। যাতে উসমান রা.-এর পক্ষ থেকে ফিতনাবাজদের কিছু ব্যক্তিকে হত্যা করতে আবদুল্লাহ ইবনে সাদ ইবনে আবু সারহ রা.-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। চিঠিতে ওই সব লোকদের নামও উল্লেখ করা ছিল। এদের কাউকে হত্যা, কাউকে শূলে চড়ানো এবং কারও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে দেওয়ার নির্দেশ ছিল। একই সঙ্গে মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর রা.-কে হত্যার নির্দেশ ছিল।[১৪৭]

চিঠিতে উসমান রা.-এর সিলমোহরের ছাপও ছিল। তাই চিঠিটি পড়ার পর মিশরীয়দের অবাধ্যতা পুনরায় মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। তারা পুনরায় মদিনার পথে যাত্রা শুরু করে। ৩৫ হিজরির জিলকদ মাসের মাঝামাঝিতে এ ঘটনা ঘটে। মদিনায় ফেরার পথেই আলি ইবনে আবু তালেব রা.-এর পক্ষ থেকে তাদের কাছে আরেকটি চিঠি আসে। সে চিঠিতে তাদের মদিনায় আগমনের নির্দেশ দেওয়া হয়।

নিজ নিজ দেশের উদ্দেশে রওনা হওয়ার পর তাদের পুনরায় ফিরে আসতে দেখে মদিনার মুসলিমরা খুবই অবাক হন। তখন আলি রা. তাদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য বের হন। তারা আলি রা.-কে বলে, এই দেখুন আল্লাহর শত্রু (উসমান রা.-কে উদ্দেশ্য করে) আমাদের অমুক অমুকের ব্যাপারে কী লিখেছে! এই বলে তাকে চিঠিটি দেখায়। এরপর বলে, আল্লাহ তাআলা তার রক্তকে বৈধ করে দিয়েছেন। তাই আপনিও আমাদের সঙ্গে তার কাছে চলুন।

আলি রা. বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি কখনোই তোমাদের সঙ্গে এমন কাজে যাব না।

তখন তারা বলে, তাহলে আপনি আমাদের কাছে চিঠি লিখে পাঠালেন কেন?

---

১৪৭. *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, ৩৯/৩২৪; *তারিখু খলিফা ইবনি খইয়াত*, ১/১৬৯; *তারিখুত তবারি*, ৪/৩৫৫

আলি রা. বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি তো তোমাদের কাছে কিছুই লিখে পাঠাইনি।[১৪৮]

তখন মিশরীয়রা আশ্চর্য হয়ে একে অপরের দিকে তাকাতে থাকে। প্রতিটি গ্রন্থেই এই বর্ণনা রয়েছে। এতে প্রমাণ হয় যে, বিদ্রোহীরা একে অপরের মাধ্যমে প্রবঞ্চনার শিকার হতো। তারা জানত না কীভাবে এই ষড়যন্ত্র পরিচালিত হচ্ছে। এও প্রমাণিত হয় যে, তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ চিঠি লিখে সাহাবিগণের স্বাক্ষর নকল করে চালিয়ে দিত; ফিতনার অগ্নি প্রজ্বলনের জন্য যা ছিল যথেষ্ট কার্যকর। এমনইভাবে এসব ঘটনার মাধ্যমে জানা যায় যে, আলি রা. সবসময় এসব বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ছিলেন। প্রথমবার তারা যখন এসেছিল, তখন তিনি তাদের সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়েছিলেন। দ্বিতীয়বার যখন তারা ফিরে এলো, তিনি তখন তাদের তিরস্কার করেন এবং মদিনা থেকে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করেন। অথচ বানোয়াট বর্ণনাগুলোর ভাষ্য হচ্ছে, আলি রা. কিছু কারণে উসমান রা.-এর ওপর ক্ষুব্ধ ছিলেন। তাই তিনি উসমান রা.-এর প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত না হয়ে তাকে একা ছেড়ে আসেন। বিদ্রোহীদের দমনে তিনি কোনো পদক্ষেপ নেননি। এমনটি বলার মাধ্যমে উসমান রা. ও আলি রা. উভয়ের ওপরেই অপবাদ আরোপ করা হয়। যে ব্যক্তি এসব অনির্ভরযোগ্য গ্রন্থগুলো পাঠ করবে সে এমন আরও অনেক বানোয়াট বিষয় দেখতে পাবে।

মিশরীয়রা যখন আলি রা.-এর সঙ্গে উসমান রা.-এর নাম দিয়ে প্রেরিত এই অদ্ভুত চিঠি নিয়ে তর্ক করছিল, তখন কুফা এবং বসরার দলদুটিও মদিনার প্রবেশদ্বারের কাছাকাছি চলে আসে। ফলে বেশ কয়েকজন সাহাবি তাদের জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা আবার ফিরে এলে কেন?

তারা বলল, আমরা এসেছি আমাদের মিশরীয় ভাইদের সাহায্য করার জন্য।

আলি রা. তাদের বললেন, মিশরীয়দের সম্পর্কে তোমরা কীভাবে জানলে, তোমরা তো তাদের থেকে অনেক দূরে ছিলে? আল্লাহর শপথ! নিশ্চয় এটি এমন এক ষড়যন্ত্র, মদিনা থেকেই যা পরিচালিত হচ্ছে।[১৪৯]

---

১৪৮. *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, ৩৯/৩২৪

১৪৯. *তারিখুত তবারি*, ৪/৩৫১; *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, ৩৯/৩১৯

আলি রা. যেন আশতার নাখায়ি এবং হাকিম ইবনে জাবালার মদিনায় থেকে যাওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করছিলেন। যেন তারা দুজনই এই চিঠিগুলো লিখেছে। এমনটি হওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল।

কুফা এবং বসরার বিদ্রোহীরা তখন বলল, আপনারা যাই বলুন না কেন, এই ব্যক্তি যেন নিজ থেকে অব্যাহতি নেয়, নয়তো আমরা তাকে অপসারণ করব।

এ সময় সাহাবিগণ উসমান রা.-এর সিলমোহরযুক্ত চিঠি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য বিদ্রোহীদের নিয়ে উসমান রা.-এর কাছে যান এবং তাকে চিঠিটা দেখান।

তখন উসমান রা. বলেন, তোমরা এর স্বপক্ষে প্রমাণ দাও। আল্লাহর শপথ! আমি এই চিঠি লিখিনি এবং কাউকে দিয়ে লেখাইনি। এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। আর সিলমোহরের অনুকরণে মিথ্যা সিলমোহর বানানো যায়।[১৫০]

তখন বিদ্রোহীদের কেউ কেউ বলল, তাহলে এই চিঠি মারওয়ান ইবনে হাকাম লিখেছে।

তারা চাইল, মারওয়ান ইবনে হাকামকে যেন তাদের কাছে সমর্পণ করা হয়। উসমান রা. আশঙ্কা করলেন, যদি তাদের হাতে দেওয়া হয়, তাহলে তারা মারওয়ানকে হত্যা করতে পারে। তাই তিনি তাদের এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তখন কেউ কেউ তার কথা সত্যায়ন করে এবং অন্যরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।

এভাবেই বেশ কয়েক দিন ধরে উসমান রা. এবং বিদ্রোহীদের মধ্যকার সংলাপ চলতে থাকে। বিদ্রোহীরা ঘোষণা করে দেয়, যারা নিজের হাতকে সংযত রাখবে তারা নিরাপদ।

এ সময় বিদ্রোহীদের সংখ্যা ছিল অন্তত ২ হাজার। মদিনায় বিদ্যমান সাহাবিগণ ছিলেন সংখ্যায় ৭০০ জন। বিদ্রোহীদের প্রতিরোধ করার জন্য মদিনায় তখন কোনো সেনাবাহিনীও ছিল না। কারণ, মুসলিম বাহিনীর অধিকাংশই তখন রোম, পারস্য, আফ্রিকা ইত্যাদি বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। মদিনায় বিশেষ কোনো নিরাপত্তা বাহিনী ছিল না। কারণ,

---

১৫০. *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, ৩৯/৩২৪; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/২০৮

মদিনার মানুষ একে অপরের ব্যাপারে ছিল নিরাপদ এবং নিশ্চিন্ত। যেমন, হাসান বসরি রহ. বলেন, এক মুমিন অপর মুমিনের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বসুলভ মনোভাব নিয়েই সাক্ষাৎ করত।

এ ছাড়া ওই সব বিদ্রোহীরা মদিনায় এসেছিল হজের মৌসুমে। তখন মদিনার অনেক মুসলিম হজ আদায়ের লক্ষ্যে বেরিয়ে পড়েছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. উসমান রা.-এর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে হজে যাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রতীক্ষমাণ ছিলেন। পরিস্থিতি কী হয় তা দেখার জন্য তিনি মদিনায় অবস্থান করছিলেন। অপরদিকে উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রা. তখন হজের উদ্দেশ্যে মদিনা ছেড়ে গিয়েছিলেন।

গৃহবন্দি হলেন উসমান রা.

এ সময় পর্যন্ত খলিফা উসমান রা. স্বাভাবিকভাবেই চলছিলেন। মুহাজির এবং আনসার সকল সাহাবিই তার পেছনে নামাজ আদায় করছিলেন। এমনকি বিদ্রোহীরাও তার পেছনেই নামাজ পড়ত। এরই মধ্যে জুমার দিন চলে আসে। উসমান রা. দাঁড়িয়ে জুমার খুতবা প্রদান করেন। নামাজ শেষে তিনি পুনরায় মিম্বরে আরোহণ করেন এবং বলেন, বহিরাগত লোকসকল, আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহর শপথ! নিশ্চয় মদিনাবাসীরা জানে যে, তোমরা হলে রাসুল ﷺ-এর ভাষায় অভিশপ্ত। তাই নেক কাজের মাধ্যমে তোমাদের ভুলগুলো মুছে ফেলো। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা মন্দকে মুছে দেন একমাত্র নেককাজের মাধ্যমে।

তখন বিশিষ্ট সাহাবি মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা রা. দাঁড়িয়ে বলেন, আমি এর পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছি। হাকিম ইবনে জাবালা তার পাশেই ছিল। সে জোরপূর্বক তাকে বসিয়ে দেয় এবং গালমন্দ করে। তখন যায়দ ইবনে সাবেত আনসারি রা. বলেন, নিশ্চয় এ কথা কুরআনে রয়েছে।[১৫১]

তখন ফিতনাবাজদের মধ্যে মুহাম্মাদ ইবনে আবি মুরাইরা নামক এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে যায়দ রা.-কে টানাহ্যাঁচড়া ও গালমন্দ করে। এরপর জাহজাহ গিফারি নামক অপর এক ফিতনাবাজ দাঁড়িয়ে উসমান রা.-কে সম্বোধন করে কথা বলতে থাকে। তার দিকে এগিয়ে গিয়ে হাতের লাঠিটি কেড়ে নেয়, যে লাঠিতে ভর দিয়ে তিনি খুতবা দিতেন। এটি ছিল রাসুল ﷺ-এর লাঠি। তিনি এ লাঠিতে ভর দিয়ে খুতবা দিতেন। পরবর্তী সময়ে আবু বকর রা. ও উমর রা. এই লাঠি ব্যবহার

---

১৫১. *আল-কামিল ফিত তারিখ*, ২/৫৩১; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/১৯৭; *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১/১৯৩

করেছেন। কিন্তু জাহজাহ নামক নরাধম এই পবিত্র লাঠিটি ছিনিয়ে নিয়ে হাঁটু দিয়ে ভেঙে ফেলে এবং উসমান রা.-কে বলে, হে আহাম্মক, তুই এই মিম্বর থেকে নেমে যা।[১৫২]

এই প্রথম উসমান রা.-কে জনসম্মুখে গালি দেওয়া হলো। নরাধম জাহজাহের এই কথা বলার পর সব বিদ্রোহীরা দাঁড়িয়ে সাহাবিগণ এবং উসমান রা.-এর ওপর পাথর নিক্ষেপ করতে শুরু করে। উসমান রা. তখনও মিম্বরে অবস্থান করছিলেন। তার গায়ের জামা রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায়। কয়েকজন সাহাবি তাকে ধরে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসেন। এরপর তিনি বাড়ি থেকে আর বের হতে পারেননি। ফিতনাবাজরা তার বাড়ি অবরোধ করে রাখে।[১৫৩] মুসলিমদের নামাজ পড়ানোর দায়িত্ব আসে আবু হুরাইরা রা.-এর কাঁধে। তবে বেশ কিছু দুর্বল বর্ণনায় পাওয়া যায়, উসমান রা.-কে হত্যার আগ পর্যন্ত নামাজের ইমামতি করত গাফেকি। তবে বিশুদ্ধ মতে এ সময় আবু হুরাইরা রা. ইমামতি করেছেন।

উসমান রা. পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করে বুঝতে পারলেন যে, এসব বিদ্রোহীদের সঙ্গে নম্রতায় কোনো কাজ হবে না, তাই তিনি বিভিন্ন প্রান্তে নিয়োজিত গভর্নরদের কাছে চিঠি পাঠান। যেন তারা সৈন্যদল পাঠিয়ে উদ্ভূত জটিলতার সমাধান করেন। শামে নিযুক্ত মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রা., কুফায় নিযুক্ত আবু মুসা আশআরি রা. এবং বসরায় নিযুক্ত আবদুল্লাহ ইবনে আমের ইবনে কুরাইজ রা.-এর কাছে চিঠি প্রেরণ করা হয়। কিন্তু মদিনা থেকে এসব অঞ্চলের দূরত্ব আমরা সকলেই জানি। তাই চিঠি পৌঁছতে দেরি হওয়াটাই স্বাভাবিক। এ সময় পর্যন্ত উসমান রা.-কে হত্যা করার কথা কেউ বলেনি; বরং তারা তাকে শুধু বরখাস্ত করতে চেয়েছিল। হত্যার কথা তখনও কেউ প্রকাশ্যে আনেনি।

এ সময় উসমান রা. ঘরের জানালা দিয়ে বিদ্রোহীদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেন। তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমাদের মধ্যে কি আলি ইবনে আবু তালেব, যুবায়ের, তালহা, সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস নেই? এসব মহান সাহাবি লোকদের সঙ্গে সেখানেই ছিলেন। তারা উসমান রা.-কে রেখে ফিরে যেতে চাননি। তাই ওই সব মহান সাহাবি নিজেদের অবস্থান দেখিয়ে বলেন, আমরা এখানেই আছি।

---

১৫২. *তারিখুত তবারি*, ৪/৩৬৬; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/১৯৬

১৫৩. *তারিখুল ইসলাম*, ৩/১২১; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/১৯৭

উসমান রা. তাদের বলেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ তাআলার দোহাই দিয়ে বলছি, তোমরা জানো যে, রাসুল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি অমুক গোত্রের আস্তাবল ক্রয় করে দেবে, আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দেবেন। এরপর আমি তা ক্রয় করে রাসুল ﷺ-এর কাছে গিয়ে বলেছি, আমি তা ক্রয় করে নিয়েছি। তখন রাসুল ﷺ বললেন, তুমি তা আমাদের মসজিদের জন্য দিয়ে দাও, এর সওয়াব তুমি পাবে। তিনি কি এ কথা বলেননি?

সাহাবিগণ বললেন, হ্যাঁ, তিনি বলেছিলেন।

উসমান রা. বললেন, আমি তোমাদেরকে ওই আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, যিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তোমরা জানো যে, রাসুল ﷺ বলেছেন, বিরে রুমা (রুমা নামক কূপ) কে ক্রয় করে দেবে? আমি তা এত দিনার দিয়ে ক্রয় করে রাসুল ﷺ-কে বললাম, আমি তা ক্রয় করে নিয়েছি। তিনি বললেন, মুসলিমদের পানি পানের জন্য তা দান করে দাও, তুমি এর সওয়াব পাবে।

আমি কি তা করিনি?

সাহাবিগণ বললেন, হ্যাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি।

এরপর তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে ওই আল্লাহ তাআলার দোহাই দিয়ে বলছি, যিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই; তোমরা জানো যে, তাবুক যুদ্ধের বাহিনী প্রস্তুত করার দিনে রাসুল ﷺ লোকদের দিকে তাকিয়ে বললেন, যে ব্যক্তি তাদেরকে যুদ্ধসরঞ্জামাদি দিয়ে প্রস্তুত করে দেবে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন। আমি তাদেরকে যুদ্ধসরঞ্জামাদি দিয়েছি। এমনকি একটি লাগাম ও রশি পর্যন্তও বাদ রাখিনি। তোমরা কি তা দেখোনি?

সাহাবিগণ বললেন, হ্যাঁ,।

তিনি বললেন, আল্লাহ আপনি সাক্ষী থাকুন! আল্লাহ আপনি সাক্ষী থাকুন! আল্লাহ আপনি সাক্ষী থাকুন!

এরপর তিনি ফিরে যান।[১৫৪]

এরপর তিনি আরেকবার অবরুদ্ধ ঘর থেকে উঁকি দিয়ে বললেন, আমি তাদেরকে আল্লাহ তাআলার দোহাই দিয়ে বলছি, যারা রাসুল ﷺ-কে হেরা পাহাড়ে যাওয়ার দিন দেখেছেন। সেদিন পাহাড় কেঁপে উঠলে রাসুল ﷺ পাহাড়ে পা রেখে বলেন,

---

১৫৪. *সহিহ ইবনি হিব্বান*, ৬৯২০; *সহিহ ইবনি খুজাইমা*, ২৪৮৭

হেরা পাহাড়, শান্ত হও। তোমার ওপর একজন নবী, একজন সিদ্দিক এবং একজন শহিদ রয়েছেন। তখন আমি তার সঙ্গে ছিলাম। বেশ কয়েকজন সাহাবি তার এ কথার পক্ষে সাক্ষ্য দিলেন।

তিনি বলেন, আমি তাদেরকে আল্লাহ তাআলার শপথ দিয়ে বলছি, যারা বাইআতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণ করেছেন। সেদিন রাসুল ﷺ আমাকে মক্কার মুশরিকদের উদ্দেশে পাঠিয়েছিলেন। তখন তিনি নিজের এক হাতে আরেক হাত রেখে বলেছিলেন, এটি আমার হাত, অপরটি উসমানের হাত। এই বলে তিনি আমার পক্ষ থেকে বাইআত গ্রহণ করেছিলেন। বেশ কয়েকজন সাহাবি তার এ কথার পক্ষেও সাক্ষ্য দেন।

এরপর তিনি বলেন, আমি তাদেরকে আল্লাহ তাআলার শপথ দিয়ে বলছি, যারা রাসুল ﷺ-কে বলতে শুনেছে যে, যে ব্যক্তি আমাদের জন্য এই ঘরের মাধ্যমে মসজিদকে সম্প্রসারিত করবে, তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করা হবে।

তখন আমি নিজের সম্পদ থেকে সেই ঘর ক্রয় করে তা দিয়ে মসজিদ সম্প্রসারণ করেছি।

বেশ কয়েকজন সাহাবি তার এ কথার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করেন।

তিনি আবার বলেন, আমি তাদেরকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, তাবুক যুদ্ধের বাহিনী প্রস্তুত করতে যেদিন কষ্ট হচ্ছিল সেদিন যারা রাসুল ﷺ-কে বলতে শুনেছে, কে আজ এমন দান করবে, যা কবুল হবে?

সেদিন কি আমি আমার সম্পদ থেকে বাহিনীর অর্ধেক সদস্যের যুদ্ধসরঞ্জাম প্রস্তুত করে দিইনি?

বেশ কয়েকজন সাহাবি তার পক্ষে সাক্ষ্য দিলেন।

তিনি বললেন, আমি তাদেরকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলেছি, যারা রুমা কূপ থেকে মুসাফিরদের পানি ক্রয় করে পান করতে দেখেছে। আমি কি তা নিজের সম্পদ থেকে ক্রয় করে মুসাফিরদের জন্য উন্মুক্ত করে দিইনি?

তার এ কথার পক্ষেও অনেকে সাক্ষ্য দিলেন।[১৫৫]

এ পর্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যে শান্তিপূর্ণভাবেই আলাপ চলতে থাকে। কিন্তু এরই মধ্যে বিদ্রোহীদের থেকে হত্যার মত আসতে শুরু করে। তারা উসমান রা.-কে

---

১৫৫. *সুনানুন নাসায়ি*, ৩৬০৯; *আল-মুসনাদ লিল ইমাম আহমাদ*, ৪২০; *সুনানুদ দারাকুতনি*, ৪৪৪৩

বরখাস্ত অথবা হত্যার যেকোনো একটি বেছে নিতে বলে। উসমান রা. এবং অন্যান্য সাহাবিগণের জন্য এটি ছিল খুবই কঠিন পরিস্থিতি।

সাহাবিগণের অবস্থান

উসমান রা.-এর অবরোধের সময় সাহাবিগণের অবস্থান সম্পর্কে অনেক মিথ্যা ও বানোয়াট বর্ণনা রয়েছে। সেসব বর্ণনায় বলা হয়েছে, সাহাবিগণ এই কঠিন বিপদের সময় উসমান রা.-কে ছেড়ে গিয়েছিলেন। তার পক্ষে প্রতিরোধ করেননি। কারণ, তারা উসমান রা.-এর নীতিতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। সাহাবিগণ সম্পর্কে এটি খুবই গুরুতর একটি অপবাদ।

ফিতনার প্রাথমিক পর্যায়ে সাহাবিগণ উসমান রা.-এর কাছে এসেছিলেন। তাদের মধ্যে আলি রা., তালহা রা., যুবায়ের রা. এবং সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা. প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবি ছিলেন। কিন্তু উসমান রা. চাচ্ছিলেন না, তারা মদিনা থেকে অস্ত্রের মাধ্যমে বিদ্রোহীদের সরিয়ে দিক। তিনি চেয়েছিলেন এই সংকট রক্তপাতহীন সমাধান করতে।

পরিস্থিতি গুরুতর আকার ধারণ করার পর যুবায়ের ইবনুল আওয়াম রা. উসমান রা.-এর কাছে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, আমি আপনার জন্য বনু আমর ইবনে আউফকে সংগঠিত করতে পারব। এটি ছিল মদিনা থেকে কয়েক মাইল দূরত্বে অবস্থিত অনেক বড় একটি গোত্র।

তখন উসমান রা. জবাব দিয়েছিলেন, যদি এমনটি সম্ভব হয় তবে তাই করুন।

তখন উসমান রা. চিন্তিত মদিনাবাসীদের নিরাপত্তা নিয়ে। বিদ্রোহীদের তুলনায় সংখ্যায় তারা খুবই কম। যদি দুই পক্ষে যুদ্ধ বেধে যায়, তাহলে সাহাবিগণের রক্তপাত হবে। যদি বিদ্রোহীদের পরাজিত করতে সক্ষম বাহিনীর ব্যবস্থা হয় তবে তিনি শক্তির মাধ্যমে বিদ্রোহীদের দমনে সম্মত ছিলেন। তিনি তার প্রাণ উৎসর্গ করে দিতে প্রস্তুত ছিলেন। তবে ওই সব বিদ্রোহীদের হাতে মদিনার সাহাবিগণের রক্তপাত হোক, তা কখনো কামনা করেননি। নিশ্চয় এমন বীরত্বের পুনরাবৃত্তি আর কখনো হবে না। একজন নেতা তার জাতির জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করে দেবেন, এমন দৃশ্য খুবই বিরল; বরং আমরা দেখি যে, অনেক নেতা নিজেদের বিলাসিতার জন্য সেনাবাহিনী এবং সাধারণ মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছেন। কিন্তু সমগ্র ইসলামি সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন যিনি, তিনি মদিনাবাসীদের নিরাপত্তার স্বার্থে নিজের জীবনকেই উৎসর্গ করে দিচ্ছেন।

যায়দ ইবনে সাবেত আনসারি রা. দাঁড়িয়ে উসমান রা.-কে বলেছিলেন, নিশ্চয় আনসাররা আপনার দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। তারা বলছে, আপনি চাইলে আমরা আনসারুল্লাহ তথা আল্লাহর সহযোগী হয়ে দাঁড়িয়ে যাব। এ কথা তিনি দুইবার বললেন। তখন উসমান রা. বললেন, আমার এর কোনো প্রয়োজন নেই। তোমরা নিজেদের হাত গুটিয়ে নাও।[১৫৬]

হজের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার আগে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. উসমান রা.-এর কাছে এসে বলেছিলেন, আপনার দরজায় দাঁড়িয়ে আপনাকে নিরাপত্তা দেওয়া আমার জন্য হজ থেকেও উত্তম। উসমান রা. তাকে বলেছিলেন, আমার এর কোনো প্রয়োজন নেই।

এই বলে তিনি তাকে হজ কাফেলার আমির নিযুক্ত করে হজে যাওয়ার নির্দেশ দেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. তার সেই নির্দেশ পালন করেন।

একদল সাহাবিকে সঙ্গে নিয়ে উসমান রা-এর বাড়িতে যান আবু হুরাইরা রা.। তখন আবু হুরাইরা রা. বলেছিলেন, আমি আমার দুই কানে রাসুল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমার মৃত্যুর পর ফিতনা এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তাহলে কীভাবে তা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে? তিনি বললেন, শাসক এবং তার অনুগত দলের মাধ্যমে। এ বলে তিনি উসমান রা.-এর দিকে ইঙ্গিত করেন।

উপস্থিত সাহাবিগণ উসমান রা.-কে বললেন, আপনি আমাদের অনুমতি দিন। আমরা তাদের সঙ্গে লড়াই করব। আমরা তো স্বচক্ষে সবই দেখতে পাচ্ছি। উসমান রা. অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলে দিলেন, যাদের ওপর আমার অনুগত্য করা আবশ্যক, তাদের প্রত্যেকের প্রতি আমার জোর নির্দেশ হচ্ছে, তারা যেন লড়াই না করে।[১৫৭]

আবু হুরাইরা রা. বললেন, আমিরুল মুমিনিন, এখন আপনার সঙ্গে থেকে লড়াই করাই উত্তম। এই মুহূর্তে এটিই জিহাদ। উসমান রা. তাকে বললেন, আমি আপনাকে চলে যাওয়ার জন্য জোর নির্দেশ দিচ্ছি। আবু হুরাইরা রা. সেখান থেকে চলে এলেন।

---

১৫৬. *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, ৩৯/৩৯৬; *তারিখু খলিফা ইবনি খয়্যাত*, ১/১৭৩

১৫৭. *শারহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ*, ৭/১৪৩

বুঝাই যাচ্ছে পরিস্থিতি কতটা নাজুক ছিল তখন। উসমান রা. নিশ্চিতভাবেই জানতেন যে, এই অল্পসংখ্যক সাহাবি বিদ্রোহীদের সামনে টিকতে পারবেন না। তাই তিনি শাম, বসরা এবং কুফা থেকে আগত বাহিনীর সাহায্যের অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু দূরত্ব বেশি থাকায় তাদের পৌঁছতে বিলম্ব হয়। এদিকে যুবায়ের রা.-এর গোত্র বনু আমর ইবনুল আউফের সংঘবদ্ধ হওয়ার অপেক্ষাও করছিলেন। কিন্তু দুঃখজনকভাবে তারা সংঘবদ্ধ হতে পারেনি।

উসমান রা. দেখতেই পাচ্ছিলেন, মদিনায় বিদ্যমান সাহাবিগণ কিছুতেই বিদ্রোহীদের দমনে যথেষ্ট নন। তাই লড়াইয়ের কথা বলার কোনো অর্থই হয় না।

এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে, উসমান ইবনে আফফান রা. পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করতেন যে, তিনি শহিদ হয়েই আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। বিশ্বাস করতেন, নিশ্চয় তিনি কোনো বিপদ অথবা ফিতনার শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ করবেন। ফলে তিনি অচিরেই জান্নাতে প্রবেশ করবেন। তিনি রাসুল ﷺ থেকে নিজ কানে এ ব্যাপারে বলতে শুনেছিলেন। রাসুল ﷺ-এর ব্যাপারে কুরআনের সাক্ষ্য হচ্ছে,

﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ﴾

তিনি মনগড়া কিছু বলেন না। [সুরা নাজম : ৩]

*সহিহ বুখারি*তে কাতাদা রহ.-এর সূত্রে বর্ণিত আছে, আনাস ইবনে মালেক রা. তাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, একবার রাসুল ﷺ, আবু বকর রা., উমর রা. এবং উসমান রা. উহুদ পাহাড়ে উঠলেন। তখন পাহাড় তাদেরকে নিয়ে কেঁপে উঠলে রাসুল ﷺ বলেন, উহুদ, তুমি স্থির হও। নিশ্চয় তোমার ওপর রয়েছে একজন নবী, একজন সিদ্দিক ও দুজন শহিদ।[১৫৮]

সহিহ বুখারিতে আবু মুসা আশআরি রা.-এর সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মদিনার কোনো এক বাগানে আমি একবার রাসুল ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তখন একজন লোক এসে ভেতরে আসার অনুমতি প্রার্থনা করেন। রাসুল ﷺ বলেন, দরজা খুলে দাও এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। আমি দরজা খুলে দেখলাম আবু বকর রা. দাঁড়িয়ে আছেন। রাসুল ﷺ-এর কাছ থেকে শোনা সুসংবাদ আমি তাকে শুনিয়ে দিলাম। তিনি আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করলেন।

---

১৫৮. *সহিহ বুখারি*, ৩৬৮৯; *সহিহ ইবনি হিব্বান*, ৬৮৬৫

এরপর আরেক ব্যক্তি এসে অনুমতি চাইলেন। রাসুল ﷺ এবারও বললেন, দরজা খুলে দাও এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। আমি দরজা খুলে দেখলাম উমর রা. দাঁড়িয়ে আছেন। তাকে আমি রাসুল ﷺ-এর কাছ থেকে শোনা সুসংবাদ শুনিয়ে দিলাম। তিনি আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করলেন। এরপর আরেক ব্যক্তি এসে অনুমতি চাইলেন। রাসুল ﷺ এবার বললেন, দরজা খুলে দাও এবং তাকে আসন্ন বিপদ-সহ জান্নাতের সুসংবাদ দাও। এবার দেখলাম উসমান রা. দাঁড়িয়ে আছেন। রাসুল ﷺ যা বলেছেন আমি তাকে শুনালাম। তিনি আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করে বললেন, আল্লাহ তাআলাই একমাত্র সহায়।[১৫৯]

উসমান রা. মনে করতেন যে, যেহেতু তার জীবন উৎসর্গই এই ফিতনার সমাধান; তাই তিনি ব্যক্তিগতভাবে পরিস্থিতি সমাধানের জন্য এটিকেই অধিক উপযুক্ত মনে করেছেন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, এই ফিতনার কারণেই তার জীবননাশ হবে। তাই মদিনার ৭০০ মানুষের নিরাপত্তার স্বার্থে তার জীবন বিসর্জন দিতে কোনো সমস্যা নেই। উসমান রা.-এর মৃত্যুর পর তারাই হবেন উম্মাহর কাণ্ডারি। এরপর সেই পাপিষ্ঠ বিদ্রোহীরা আর ক্ষমতায় বসতে সক্ষম হবে না। বিদ্রোহীরা তখন পর্যন্ত উসমান রা.-এর স্থলে আলি রা., তালহা রা. ও যুবায়ের রা.-এর মধ্যে যেকোনো একজনকে চাচ্ছিল। তারা সকলেই ছিলেন উত্তম এবং যোগ্য। জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ১০জন সাহাবির অন্তর্ভুক্ত। তাই তারা লড়াই করে নিহত হওয়া এবং গুটিকয়েক বিদ্রোহীর হাতে শাসনক্ষমতা চলে যাওয়ার চেয়ে তাদের জীবিত থাকাই হবে সবচেয়ে উত্তম।

এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, উসমান রা. ছিলেন সকল মুসলিমের খলিফা। প্রত্যেক মুসলিমের জন্য তার আনুগত্য করা আবশ্যক। তাই তিনি যদি তাদের বলেন, যাদের ওপর আমার অনুসরণ আবশ্যক, তাদের আমি আল্লাহর নামের শপথ দিয়ে নির্দেশ দিচ্ছি, তারা যেন লড়াই না করে। এ কথার পর যদি কেউ লড়াইয়ে লিপ্ত হয় তাহলে তা হবে উসমান রা.-এর নির্দেশের অবাধ্যতা। উসমান রা. তাদেরকে খুবই জটিল এক বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন। কেউ যদি তার পক্ষে লড়াই করে তবে তা হবে অবাধ্যতা। আর অবাধ্যতা করা মানে বিদ্রোহ করা। উসমান রা. এই মত পোষণ করতেন।

---

১৫৯. *সহিহ বুখারি*, ৩৬৯৩; *সহিহ মুসলিম*, ২৪০৩

সাহাবিগণ ইসলাম ধর্মে উসমান রা.-এর মর্যাদা এবং শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অবগত ছিলেন। নিশ্চিতভাবেই তারা জানতেন উসমান রা.-এর রয়েছে প্রজ্ঞাপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা। যদি কখনো তিনি এমন কোনো সিদ্ধান্ত নেন যা তাদের কাছে বোধগম্য নয় অথবা তাদের কাছে বাহ্যিকভাবে ভুল মনে হয়, তবুও এ ক্ষেত্রে আনুগত্য আবশ্যক। যদি না এতে আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা হয়। কারণ, তিনি হচ্ছেন খলিফা।

জঙ্গে জামালের পর আলি ইবনে আবু তালেব রা. এবং সাইদ খুজায়ি নামক এক তাবেয়ির মধ্যকার কথোপকথন আমাদের কাছে বর্ণিত হয়েছে।

সাইদ রহ. আলি রা.-কে বললেন, উসমান রা. এবং আপনার মধ্যকার একটি বিষয় নিয়ে আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই।

আলি রা. বললেন, তোমার যা ইচ্ছা হয় জিজ্ঞাসা করো।

সাইদ রহ. বললেন, যখন উসমান রা.-কে হত্যা করা হচ্ছিল তখন কোন ঘর আপনাকে আটকে রেখেছিল যে, তাকে সাহায্য করতে পারলেন না?

আলি রা. জবাব দিলেন, উসমান রা. ছিলেন আমাদের নেতা। তিনিই আমাদের লড়াই করতে নিষেধ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যে ব্যক্তি তরবারি উন্মুক্ত করবে সে আমার অনুসারী নয়। যদি এরপরও আমরা লড়াই করতাম তবে তার অবাধ্যতা হতো।

সাইদ রহ. বললেন, তিনি যখন আত্মসমর্পণ করেছিলেন তখন কীসের ওপর ভরসা করেছিলেন?

আলি রা. জবাব দিলেন, আদম আ.-এর ছেলে যার ওপর ভরসা করে তার ভাইকে বলেছিলেন,

﴿لَئِنۢ بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقۡتُلَنِي مَآ أَنَا۠ بِبَاسِطٖ يَدِيَ إِلَيۡكَ لِأَقۡتُلَكَۖ إِنِّيٓ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلۡعَٰلَمِينَ﴾

তুমি যদি হত্যা করার জন্য আমার দিকে হাত বাড়াও, তাহলে তোমাকে হত্যা করার জন্য আমি হাত বাড়াব না। নিশ্চয় আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলাকে ভয় করি।

[সুরা মায়েদা : ২৮]

এ কথা শুনে সাইদ খুজায়ি রহ. নীরব হয়ে গেলেন।[১৬০]

কেউ কেউ প্রশ্ন করে থাকে যে, তাহলে উসমান রা. আলি রা., তালহা রা. অথবা যুবায়ের রা.-এর মধ্যে কারও হাতে ক্ষমতা দিয়ে সরে গেলেন না কেন? তাদের সকলেই তো ছিলেন বিশিষ্ট সাহাবি?

জবাবে বলব, তিনি যদি এমনটি করতেন তবে তা হতো শরিয়ত ও রাসুল ﷺ-এর হাদিসের স্পষ্ট বিরোধিতা। উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেন, হে উসমান, যদি আল্লাহ তাআলা কখনো তোমার হাতে এই ক্ষমতা সঁপে দেন, অতঃপর মুনাফেকরা তোমার শরীর থেকে আল্লাহপ্রদত্ত এই সম্মানের পোশাক খুলে ফেলতে চায়, তবে তুমি খুলবে না। এ কথা তিনি তিনবার বলেন। এই হাদিসের মাধ্যমে স্পষ্টভাবেই বোঝা যায়, রাসুল ﷺ তাকে ক্ষমতা ধরে রাখার এবং ওই সকল মুনাফেকফের কথা না মানার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাই ক্ষমতা থেকে নেমে যাওয়া হতো রাসুল ﷺ-এর হাদিসের বিরোধিতা। ইমাম তিরমিজি রহ., ইবনে মাজাহ রহ., আহমাদ রহ. এবং হাকিম রহ. প্রমুখ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।[১৬১]

কোনো কোনো সাহাবি এই বিশাল ফিতনার বিষয়টি নিয়ে খুবই দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছিলেন; যে ফিতনার কথা ভাবলে অতি সহনশীল ব্যক্তিও পেরেশান হয়ে পড়ে। তখন মুররা ইবনে কাব রা. তাদের মনে করিয়ে দিচ্ছিলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নোক্ত হাদিসটি।

ইমাম তিরমিজি রহ. নিজ সূত্রে আবুল আশআস সানআনি রহ. থেকে বর্ণনা করেন, শামে কয়েকজন বক্তা দাঁড়িয়ে গেলেন। তাদের মধ্যে রাসুল ﷺ-এর কয়েকজন সাহাবিও ছিলেন। সর্বশেষ যে ব্যক্তিটি দাঁড়ালেন তিনি হলেন মুররা ইবনে কাব রা.। তিনি বললেন, আমি যদি রাসুল ﷺ থেকে এই হাদিসটি না শুনতাম তাহলে দাঁড়াতাম না। তিনি ফিতনা প্রসঙ্গে কথা বলেন যে, তা অতি নিকটবর্তী। তখন কাপড় দিয়ে আবৃত এক ব্যক্তি পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন। রাসুল ﷺ তাকে দেখে বলেন, এই ব্যক্তি সেদিন সঠিক পথে থাকবে। আমি তার কাছে গিয়ে দেখলাম তিনি হলেন উসমান ইবনে

---

১৬০. *আল-ইকদুল ফারিদ*, ৫/৫৩

১৬১. *সুনানু ইবনি মাজাহ*, ১১২; *আল-মুসনাদ লিল ইমাম আহমাদ*, ২৪৫৬৬; *সুনানুত তিরমিজি*, ৩৭০৫; *আল-মুসতাদরাক লিল হাকিম*, ৪৫৪৪

আফফান রা.। মুররা ইবনে কাব রা. বলেন, আমি তাকে নিয়ে রাসুল ﷺ-এর কাছে এসে বললাম, ইনিই? তিনি বললেন, হ্যাঁ।[১৬২]

ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, এই হাদিসটি সহিহ। ইমাম ইবনে মাজাহ রহ.-ও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং শায়খ আলবানি রহ. হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।

সুতরাং বোঝা গেল যে, যদিও তখন মতপার্থক্য ছিল, তবে উসমান রা.-ই ছিলেন সঠিক। যা রাসুল ﷺ-এর হাদিসের সাক্ষ্য অনুযায়ী প্রমাণিত। আর তিনি কোনো মনগড়া কথা বলেন না।

সাহাবিগণের জন্য এ ছিল খুবই জটিল এক পরিস্থিতি। কীভাবে তারা পারবেন উসমান রা.-কে একা ছেড়ে দিতে? অথচ রাসুল ﷺ, আবু বকর রা. এবং উমর রা.-এর ইন্তেকালের পর তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। রাসুল ﷺ নিজের দুই মেয়েকে তার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। ওই সময় দুঃখকষ্টে সাহাবিগণের হৃদয় ছেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তবুও তারা উসমান রা.-এর পক্ষে কিছুই করতে পারছেন না। যেন তার অবাধ্যতা না হয়। এরপর সাহাবিগণ নিজ নিজ ঘরে ফিরে আসেন এবং বিষয়টি এভাবে ব্যাখ্যা করেন যে, 'তিনি তো আমাদেরকে আল্লাহর নামের শপথ দিয়ে নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন তার পক্ষে প্রতিরোধ না করি। কিন্তু তিনি তো আমাদের পুত্রদেরকে শপথ দিয়ে কোনো নির্দেশ দেননি।

তখন আলি রা. পাঠিয়ে দেন হাসান রা. ও হুসাইন রা.-কে। যারা দাবি করে, উসমান রা.-এর নীতিতে আলি রা. অসন্তুষ্ট থাকায় তার থেকে সরে গিয়েছেন, তাদের বিপক্ষে এটি খুবই শক্তিশালী দলিল। এই দেখুন, তিনি উসমান রা. এর পক্ষে প্রতিরোধ করার জন্য নিজের কলিজার টুকরা দুই ছেলেকে পাঠিয়ে দিলেন। যুবায়ের ইবনুল আওয়াম রা. পাঠিয়ে দিলেন আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা.-কে। তালহা রা. পাঠিয়ে দিলেন ছেলে মুহাম্মাদ ইবনে তালহা রা.-কে। এভাবে অনেক সাহাবিই এমনটি করেছেন। সাহাবিগণের পুত্রগণ উসমান রা.-এর বাড়িতে এসে সমবেত হন এবং আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা.-কে তাদের আমির নির্ধারণ করে উসমান রা.-এর পক্ষে প্রতিরোধ শুরু করেন।

---

১৬২. *সুনানুত তিরমিজি*, ৩৭০৪

এ সময় আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. উসমান রা.-এর কাছে যান। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-ও উসমান রা.-এর মতো ওই সব বিদ্রোহীদের সঙ্গে সংঘর্ষে না জড়ানোর পক্ষে ছিলেন; এতে যদিও উসমান রা.-কে নিহত হতে হয়। উসমান রা. তাকে বললেন, দেখো এসব লোকের দিকে। তারা আমাকে বলছে, আপনি ক্ষমতা থেকে সরে যান, নচেৎ আমরা আপনাকে হত্যা করব।

তখন আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, আপনি কি দুনিয়ায় চিরস্থায়ী হতে পারবেন?

উসমান রা. বললেন, না।

ইবনে উমর রা. বললেন, তারা কি আপনাকে হত্যার চেয়ে বেশি কিছু করতে পারবে?

উসমান রা. বললেন, না।

ইবনে উমর রা. বললেন, তারা কি জান্নাত অথবা জাহান্নাম দিতে পারবে?

উসমান রা. বললেন, না।

তখন ইবনে উমর রা. বললেন, তাহলে আল্লাহ আপনাকে যে সম্মানের পোশাক পরিয়েছেন তা আপনি খুলবেন না। আপনি যদি এমনটি করেন তবে এটি রীতি হয়ে দাঁড়াবে। যখনই কোনো জাতি তাদের খলিফাকে অপছন্দ করবে, তাকে সরিয়ে দেবে অথবা হত্যা করবে।[১৬৩]

বিদ্রোহীরা যখন প্রকাশ্যে উসমান রা.-কে ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়া অথবা মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়ার যেকোনো একটি বেছে নিতে বলে, তখন তিনি ঘরের জানালা দিয়ে তাদের কাছে বলেন, তোমরা আমাকে কী অপরাধে হত্যা করবে? নিশ্চয় আমি রাসুল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনটি অপরাধের কারণে কারও রক্ত বৈধ হবে। যে ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তাকে পাথর নিক্ষেপ করে মারা হবে। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে, তার কাছ থেকে কিসাস[১৬৪] গ্রহণ করা হবে। যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পর ধর্মত্যাগ করে, তাকে হত্যা করা হবে।

---

১৬৩. *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, ৩৯/৩৫৮; *তারিখু খলিফা ইবনি খইয়াত*, ১/১৭০

১৬৪. **কিসাস :** হত্যার বিনিময়ে হত্যা।-সম্পাদক

আল্লাহর শপথ! আমি কখনো ব্যভিচারে লিপ্ত হইনি। জাহেলি যুগেও না, ইসলামি যুগেও না। আমি কাউকে হত্যাও করিনি যে, আমার কাছ থেকে কিসাস গ্রহণ করবে। আর ইসলাম গ্রহণ করার পর আমি কখনো ধর্মত্যাগ করিনি। নিশ্চয় আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই এবং নিশ্চয় মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ তাআলার বান্দা এবং রাসুল। তাহলে কী অপরাধে তোমরা আমাকে হত্যা করতে চাও?[১৬৫]

ইমাম নাসায়ি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। প্রায় কাছাকাছি শব্দে একটি বর্ণনা *সুনানু আবি দাউদ* এবং *সুনানুত তিরমিজি*তেও এসেছে। ইমাম তিরমিজি রহ. হাদিসটিকে হাসান[১৬৬] বলেছেন।

বিদ্রোহীরা ফিরে যায়নি; বরং প্রবৃত্তি ও শয়তানের প্রবঞ্চনা তাদের অন্তরে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। আরেকদিন উসমান রা. তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি, যদি তোমরা আমাকে হত্যা কর তাহলে এরপর কখনোই তোমরা একে অপরকে ভালোবাসতে পারবে না। একসঙ্গে কখনোই সম্প্রীতি রক্ষা করতে পারবে না। একসঙ্গে কখনোই শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে পারবে না।[১৬৭]

উসমান রা. সেদিন সত্যিই বলেছিলেন। তাকে হত্যা করার পর থেকেই খুলে যায় ফিতনার দুয়ার। সেই সময় থেকে ফিতনার যে চক্র শুরু হয়েছে, তার আবর্তে আজও ঘুরপাক খাচ্ছে মুসলিম উম্মাহ।

২৫ হিজরির ১৫ থেকে ১৮ জিলকদ। এই সময়টাতে বিদ্রোহীরা নতুন পদক্ষেপ নিতে শুরু করে। বন্ধ করে দেয় উসমান রা.-এর খাবার ও পানীয়। এ কথা জানতে পেরে উসমান রা. ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন এবং তাদের উদ্দেশ্য করে বলেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, তোমরা কি জানো, রাসুল ﷺ যখন মদিনায় এলেন, তখন মুসল্লিদের জন্য মসজিদের জায়গা সংকীর্ণ হয়ে গেল। তিনি বললেন, কে তার নিজস্ব সম্পদ থেকে এই জায়গাটি ক্রয় করে সকল মুসলিমের জন্য উন্মুক্ত করে দেবে? সে

---

১৬৫. *সুনানুন নাসায়ি*, ৪০১৯; *সুনানুত তিরমিজি*, ২১৫৮; *সুনানু আবি দাউদ*, ৪৫০২; *সুনানু ইবনি মাজাহ*, ২৫৩৩

১৬৬. **হাসান হাদিস :** সহিহ হাদিসের মতোই নির্ভরযোগ্য হাদিসের একটি প্রকার এবং নবীজি ﷺ থেকে প্রমাণিত। এ প্রকারের হাদিস দ্বারাও শরিয়তের সব ধরনের বিধিবিধান সাব্যস্ত হয়।-সম্পাদক

১৬৭. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/২০২

জান্নাতে এর চেয়ে উত্তম জায়গা লাভ করবে। তখন আমি নিজের সম্পদ থেকে সেই জমি ক্রয় করে মুসলিমদের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছি। অথচ তোমরা সেই মসজিদেই আমাকে দুই রাকাত নামাজ আদায় করতে দিচ্ছ না?

আমি তোমাদের আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, তোমরা কি জানো, রাসুল ﷺ যখন মদিনায় এলেন, তখন এখানে বিরে রুমা ব্যতীত অন্য কোনো মিষ্টি পানির কূপ ছিল না। রাসুল ﷺ বলেছিলেন, কে তার নিজস্ব সম্পদ থেকে এই কূপ ক্রয় করে মুসলিমদের জন্য উন্মুক্ত করে দেবে? তাতে তার ততটুকু অধিকারই থাকবে, যতটুকু অন্যান্য মুসলিমের থাকবে এবং সে জান্নাতে এর চেয়ে উত্তম বিনিময় লাভ করবে।

তখন আমি আমার ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে সেই কূপ ক্রয় করে মুসলিমদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছি। আর তোমরা সেই কূপ থেকে আমাকে পানি পান করতে দিচ্ছ না?

তখন তিনি বললেন, তোমরা কি জানো, যেদিন মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধের সরঞ্জাম ছিল না, সেদিন আমি যুদ্ধের সরঞ্জামের ব্যবস্থা করেছিলাম?

তারা বলল, হ্যাঁ।

উসমান রা. বললেন, হে আল্লাহ, আপনি সাক্ষী থাকুন।

এ কথা বলে তিনি পুনরায় নিজের ঘরে চলে যান। ইমাম তিরমিজি রহ. ও নাসায়ি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।[১৬৮]

কোনো কোনো সাহাবি বিদ্রোহীদের এই নির্দয়তায় খুবই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। কীভাবে তারা মুসলিমদের সম্মানিত খলিফার খাবার এবং পানীয় বন্ধ করে দিতে পারে? তখন আলি রা. নিজের মশকে করে পানি নিয়ে খচ্চরের পিঠে উঠে বসেন এবং বিদ্রোহীদের কাতারের মাঝ দিয়ে ঢুকে এগোতে থাকেন। তারা আলি রা.-কে নানা কটু কথা শোনাতে থাকে। তিনি তাদের ধমক দিয়ে এ থেকে নিষেধ করতে থাকেন। এমনকি তিনি তাদের বলেন, আল্লাহর শপথ! নিশ্চয় পারসিক এবং রোমকরাও তাদের কোনো বন্দির সঙ্গে এমনটি করে না, যেমনটি তোমরা করছ। আল্লাহর শপথ! পারসিক এবং রোমকরাও তাদের বন্দিদের খাবার এবং পানীয় প্রদান করে।[১৬৯]

---

১৬৮. *সুনানুত তিরমিজি*, ৩৭০৩; *সুনানুন নাসায়ি*, ৩৬০৮

১৬৯. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/২০৯

উম্মুল মুমিনিন উম্মে হাবিবা রা. তার কাপড়ে পানি নিয়ে লুকিয়ে রাখেন। এরপর খচ্চরের পিঠে চড়ে বের হন উসমান রা.-কে পানি পান করানোর জন্য। তখন বিদ্রোহীরা তাকে ঘিরে ধরে এবং বলে, আপনি কেন এসেছেন? তিনি বলেন, উসমান রা.-এর কাছে এতিম ও বিধবাদের জন্য বনু উমাইয়ার পক্ষ থেকে অসিয়তকৃত সম্পদ রয়েছে। তাই আমি তাকে এ কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাচ্ছি। বিদ্রোহীরা উম্মে হাবিবা রা.-এর এ কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাকে ধাক্কা দেয়। তখন পানি পড়ে যায়। তারা খচ্চরের লাগাম কেটে দেয়, ফলে উম্মে হাবিবা রা. খচ্চরের পিঠ থেকে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হন। অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী, তিনি পড়ে যান এবং নিহত হওয়ার উপক্রম হন। যদি একদল লোক এসে তাকে উদ্ধার না করত তবে ওই নরাধমরা তাকে মেরেই ফেলত।[১৭০]

ওই সব পাপিষ্ঠদের মনে শয়তান শক্তভাবে বাসা বেঁধে নিয়েছিল। তাই তারা উসমান রা.-এর কাছে পানি পর্যন্তও পৌঁছতে দেয়নি। অবরোধের প্রথম দুদিন কেবল প্রতিবেশী আমর ইবনুল হিজাম রা.-এর ঘর থেকে তার কাছে পানি পৌঁছত। তৃতীয় দিন থেকে তারা সেই পথও বন্ধ করে দেয়। সেদিনটি ছিল ৩৫ হিজরির ১৭ জিলহজ।

এ দিন বিদ্রোহীরা জানতে পারে যে, শাম, বসরা এবং কুফা থেকে আগত সৈন্যদল মদিনার কাছাকাছি চলে এসেছে। ফলে তারা তটস্থ হয়ে পড়ে। আগত সেনাবাহিনী ছিল বিশাল। মুআবিয়া রা. হাবিব ইবনে মাসলামা রা.-এর নেতৃত্বে পাঠিয়েছিলেন শামের সৈন্যদল। কুফার বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন কাকা ইবনে আমর তামিমি রা.। বসরার বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন মুজাশি ইবনে মাসউদ রা.। মিশর থেকে আগত বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন মুআবিয়া ইবনে হুবাইশ রহ.।

এ সময় গভর্নরগণ নিজেদের শাসিত অঞ্চলেই অবস্থান করেন। যেন তাদের অনুপস্থিতিতে কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয়।

বিদ্রোহীরা এ সংবাদ জানতে পেরে এই বাহিনী মদিনায় পৌঁছার পূর্বেই উসমান রা.-কে শেষ করে দেওয়ার দৃঢ়সংকল্প করে।

---

১৭০. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/২০৯

উসমান রা.-এর হত্যাকাণ্ড ও স্থায়ী ফিতনার সূচনা

৩৫ হিজরির জিলহজ মাসের ১৭ তারিখ বৃহস্পতিবার। উসমান রা.-এর সকাল হলো রোজাদার অবস্থায়। সাহাবিগণ তার কাছে পানি পৌঁছানোর জন্য চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু বারবার ব্যর্থতাই তাদের সঙ্গী হচ্ছিল। এভাবেই সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। উসমান রা.-এর ঘরে এমন কোনো খাবার অথবা পানীয় ছিল না, যা দিয়ে তিনি এবং পরিবারের সদস্যগণ ইফতার করবেন। বিনা ইফতারেই কেটে যায় রাতের বাকি অংশ। জুটেনি এক লোকমা খাবার বা এক ফোঁটা পানি। অবশ্য সাহরির সময় তার স্ত্রী নায়েলা বিনতে ফারাফিসা রহ. গোপনে পাশের বাড়ি থেকে কিছু পানি সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। পানি এনে উসমান রা.-কে বললেন, এই নিন, ইফতার করুন। তখন উসমান রা. জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলেন সুবহে সাদিক হয়ে গিয়েছে। তাই তিনি বললেন, আমি মান্নত করেছি আমার আজকের সকাল হবে রোজাদার অবস্থায়।

তখন নায়েলা রহ. বললেন, আপনি খাবার খেলেন কোথা থেকে? আমি তো কাউকেই দেখিনি আপনার কাছে খাবার কিংবা পানীয় নিয়ে আসতে।

উসমান রা. বললেন, আমি দেখেছি রাসুল সাল্লাল্লাহু এই ছাদ থেকে আমাকে উঁকি দিয়ে দেখছেন। তার সঙ্গে ছিল এক বালতি পানি। বললেন, হে উসমান, পান করো। আমি তৃপ্তির সঙ্গে পান করলাম। তিনি বললেন, আরও পান করো। আমি এবার পেট পুরে পানি পান করলাম। এরপর তিনি বললেন, এই যে, এরা তোমাকে অপছন্দ করে, তুমি যদি তাদের সঙ্গে লড়াই করো, তবে বিজয়ী হবে। আর যদি তাদের ছেড়ে দাও তবে তোমার ইফতার হবে আমার সঙ্গে।[১৭১] উসমান রা. রাসুল ﷺ-এর সাক্ষাৎকেই বেছে নিলেন। তিনি ছিলেন এজন্য উদগ্রীব। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, অচিরেই তিনি শহিদ হয়ে আল্লাহ তাআলার সাক্ষাতে যাচ্ছেন। এ সুসংবাদ তিনি আগেই রাসুল ﷺ-এর কাছ থেকে পেয়েছিলেন।

---

[১৭১]. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/২০৫

৩৫ হিজরির ১৮ জিলকদ। জুমার দিন। এদিন সকালে সাহাবি কাসির ইবনে সালত রা. উসমান রা.-এর কাছে গিয়ে বললেন, হে আমিরুল মুমিনিন, আপনি বের হয়ে বাড়ির আঙিনায় বসুন। লোকেরা একটু আপনার চেহারা দেখুক। আপনি এমনটি করলে বিদ্রোহীরা ভয় পেয়ে যাবে। এমনটি বলেছিলেন উসমান রা.-এর ব্যক্তিত্বের প্রভাবের কারণে। তার বয়স ছিল তখন ৮২ বছরেরও বেশি।

উসমান রা. তখন বললেন, কাসির, গত রাতে আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি রাসুল ﷺ-এর কাছে গিয়েছি। আবু বকর রা. ও উমর রা. তাঁর সঙ্গেই আছেন। তিনি আমাকে বললেন, ফিরে যাও। আগামীকালই তুমি আমার সঙ্গে ইফতার করবে। এ কথা বলে উসমান রা. বললেন, আল্লাহর শপথ! আজকের সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বেই আমি আখেরাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।[১৭২]

কাসির ইবনে সালত রা. উসমান রা.-এর নির্দেশে বেরিয়ে আসেন। উসমান রা. তার জন্য পায়জামা আনতে বলেন। যেন তিনি তা পরিধান করতে পারেন। জাহেলি যুগে এবং ইসলাম আসার পরেও তিনি কখনো পায়জামা পরিধান করেননি। তবে সেদিন পরিধান করার কারণ ছিল। যদি তাকে হত্যা করা হয় তখন হয়তো তার সতর খুলে যেতে পারে।[১৭৩] তার লজ্জাশীলতার কথা কারও অজানা নয়। তিনি পায়জামা পরিধান করেন এবং সামনে পবিত্র কুরআন খুলে তেলাওয়াতে মগ্ন হয়ে যান। শেষবারের মতো সাহাবিগণের পুত্রগণ তার কাছে এসে তার পক্ষে প্রতিরোধ করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তখন উসমান রা. তাদেরকে শপথ করে বলেন, যাদের ওপর তার (আনুগত্য প্রাপ্তির) অধিকার রয়েছে, তাদের প্রত্যেকেই যেন নিজেদের হাত গুটিয়ে নিয়ে নিজ নিজ গৃহে চলে যায়। এরপর তিনি তার দাসদের উদ্দেশ্যে বলেন, যে তার তরবারি কোষবদ্ধ রাখবে সে মুক্ত। এভাবে তিনি তার দাসদেরকেও মুক্ত করে দিলেন।[১৭৪] এরপর তিনি বললেন, আদম আ.-এর পুত্র যে অবস্থানে অনড় ছিলেন; তিনিও সেই অবস্থানে অনড় থাকতে চান। আদম আ.-এর পুত্র বলেছিলেন,

---

১৭২. *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, ৩৯/৩৮৫
১৭৩. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/২০৫
১৭৪. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/২০৩

﴿لَئِنۢ بَسَطتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِى مَآ أَنَا۠ بِبَاسِطٍ يَدِىَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ۖ إِنِّىٓ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَٰلَمِينَ ۝ إِنِّىٓ أُرِيدُ أَن تَبُوٓأَ بِإِثْمِى وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلنَّارِ ۚ وَذَٰلِكَ جَزَٰٓؤُا۟ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾

তুমি যদি হত্যা করার জন্য আমার দিকে হাত বাড়াও, তাহলে তোমাকে হত্যা করার জন্য আমি হাত বাড়াব না। নিশ্চয় আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলাকে ভয় করি। আমি চাই তুমি আমার এবং তোমার গুনাহের বোঝা নিয়ে প্রত্যাবর্তন করো এবং জাহান্নামিদের অন্তর্ভুক্ত হও। এটিই অত্যাচারীদের উপযুক্ত সাজা।

[সুরা মায়িদা : ২৮-২৯]

সর্বশেষ যিনি উসমান রা.-এর কাছ থেকে বেরিয়ে যান, তিনি ছিলেন হাসান ইবনে আলি রা.।

উসমান রা.-এর শাহাদাতবরণ

উসমান রা. নফল নামাজ আদায় করেন। নামাজে সম্পূর্ণ সুরা তহা পাঠ করেন। এরপর কুরআন তেলাওয়াত করতে বসে যান।

এ সময় ফিতনাবাজদের চূড়ান্ত চিন্তাভাবনা ছিল কীভাবে অল্প সময়ের মধ্যে উসমান রা.-কে হত্যা করা যায়। ইতিমধ্যেই তারা জানতে পেরেছে, খলিফার সাহায্যে আগমনকারী মুসলিম বাহিনী মদিনার কাছাকাছি চলে এসেছে।

সুতরাং ফিতনার অন্যতম মূলহোতা কিনানা ইবনে বিশর তুজিবি আগুন দিয়ে উসমান রা.-এর ঘরের দরজা জ্বালিয়ে দেয়। এরপর কয়েকজন ফিতনাবাজ-সহ সে ভেতরে প্রবেশ করে। এরপর আল-মাওতুল আসওয়াদ লকবধারী এক ব্যক্তি প্রবেশ করে। কেউ বলেন, সে ছিল আবদুল্লাহ ইবনে সাবা। আবার কেউ বলেন, সে ছিল অন্য কোনো ব্যক্তি। সে এসে প্রচণ্ড শক্তিতে উসমান রা.-এর গলা চেপে ধরে। এমনকি ধারণা হয়, তিনি মারা গিয়েছেন। তখন তারা তাকে ফেলে চলে যায়।[১৭৫] এরপর প্রবেশ করেন মুহাম্মাদ ইবনে আবু

১৭৫. *তারিখুত তবারি*, ৪/৩৮৪; *তারিখুল ইসলাম*, ৩/১৩৯; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/২০৬; *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১/২০৬

বকর রা.। পূর্বেই বলেছি, এই ফিতনায় অংশগ্রহণকারী তিনিই একমাত্র সাহাবি। তিনি উসমান রা.-এর কাছে আসেন। ভেবেছিলেন, তিনি মারা গিয়েছেন। কিন্তু এসে দেখেন যে, তিনি এখনো জীবিত আছেন। তখন মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর উসমান রা.-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, হে আহাম্মক, আপনি কোন দ্বীনের ওপর আছেন?

তখন উসমান রা. বললেন, আমি ইসলাম ধর্মের ওপর আছি। আমি আহাম্মক নই; বরং, আমি হচ্ছি আমিরুল মুমিনিন (মুমিনদের নেতা)।

মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর রা. বললেন, আপনি আল্লাহর কিতাবে পরিবর্তন করেছেন।

উসমান রা. বললেন, আল্লাহর কিতাব (কুরআন) তোমার আমার সামনেই আছে।

তখন মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর রা. এগিয়ে এসে উসমান রা.-এর দাড়ি ধরে টান দেন এবং বলেন, নিশ্চয় আমরা কেয়ামতের দিন ওই সব লোকদের অন্তর্ভুক্ত হতে চাই না, যারা বলে,

﴿رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا﴾

> হে আমাদের প্রতিপালক, নিশ্চয় আমরা আমাদের নেতা এবং বয়োজ্যেষ্ঠদেরকে অনুসরণ করেছি। তারাই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে। [সুরা আহযাব : ৬৭]

এ সময় পর্যন্তও মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর রা. এবং ফিতনায় জড়িয়ে পড়া আরও কিছু লোক মনে করছিল যে, উসমান রা.-কে হত্যা বা অপসারণের মাধ্যমে তারা মহৎ কাজ করছেন। তারা আল্লাহর আনুগত্য এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের জন্যই খলিফাকে হত্যা বা অপসারণের চেষ্টা করছে। নিঃসন্দেহে এ ছিল তাদের মনে ঢুকিয়ে দেওয়া ইবলিসের প্ররোচনা।

উসমান রা. বললেন, ভাতিজা, তুমি এমন দাড়িতে হাত দিয়েছ, তোমার পিতা যার সম্মান করতেন।

এ কথা শোনার পর মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর রা.-এর কাছে এক নিমিষেই সত্য উন্মোচিত হয়ে যায়। এ কথার মাধ্যমে যেন তিনি মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর রা.-এর অন্তর থেকে ওই পর্দা সরিয়ে দিলেন, যা তার নিকট সত্য ও

সঠিক বিষয়কে প্রচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তার মানসপটে ভাসতে থাকে রাসুল ﷺ, আবু বকর সিদ্দিক রা. এবং অন্য মুসলিমদের সঙ্গে উসমান রা.-এর বর্ণিল দিনগুলোর কথা। তখন তিনি লজ্জিত হয়ে উসমান রা.-এর দাড়ি থেকে হাত সরিয়ে নেন এবং কাঁদতে থাকেন। এভাবে কিছুক্ষণ অবস্থান করে সেখান থেকে বেরিয়ে যান। বেরিয়েই দেখতে পান, বিদ্রোহীরা উসমান রা.-এর ঘরে প্রবেশ করছে। তখন তিনি উসমান রা.-এর পক্ষে তরবারি তুলে প্রতিরোধ শুরু করেন। কিন্তু বিদ্রোহীরা তাকে পরাস্ত করে। তিনি তাদেরকে দমিয়ে রাখতে পারেননি। উসমান রা.-এর স্ত্রী নায়েলা বিনতে ফারাফিসা রহ. এ কথার সাক্ষ্য দিয়েছেন।[১৭৬]

অভিশপ্ত কিনানা ইবনে বিশর পুনরায় উসমান রা.-এর ঘরে প্রবেশ করে। তরবারি দিয়ে তার শরীরে আঘাত করে। উসমান রা. হাত দিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করলে ওই নরপিশাচ তার হাত কেটে ফেলে। এ আঘাতের পর উসমান রা. বলে ওঠেন, বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ, অপরদিকে তার হাত থেকে রক্তের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ে। তখন তিনি বলেন, এ হাত দিয়েই প্রথম কুরআন লেখা হয়েছিল। এরপর তিনি জোরে বলে ওঠেন, সুবহানাল্লাহিল আজিম। তার হাত থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ে সামনে থাকা কুরআনের ওপর। সমস্ত বর্ণনা অনুযায়ী প্রমাণিত যে, সেদিন তার রক্ত গড়িয়ে পড়েছিল কুরআনের এই শব্দের ওপর,

﴿فَسَيَكْفِيكَهُمُ ٱللَّهُ﴾

> অচিরেই আল্লাহ তাআলা তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবেন। [সুরা বাকারা : ৩৭১][১৭৭]

এরপর কিনানা পুনরায় তার মাথায় আঘাত করে। এতে উসমান রা. কাত হয়ে পড়ে যান। এবার অভিশপ্ত কিনানা তার বুকে আঘাত করতে উদ্যত হয়। নায়েলা রহ. তার স্বামীর পক্ষে সেই আঘাত প্রতিরোধ করতে এগিয়ে আসেন। স্বামীকে রক্ষা করার জন্য হাত তরবারির নিচে ধরেন। তখন

---

১৭৬. *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, ৩৯/৪০৯; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/২০৭

১৭৭. *আল-ইসতিয়াব*, ৩/১৪৬; *উসদুল গাবা*, ৩/৫৭৮; *তাহযিবুল কামাল*, ১৯/৪৫৬; *আল-কামিল ফিত তারিখ*, ২/৫৪৪; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/২০৮

কবজির অংশ-সহ তার কয়েকটি আঙুল কেটে যায় এবং তিনি পড়ে যান মাটিতে।

অভিশপ্ত কিনানা তখন উসমান রা.-এর বুকে আঘাত করে। এরপর তরবারি উত্তোলন করে আরেক নরাধম সাওদান ইবনে হুমরান। সে উসমান রা.-এর পেটে আঘাত করে। উসমান রা. জমিনের দিকে ঝুঁকে গেলে সে উসমান রা.-এর পেটের ওপর পদাঘাত করে। তার শরীর দিয়ে তরবারির ওপর ভর দেয় যেন উসমান রা.-এর শরীরে তরবারি ভালোভাবে বিদ্ধ হয়। এ আঘাতের পরেই উসমান রা. শাহাদাতবরণ করেন।

এরপর আমর ইবনুল হামিক নামক এক নরাধম তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সে উসমান রা.-এর শরীরে নয়টি আঘাত করে। আঘাত করার সময় সে বলে, এই তিনটি আঘাত করলাম আল্লাহর জন্য। পরের ছয়টি আঘাত করলাম আমার মনের ক্ষোভ মেটানোর জন্য।

যুন নুরাইন তথা দুই নুরের অধিকারী। রাসুল ﷺ-এর দুই কন্যার স্বামী। একাধিকবার রাসুল ﷺ-এর মুখে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবি এবং ইসলামের তৃতীয় খলিফা উসমান রা. এমন নির্মমভাবে শহিদ হয়ে পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাসুল ﷺ-এর সঙ্গে মিলিত হন।

ওই সব পাপিষ্ঠ খারেজিরা উসমান রা.-কে হত্যা করে তার ঘরে লুটপাট শুরু করে। তারা বলতে থাকে, যেহেতু তার রক্ত আমাদের জন্য বৈধ ছিল, তাহলে তার সম্পদ কেন বৈধ হবে না?

এই বলে তারা সামনে যা দেখে তাই নিতে থাকে। এমনকি পানপাত্র পর্যন্তও ছাড়েনি। এরপর তারা উসমান রা.-এর দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করতে উদ্যত হলে তার দুই স্ত্রী নায়েলা রহ. ও উম্মুল বানিন রহ. এবং তার কন্যা চিৎকার করে ওঠেন। তখন আবদুর রহমান ইবনে উদাইস নামক ফিতনাবাজদের এক সর্দার বলে, তাকে ছেড়ে দাও। ফলে তারা উসমান রা.-এর মাথা বিচ্ছিন্ন করা থেকে বিরত থাকে। এরপর তারা যখন বেরিয়ে যায়, তখন উসমান রা.-এর এক দাস সাওদান ইবনে হুমরানের ওপর আঘাত করে তাকে জাহান্নামে পৌঁছে দেয়। তখন কাতারা নামক এক ফিতনাবাজ সেই দাসকে হত্যা করে। তখন উসমান রা.-এর অপর এক দাস এসে কাতারার জীবননাশ করে দেয়। ফিতনাবাজরা তখন দ্বিতীয় দাসকেও হত্যা করে।

এই দুর্ঘটনায় উসমান রা. এবং তার দুই দাস শাহাদাতবরণ করেন। কয়েকজন সাহাবি এবং তাদের সন্তান শাহাদাতবরণ করেন। আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা., হাসান রা. ও হুসাইন রা. আহত হন।[১৭৮]

ওই সব পাপিষ্ঠ বিদ্রোহীরা মুসলিমদের বায়তুল মালের প্রতি মনোনিবেশ করে এবং লুটপাটের চেষ্টা করে। এর মাধ্যমে আমাদের কাছে অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে যায় যে, দুনিয়ার লোভই তাদের এ কাজে উদ্‌বুদ্ধ করেছিল। এ সময় বায়তুল মালের প্রহরীরা বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করে ওঠে। কিন্তু তারা প্রহরীদের পরাজিত করে বায়তুল মালের অনেক সম্পদ লুট করে নেয়। বায়তুল মালের রক্ষীগণ চিৎকার করে বলে ওঠেন, আল্লাহর শপথ! এরা দুনিয়ালোভী। এরা কখনোই সংশোধনের উদ্দেশ্যে আসেনি।

এদিকে উসমান রা.-এর গভর্নরগণের পক্ষ থেকে প্রেরিত যে বাহিনী মদিনার উপকণ্ঠে পৌঁছে গিয়েছিল, তারা উসমান রা.-এর শাহাদাত এবং আলি রা.-এর ক্ষমতারোহণের সংবাদ জেনে ব্যথিত মনে নিজেদের গভর্নরগণের নিকট ফিরে যান।

উসমান রা.-এর হত্যাকাণ্ডের পর সাহাবিগণের অবস্থা

উসমান রা.-এর হত্যাকাণ্ডের পরে সাহাবিগণের প্রতিক্রিয়া কী ছিল, এ বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, শিয়াদের গ্রন্থগুলোতে এ বিষয়টিকে খুবই কদর্যরূপে উপস্থাপন করা হয়। তারা বুঝাতে চায় যে, সাহাবিগণ উসমান রা.-এর মৃত্যুতে আনন্দিত হয়েছেন। কারণ, উসমান রা. সাহাবিগণের মতের বিরোধী ছিলেন। সাহাবিগণ চাইতেন না তিনি ক্ষমতায় স্থায়ী হন। এমন আরও ভ্রান্ত ও বানোয়াট কথা তাদের গ্রন্থগুলোতে রয়েছে।

সাহাবিগণ উসমান রা.-এর হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে জানতে পারেন। পাশাপাশি আরেকটি বিস্ময়কর বিষয়ও জানতে পারেন। তা হলো, হত্যাকারীরা তাদের এই ঘৃণ্য অপকর্মের পর মুসা আ.-এর জাতির মতো আচরণ প্রকাশ করতে থাকে। মুসা আ.-এর জাতি গোবৎস পূজার পর যেভাবে সেই কাজের ওপর অনুতপ্ত হয়েছিল, তেমনই হত্যাকারীরাও নিজেদের অত্যন্ত অনুতপ্ত এবং লজ্জিত হিসাবে প্রকাশ করতে থাকে। মুসা আ.-এর জাতি সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে জানাচ্ছেন—

১৭৮. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/২১০

﴿وَلَمَّا سُقِطَ فِيٓ أَيۡدِيهِمۡ وَرَأَوۡاْ أَنَّهُمۡ قَدۡ ضَلُّواْ قَالُواْ لَئِن لَّمۡ يَرۡحَمۡنَا رَبُّنَا وَيَغۡفِرۡ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ﴾

আর যখন তারা অনুতপ্ত হলো এবং বুঝতে পারল যে, তারা নিশ্চিত পথভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে। তখন বলতে লাগল, আমাদের প্রতি যদি আমাদের প্রভু করুণা না করেন এবং আমাদের ক্ষমা না করেন তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব। [সুরা আরাফ : ১৪৯]

ওই সব হত্যাকারীদের অনেকেই উসমান রা.-এর রক্ত এবং তার দেহ মাটিতে লুটে পড়া অবস্থায় দেখে তাদের অপরাধ এবং মন্দ কাজ অনুভব করতে পারে। ফলে তারা এ কাজে নিজেদের লজ্জা এবং অনুশোচনা প্রকাশ করে।

উসমান রা.-এর হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পৌঁছে গেল সাহাবিগণের কাছে

- যুবায়ের ইবনুল আওয়াম রা. এ সংবাদ শুনে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়েন। তার জন্য রহমতের দোয়া করেন। এরপর তার কাছে সংবাদ আসে যে, যারা তাকে হত্যা করেছে তারা লজ্জিত ও অনুতপ্ত। তিনি বলেন, তারা ধ্বংস হোক। এ কথা বলে তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করেন,

﴿مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيۡحَةٗ وَٰحِدَةٗ تَأۡخُذُهُمۡ وَهُمۡ يَخِصِّمُونَ. فَلَا يَسۡتَطِيعُونَ تَوۡصِيَةٗ وَلَآ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِمۡ يَرۡجِعُونَ﴾

তারা কেবল একটা ভয়াবহ শব্দের অপেক্ষা করছে, যা তাদের পাকড়াও করবে তাদের বিতর্কে লিপ্ত থাকা অবস্থায়। তখন তারা কোনো অসিয়ত করতে পারবে না। এবং পারবে না তাদের পরিবার-পরিজনের কাছেও ফিরে যেতে। [সুরা ইয়াসিন : ৪৯-৫০][১৭৮]

- আলি রা.-এর কাছে এ সংবাদ পৌঁছে। কোনো কোনো বর্ণনা মতে, যখন তার কাছে এ সংবাদ পৌঁছে তখন হাসান রা., হুসাইন রা., আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. ও মুহাম্মাদ ইবনে তালহা রা. তার সামনে ছিলেন। তখন আলি

১৭৮. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/২১১

রা. হুসাইন রা.-কে চড় মারেন। হাসান রা.-এর বুকে আঘাত করেন। আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. ও মুহাম্মাদ ইবনে তালহা রা.-কে তিরস্কার করেন। তাদের উদ্দেশে বলেন, তোমাদের সামনে কীভাবে তাকে হত্যা করা হলো?

এরপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে নিজেকে উসমান রা.-এর রক্ত থেকে মুক্ত ঘোষণা করছি।[১৮০]

এরপর তাকে বলা হলো, হত্যাকারীরা নিজেদের কৃতকর্মে অনুতপ্ত হয়েছে।

তখন আলি রা. বললেন,

﴿كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ ۚ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيْٓءٌ مِّنْكَ إِنِّيْٓ أَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ﴾

> তাদের তুলনা হলো শয়তান, সে মানুষকে বলে কাফের হয়ে যা। এরপর যখন সে কাফের হয়ে যায়, তখন শয়তান বলে, তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলাকে ভয় করি। [সুরা হাশর : ১৬][১৮১]

• সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা.-এর কাছে উসমান রা.-এর হত্যার সংবাদ পৌঁছলে তিনি তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করেন এবং রহমতের দোয়া করেন। তিনিও হত্যাকারীদের উদ্দেশে এ আয়াত তেলাওয়াত করেন,

﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِيْنَ أَعْمَالًا ۝ الَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا﴾

> বলুন, আমি কি তোমাদের সেসব লোকের সংবাদ দেবো, যারা কর্মের দিক দিয়ে সর্বাপেক্ষা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত? তারাই সেসব লোক, যাদের প্রচেষ্টা পার্থিবজীবনে বিভ্রান্ত হয়। অথচ তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করছে। [সুরা কাহাফ : ১০৩-১০৪]

---

১৮০. *তারিখুল খুলাফা*, পৃ. ১২৬

১৮১. *তারিখুত তবারি*, ৪/৩৯২, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/২১১

সাদ রা. বললেন, হে আল্লাহ, আপনি তাদের লজ্জিত করুন এবং পাকড়াও করুন।

সাদ রা. ছিলেন মুসতাজাবুদ দাওয়াহ (যার দোয়া কবুল হয়)। তার দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে রাসুল ﷺ দোয়া করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর এই দোয়া কবুল করেছেন। পূর্বসূরি একজন মনীষী শপথ করে বলেছেন, উসমান রা.-এর হত্যাকাণ্ডে যারা জড়িত ছিল, তাদের সবারই মৃত্যু হয়েছে হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়ে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের শাসনকাল পর্যন্ত জীবিত থাকে ও তার হাতে নিহত হয়। তাদের কেউই হত্যার হাত থেকে বাঁচতে পারেনি। তারা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতের অনিষ্ট নিয়ে ফিরে গিয়েছে।[১৮২]

সংবাদ যখন শামে পৌঁছল

উসমান রা.-এর হত্যাকাণ্ডের পর তার স্ত্রী নায়েলা বিনতে ফারাফিসা রহ. উসমান রা.-এর রক্তমাখা জামা এবং উসমান রা.-কে বাঁচাতে গিয়ে তার কেটে যাওয়া আঙুল ও কবজি একত্র করেন। এরপর সেগুলো নোমান ইবনে বশির রা.-এর হাতে দিয়ে বলেন, এগুলো মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রা.-এর কাছে নিয়ে যান। তিনিই এখন উসমান রা.-এর উত্তরসূরি।

নোমান ইবনে বশির রা. এই আমানত শামে মুআবিয়া রা.-এর কাছে পৌঁছে দেন। মুআবিয়া রা. এগুলো মসজিদের মিম্বরের ওপর ঝুলিয়ে দেন এবং কেঁদে কেঁদে প্রতিশোধ গ্রহণের শপথ করেন। শামের অধিবাসীরা মুআবিয়া রা.-এর সঙ্গে সহমত পোষণ করে। তাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন সাহাবি। আবু দারদা রা., উবাদা ইবনে সামিত রা. প্রমুখ বিখ্যাত সাহাবিগণ তখন শামেই অবস্থান করছিলেন। আবু দারদা রা. ছিলেন শামের বিচারক ও সেখানকার সবচেয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব। তিনি উসমান রা.-এর হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধগ্রহণ ওয়াজিব বলে ফতোয়া প্রদান করেন। ফলে উসমান রা.-এর রক্তমাখা জামার নিচে বসে প্রায় ৭০ হাজার মানুষ কাঁদতে কাঁদতে তার মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের শপথ নেয়।[১৮৩]

---

১৮২. *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, ৩৯/৪৪০; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/২১১

১৮৩. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/২৫৫; *তারিখু ইবনি খালদুন*, ২/৬২৫

যারা প্রতিশোধ গ্রহণের ফতোয়ার সঙ্গে সহমত পোষণ করেছিলেন তাদের মধ্যে আবু মুসলিম খাওলানি রহ. ছিলেন অন্যতম। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট তাবেয়ি। বলা হয়ে থাকে যে, আবু দারদা রা.-এর পর তিনিই ছিলেন শামের সবচেয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব।

সংবাদ যখন আয়েশা রা.-এর কাছে পৌঁছল

উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রা. ও রাসুল ﷺ-এর অন্য সকল স্ত্রীগণ তখন হজের সফরে ছিলেন। সেখান থেকে মদিনায় ফেরার পথে এ সংবাদ পৌঁছে তাদের কাছে। এ সংবাদ শুনে তারা পুনরায় মক্কায় ফিরে যান। উসমান রা.-এর মৃত্যু সংবাদ শুনে আয়েশা রা. বলেন, (প্রথমে) তোমরা তাকে ময়লা থেকে পরিচ্ছন্ন কাপড়ের মতো করে দিলে। এরপর তাকে আল্লাহর নিকটে পৌঁছে দিলে, দুম্বার মতো জবাই করে দিলে।

তখন বিশিষ্ট তাবেয়ি মাসরুক রহ. তাকে বলেন, এ তো আপনারই কাজ। আপনিই লোকদের কাছে চিঠি লিখে তাদেরকে উসমান রা.-এর বিরুদ্ধে নামতে বলেছেন। আয়েশা রা. আঁতকে উঠে বলেন, না। সেই সত্তার শপথ! যার প্রতি সকল মুমিন ঈমান এনেছে এবং কাফেররা যাকে অবিশ্বাস করেছে। আমি এই মজলিসে বসা পর্যন্ত তাদের উদ্দেশে সাদা কাগজে কালির একটি আঁচড়ও দিইনি।

আয়েশা রা.-এর এ কথা ছিল পুরোপুরি সত্য। আমাশ রহ. বলেন, তারা মনে করতেন এই চিঠি আয়েশা রা.-এর নাম ব্যবহার করে লেখা হয়েছে।[১৮৪]

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, ফিতনাবাজদের মূলহোতারা উসমান রা.-এর বিরুদ্ধে উসকানি দিয়ে মিথ্যা চিঠি লিখত এবং সেগুলো সাহাবিগণের নামে চালিয়ে দিত। এভাবেই তারা ফিতনার আগুন জ্বালিয়ে নিজেদের স্বার্থোদ্ধার করতে চাইত। মক্কায় ফিরে রাসুল ﷺ-এর স্ত্রীগণ পরিস্থিতি কী হয় তা পর্যবেক্ষণের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন।

---

১৮৪. *আত-তবাকাতুল কুবরা*, ৩/৬০; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/২১৮

উসমান রা.-এর দাফন

৩৫ হিজরির ১৮ জিলকদ মাগরিবের নামাজের পূর্বে শহিদ হন উসমান রা.। তখন সাহাবিগণের একটি দল তার বাড়িতে আসেন। মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে বাড়িতেই তার জানাজা পড়েন। সহিহ বর্ণনা অনুযায়ী এটিই প্রমাণিত। তবে কোনো কোনো বর্ণনা অনুযায়ী দ্বিতীয় দিনে জানাজা পড়ার কথা পাওয়া যায়। আবার কোনো কোনো বর্ণনায় তৃতীয় দিনের কথাও বলা হয়েছে। তবে প্রথম বর্ণনাটিই সহিহ।

সাহাবিগণ উসমান রা.-কে বহন করে মদিনার বাইরে হাশ কাওকাব[১৮৫] নামক স্থানে নিয়ে যান। মদিনার লোকজন তাদের কেউ মারা গেলে যেখানে দাফন করত, এটি সেই স্থান ছিল না। সাহাবিগণ আশঙ্কা করছিলেন যে, ফিতনাবাজরা হয়তো উসমান রা.-এর লাশ কবর থেকে বের করে টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারে বা তার মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে। যেমনটি তারা হত্যার পর চেষ্টা করেছে। তাই তারা উসমান রা.-এর লাশ এখানে নিয়ে আসেন।[১৮৬]

ইমাম মালেক রহ. বর্ণনা করেন, উসমান ইবনে আফফান রা. হাশ কাওকাব এলাকার পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে বলতেন, এখানে একজন নেককার লোককে দাফন করা হবে।[১৮৭]

সাহাবিগণ উসমান রা.-কে গোসল করানোর পর কাফনের কাপড় পরিয়ে জানাজা পড়েন। কোনো কোনো বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তাকে গোসল দেওয়া হয়নি। আবু হুরাইরা রা. অথবা মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রা., অথবা তৃতীয় কোনো সাহাবি জানাজার নামাজের ইমামতি করেন।

উসমান রা.-কে দাফন করার পর সাহাবিগণ তার নিহত দুই দাসকে তার পাশেই দাফন করেন।

ওই সব পাপিষ্ঠদের মনে খলিফাতুল মুসলিমিন উসমান রা.-এর প্রতি কী পরিমাণ বিদ্বেষ ছিল তা বোঝানোর জন্য একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। মুহাম্মাদ ইবনে সিরিন রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি কাবা

---

১৮৫. **হাশ কাওকাব :** মদিনার বাইরের কোনো এলাকা নয়; বরং মদিনার বাকিউল গারকাদ নামক কবরস্থানের পূর্বদিকে অবস্থিত একটি স্থান। (উইকিপিডিয়া)-সম্পাদক

১৮৬. *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, ৩৯/৫১৬; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৬/২২৯

১৮৭. *আল-ইসতিয়াব*, ১৯/১০৪৮; *তাহযিবুল কামাল*, ১৯/৪৫৭

শরিফ তাওয়াফ করছিলাম। তখন শুনতে পেলাম এক লোক বলছে, হে আল্লাহ, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। কিন্তু আমার মনে হয় না আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।

আমি বললাম, হে আল্লাহর বান্দা, আমি কাউকেই তোমার মতো এমন কথা বলতে শুনিনি।

লোকটি বলল, আমি আল্লাহ তাআলার কাছে অঙ্গীকার করেছিলাম, যদি উসমান রা.-কে কখনো চড় মারার সুযোগ পাই, তাহলে অবশ্যই আমি তাকে চড় মারব। অতঃপর যখন তাকে হত্যা করার পর তার লাশ খাটিয়ায় রাখা হলো এবং লোকেরা তার জানাজার নামাজ পড়ার জন্য আসছিল, তখন আমিও জানাজার নামাজ পড়ার ভান করে সেখানে গেলাম। একসময় দেখলাম, খাটিয়ার পাশে কেউ নেই। তখন আমি তার চেহারা এবং দাড়ি থেকে কাপড় সরিয়ে চড় মেরে বসলাম। সেই থেকে আমার ডানহাত শুকিয়ে অচল হয়ে গিয়েছে। ইবনে সিরিন রহ. বলেন, আমি তার হাত দেখতে পেলাম, যেন তা শুকনো কাঠ।[১৮৮]

উসমান রা. তার ঘরে অসিয়তনামা লিখে গিয়েছিলেন। তাতে লেখা ছিল,

> বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। উসমান ইবনে আফফান সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তিনি একক। তাঁর কোনো অংশীদার নেই এবং নিশ্চয় মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর রাসুল। নিশ্চয় জান্নাত সত্য। জাহান্নাম সত্য। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা কবরবাসীদের সেদিন পুনরুত্থিত করবেন, যেদিনের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না। এ সাক্ষ্যের ওপরই আমার জীবন এবং এর ওপরই আমার মরণ। ইনশাআল্লাহ, এই সাক্ষ্যের ওপরই আমার পুনরুত্থান হবে।[১৮৯]

***

১৮৮. *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, ৩৯/৪৪৭; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/২১৩

১৮৯. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/২০৫

খেলাফতের দায়িত্বে আলি রা.

সে সময় ফিতনাবাজদের অন্যতম নেতা গাফেকি ইবনে হারবকে মদিনার ফিতনাবাজদের আমির মনোনীত করা হয়েছিল। মিশরের বিদ্রোহীরা আলি রা.-এর কাছে ছুটে এসে বলল, আমরা আপনার কাছে বাইআত গ্রহণ করছি।

আলি রা. তিরস্কার এবং অভিসম্পাত করে তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তাদেরকে তাড়িয়ে দিয়ে তিনি মদিনার কোনো এক বাগানে চলে গেলেন নিভৃতে সময় কাটানোর জন্য। এদিকে কুফার বিদ্রোহীরা যুবায়ের ইবনুল আওয়াম রা.-এর কাছে গিয়ে তাকে আমির বানাতে চাইল। তিনিও তাদের সঙ্গে আলি রা.-এর মতো আচরণ করলেন। এমনইভাবে বসরার অধিবাসীরা তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রা.-এর কাছে গিয়ে আমির হওয়ার প্রস্তাব পেশ করে। তিনিও তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ফিরিয়ে দেন। তখন ফিতনাবাজরা উদ্‌বিগ্ন হয়ে পড়ে। কার হাতে তারা তুলে দেবে খেলাফতের দায়িত্ব! সে সময় পর্যন্ত তারা নিজেদের মধ্য থেকে কাউকে ক্ষমতায় বসানোর চিন্তা করেনি। শাসক নির্বাচনের আগ পর্যন্ত গাফেকি ইবনে হারবকে মদিনার দায়িত্বশীল হিসাবে বসানো হয়েছিল। বিদ্রোহীরা এবং মদিনাবাসীরা তার পেছনেই নামাজ পড়ত। পাঁচদিন পর্যন্ত এমন অবস্থা অব্যাহত থাকে।

সাহাবিগণ আলি রা.-এর কাছে ছুটে যান। তাকে বলেন, এ কাজে আপনার চেয়ে অধিক উপযুক্ত কেউ নেই। আপনার হাত বাড়িয়ে দিন, আমরা বাইআত গ্রহণ করি।

আলি রা. তাদের এই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলে ফিতনাবাজরা আরও বেশি দিশেহারা হয়ে পড়ে। তখন তারা সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা.-এর কাছে যায়। তিনি সম্পূর্ণরূপে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তারা তাকে বলে, আপনি তো সেই লোক, যার ওপর রাসুল ﷺ সন্তুষ্ট ছিলেন এবং উমর রা.-ও সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু তিনি তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তারা এবার যায় আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর কাছে। তিনিও তাদেরকে ফিরিয়ে দেন। তারা আবার আলি রা.-এর কাছে ফিরে আসে। এবার সাহাবিগণ তাকে

বলেন, আপনি যদি খলিফা না হন তাহলে তারা তাদের মধ্যে একজনকে খলিফা বানিয়ে নেবে।[১৯০]

কয়েকজন সাহাবি এবং ফিতনাবাজদের কিছু লোক আলি রা.-কে আমিরুল মুমিনিন হওয়ার অনুরোধ করে। প্রথম আলি রা.-এর হাতে বাইআত গ্রহণ করে আশতার নাখায়ি। সে ছিল কুফা থেকে আগত বিদ্রোহীদের একজন নেতা। ফিতনাবাজদের সঙ্গে মিলে তার বিদ্রোহের পেছনে বিপরীতধর্মী দুটি কারণ ছিল।

প্রথম কারণ : দ্বীনের ক্ষেত্রে তার বাড়াবাড়ি এবং এই ধারণা পোষণ করা যে, উসমান রা.-এর বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলো করা হচ্ছে সেগুলোর জন্য তাকে অপসারণ অথবা হত্যা করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় কারণ : সে ছিল ক্ষমতালোভী। কুফার অধিবাসী এবং ফিতনাবাজদের মধ্যে তার প্রভাব ছিল এবং তার অধীনে জনবলও ছিল।

আলি রা. ক্রমাগত এই চাপের কারণে অবশেষে তাদের প্রস্তাব মেনে নেন। তবে তিনি শর্তারোপ করেন যে, প্রথমে তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ ও যুবায়ের ইবনুল আওয়াম তার হাতে বাইআত গ্রহণ করবেন। কারণ, তিনি আশঙ্কা করছিলেন, যদি তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তাহলে কুফা অথবা বসরার অধিবাসীরা বেঁকে বসতে পারে। তারা তালহা বা যুবায়েরকে খলিফা হিসাবে দেখতে চাইতে পারে। তখন আরেক ফিতনার সূত্রপাত হবে। তখন লোকেরা তালহা রা. ও যুবায়ের রা.-এর কাছে যায়। তারা দুজনই বলেন, প্রথমে উসমান রা.-এর হত্যার বিচার করতে হবে।

আলোচনা-পর্যালোচনা ও এ বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর যেকোনো একজনকে ক্ষমতা গ্রহণ করতেই হবে। নইলে ফিতনা আরও বেড়ে যেতে পারে। তারা দুজন বাইআত গ্রহণে সম্মত হন। তালহা রা. প্রথমে আলি রা.-এর হাতে বাইআত গ্রহণ করেন। আলি রা. তাদের দুজনের বাইআত গ্রহণের অপেক্ষায় মিম্বরেই বসেছিলেন। তালহা রা. তার ডানহাত দিয়ে বাইআত গ্রহণ করেন। তার এই হাতটি ছিল অবশ। একটি দুর্বল বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তখন মসজিদে উপস্থিত এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলে ওঠে, আল্লাহর

১৯০. *তারিখুত তবারি*, ৪/৪৩৪; *উসদুল গাবা*, ৪/১০২; *তারিখুল খুলাফা*, পৃ. ১২৬

শপথ! এই বাইআত কিছুতেই পরিপূর্ণ হবে না। কারণ, বাইআত গ্রহণকারী প্রথম হাতই অবশ।[১৯১]

এই বর্ণনা যদি সঠিকও হয়ে থাকে, তবু এ বর্ণনায় যা বলা হয়েছে তা সঠিক নয়। কারণ, এই হাত ছিল মদিনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাত। তা অবশ হয়েছিল উহুদের যুদ্ধের দিন রাসুল ﷺ-কে বাঁচাতে গিয়ে। যেদিন মালেক ইবনে রবি রাসুল ﷺ-কে লক্ষ্য করে তির নিক্ষেপ করছিল। তার নিশানা কখনো ব্যর্থ হতো না। তখন তালহা রা. দ্রুত ছুটে গিয়ে তার তির প্রতিহত করার জন্য নিজের হাত পেতে দেন। ফলে তার হাত অবশ হয়ে যায়। এ যুদ্ধে তিনি রাসুল ﷺ-কে বাঁচাতে অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। সেদিন ২৪টিরও বেশি আঘাত লেগেছিল তার শরীরে। আবু বকর সিদ্দিক রা. যখনই উহুদ যুদ্ধের আলোচনা করতেন, তখন বলতেন, আল্লাহর শপথ! এটি ছিল তালহার দিন।[১৯২]

এই হাত দিয়েই আলি রা.-এর বাইআত গ্রহণ করা হয়। নিশ্চয় তা ছিল বরকতময় হাত।

এরপর যুবায়ের ইবনুল আওয়াম রা. এসে বাইআত গ্রহণ করেন। এক বর্ণনায় আছে, যুবায়ের রা. বলেছিলেন, আমি আমার ঘাড়ে তরবারি থাকাবস্থায় বাইআত গ্রহণ করেছি।

বর্ণনাটি বাতিল, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।

তাদের দুজনের বাইআত গ্রহণ শেষে আলি রা. মিম্বরের ওপর দাঁড়িয়ে খলিফা হওয়ার প্রস্তাব গ্রহণের ঘোষণা দেন। এটি ছিল উসমান রা.-এর শাহাদাতবরণের পঞ্চম দিনের ঘটনা। এরপর তিনি অত্যন্ত ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ একটি বক্তব্য প্রদান করেন। এতে তিনি লোকদের আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেন ও দুনিয়াকে তুচ্ছ হিসাবে উপস্থাপন করেন। যারা জমিনে বিশৃঙ্খলা ছড়ায়, তাদের অভিসম্পাত করেন।

এ সময় যদিও আলি রা. খলিফা হয়ে গিয়েছিলেন তবে ক্ষমতার কলকাঠি তখনও ওই সব সশস্ত্র বিদ্রোহীর হাতেই ছিল। তারা ছিল মদিনাবাসীর চেয়ে সংখ্যা ও সরঞ্জামে অধিক।

---

১৯১. *তারিখুত তবারি*, ৪/৪৩৫, *আল-কামিল ফিত তারিখ*, ২/৫৫৪
১৯২. *তারিখুল ইসলাম*, ২/১০৩

এ সময়েই তালহা রা. ও যুবায়ের রা. আলি রা.-এর কাছে যান। তারা খলিফা উসমান রা.-এর হত্যার বিচার করতে বলেন।

তারা দুজনেই চাচ্ছিলেন উসমান রা.-কে যারা হত্যা করেছে তাদের অনতিবিলম্বে হত্যা করা হয়।

আলি রা. তাদের দুজনকে বলেন, ওই সব লোকদের হাতে অস্ত্র ও জনবল রয়েছে। তাই আমার আশঙ্কা হচ্ছে, এখন উসমান রা.-এর হত্যার বিচার করতে চাইলে হিতে বিপরীত হবে।[১৯৩]

আলি রা.-এর চিন্তা ছিল পরিস্থিতি শান্ত হওয়া ও ক্ষমতা সদৃঢ় হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা। এরপর তিনি উসমান রা.-এর খুনিদের ন্যায়সংগতভাবে বিচারের আওতায় আনবেন। যাদের হত্যা করা সমীচীন হবে তাদের হত্যা করবেন। যাদের শাস্তি দেওয়া সমীচীন হবে তাদের শাস্তি দেবেন। এখন মদিনায় ওই সকল খুনির হাতে শক্তি ও ক্ষমতা রয়েছে। কুফা, বসরা ও মিশরে তাদের গোত্র রয়েছে। এখন যদি তাদের হত্যা করা হয় তবে আরও বড় ফিতনা শুরু হয়ে যাবে। তাদের গোত্রীয় অনেক লোক গোত্রীয় স্বার্থ ও পক্ষপাতিত্বের কারণে ইসলামি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে দেবে।

তালহা রা. ও যুবায়ের রা. আলি রা.-এর এই অভিমত শুনে তার কাছে উমরার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। তাদের অনুমতি দেওয়া হলে তারা দুজনই মদিনা ত্যাগ করে মক্কায় চলে যান এবং সেখানে কিছুদিন অবস্থান করেন।[১৯৪]

আলি রা. ইসলামি সাম্রাজ্যের সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং ফিতনার পরিশিষ্ট মুছে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ শুরু করেন। স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছিল, ক্ষমতার কলকাঠি বিদ্রোহীদের হাতে। তাদের যথেষ্ট প্রভাবও ছিল। এমনকি আলি রা.-ও তাদের অপছন্দ করা সত্ত্বেও তাদের কথা শুনতে বাধ্য ছিলেন। তাদের কথায় বাধ্য হয়েই তিনি আশতার নাখায়ির মতো কিছু লোককে রাষ্ট্রীয় কিছু দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন। তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও নিয়ন্ত্রণ দেখেই তিনি এমনটি করেছিলেন।

আলি রা. যখন খলিফা হন, তখন কুফার গভর্নর ছিলেন আবু মুসা আশআরি রা.। বসরার গভর্নর ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে আমের ইবনে কুরাইজ রা. এবং

---

১৯৩. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/২৫৫

১৯৪. *তারিখুত তবারি*, ৪/৪৪৪, *আল-কামিল ফিত তারিখ*, ২/৫৬৮

মিশরের গভর্নর ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে সাদ ইবনে আবু সারহ রা.। কিন্তু এ সময়ে মুহাম্মাদ ইবনে আবু হুজাইফা নামক আবদুল্লাহ ইবনে সাবার এক সহযোগী মিশরে আধিপত্য বিস্তার করে। আবদুল্লাহ ইবনে সাবা নিজেকে গোপন রেখে আড়াল থেকে তার দুরভিসন্ধি চালিয়ে যেত। এ ছাড়া তখন শামের গভর্নর ছিলেন মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রা. এবং ইয়ামেনের গভর্নর ছিলেন ইয়ালা ইবনে উমাইয়া তামিমি রা.।

আলি ইবনে আবু তালেব রা. ফিতনা দূরীকরণের লক্ষ্যে প্রথমে তাদের বরখাস্ত করা সমীচীন মনে করেন; যাদের ব্যাপারে সেখানকার অধিবাসীরা বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করেছিল। তাদের পরিবর্তে এ সময়ে যারা সেখানকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারবেন, এমন কাউকে নিয়োগ দেওয়া সমীচীন মনে করেন।

মুআবিয়া রা.-এর অবস্থান

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, মুআবিয়া রা.-এর কাছে উসমান রা.-এর হত্যাকাণ্ডের সংবাদ, রক্তে রঞ্জিত জামা এবং নায়েলা রহ-এর কর্তিত আঙুল এবং হাতের কবজি পৌঁছেছিল। তাকে উদ্দেশ করে নায়েলা রহ. যে পত্র পাঠিয়েছিলেন, তাতে লিখেছিলেন, আপনিই এখন উসমান রা.-এর উত্তরসূরি।

প্রকৃতপক্ষেই তিনি উসমান রা.-এর উত্তরসূরি ছিলেন। কারণ, তিনিও ছিলেন বনু উমাইয়া বংশের লোক। তাই মুআবিয়া রা. আলি রা.-এর বাইআত গ্রহণ করেননি; বরং শর্ত দিয়েছিলেন উসমান রা.-এর রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে হবে। খুনিদের খুনের বদলে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। যদি কেউ এমনটি না করে তবে সে আল্লাহ তাআলার কুরআনকে নিরর্থক ঘোষণা করল এবং এমন ব্যক্তির ক্ষমতা গ্রহণও বৈধ হবে না। এই ছিল মুআবিয়া রা.-এর ইজতেহাদ। আবু দারদা রা. এবং উবাদা ইবনে সামিত রা.-এর মতো বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবি তার সঙ্গে সহমত পোষণ করেন।

এ বিষয়টি যদিও ইজতেহাদ ছিল, তবে এই ইজতেহাদে তারা ভুল করেছিলেন। এ সময় আলি রা.-এর মতই ছিল সঠিক এবং তার হাতে বাইআত গ্রহণই ছিল যথাযথ সিদ্ধান্ত। এরপর পরিস্থিতি শান্ত হয়ে মুসলিমদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হলে হত্যাকারীদের শাস্তির দাবি করতে পারতেন। কিন্তু

মুআবিয়া রা. বাইআত গ্রহণের পূর্বে প্রতিশোধ নেওয়ার পক্ষে অটল ছিলেন। যদি আলি রা. প্রতিশোধ গ্রহণ করেন তাহলে আপত্তি নেই। এখানে তাদের শাস্তি প্রদান করাটাই গুরুত্বপূর্ণ। তাই মুআবিয়া রা. বলেছিলেন, আলি রা. যদি খুনিদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেন তাহলে আমরা তার হাতে বাইআত গ্রহণ করব।

আলি রা.-এর গভর্নর পরিবর্তন

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এসে আলি রা.-কে পরামর্শ দেন, তিনি যেন পরিস্থিতি শান্ত হওয়া পর্যন্ত কোনো অঞ্চলের গভর্নর পরিবর্তন না করেন; এতে ফিতনা আরও বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। কিন্তু আলি রা. গভর্নর পরিবর্তনের ব্যাপারে তার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-কে ইয়ামেনের গভর্নর নিযুক্ত করেন। উসমান ইবনে হুনাইফ রা.-কে নিযুক্ত করেন বসরায়। কুফায় নিযুক্ত করেন উমারা ইবনে শিহাব রা.-কে, শামে নিযুক্ত করেন সাহল ইবনে হুনাইফ রা.-কে এবং মিশরে নিযুক্ত করেন কায়স ইবনে সাদ রা.-কে।[১৯৫]

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.[১৯৬] ইয়ামেনে গিয়ে সেখানকার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। উসমান ইবনে হুনাইফ রা. বসরায় গিয়ে মিম্বরে আরোহণ করে সেখানকার অধিবাসীদের মুখোমুখি হন এবং নিজেকে গভর্নর হিসাবে ঘোষণা করেন। তখন বসরার লোকেরা বিভক্ত হয়ে যায়। কেউ তাকে মেনে নেয়। আবার কেউ বলে, উসমান রা.-এর প্রতিশোধ গ্রহণের পরেই আমরা আপনার নেতৃত্ব মেনে নেব।[১৯৭]

কিন্তু অধিকাংশ লোক তার পক্ষে থাকায় ক্ষমতা তার হাতে চলে যায় এবং তিনি বসরার নিয়ন্ত্রণ নিতে সক্ষম হন। এদিকে কুফার প্রবেশদ্বারে তালহা ইবনে খুয়াইলিদ উমারা ইবনে শিহাব রা-এর মুখোমুখি হন। তিনি উমারা ইবনে শিহাব রা.-কে জোরপূর্বক কুফায় প্রবেশ করতে বাধা দেন এবং আলি রা.-এর কাছে ফেরত পাঠিয়ে দেন। কুফার পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ

---

১৯৫. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/২৫৫

১৯৬. সঠিক মতানুযায়ী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-কে ইয়ামেনের দায়িত্ব দেওয়া হয়নি; বরং ইয়ামেনের দায়িত্ব দেওয়া হয় উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-কে। সূত্র : *আমিরুল মুমিনিন আলি ইবনে আবু তালিব রা.*, ড. আলি সাল্লাবি, পৃ. ৩৭৫ -সম্পাদক

১৯৭. *তারিখু ইবনি খালদুন*, ২/৬০৪

করে। আলি রা. নিয়োগপ্রাপ্ত গভর্নরের ক্ষমতা দৃঢ় করার জন্য চিঠি প্রেরণ করেন। তখন আবু মুসা আশআরি রা.-এর পক্ষ থেকে প্রেরিত চিঠি এসে পৌঁছে। তাতে জানানো হয় যে, কুফার অধিকাংশ অধিবাসী আলি রা.-এর পক্ষে আছেন।

এদিকে সাহল ইবনে হুনাইফ রা. শামের এক প্রান্তে মুআবিয়া রা.-এর অশ্বারোহী বাহিনীর মুখোমুখি হন। তারা সাহল ইবনে হুনাইফ রা.-কে জিজ্ঞাসা করেন, কে আপনি?

তিনি বলেন, সাহল ইবনে হুনাইফ।

তারা জিজ্ঞাসা করে, কেন এসেছেন?

তিনি বলেন, আমি গভর্নর হিসাবে এসেছি।

তারা তখন বলে, আপনি যদি উসমান রা.-এর পক্ষ থেকে আসেন তবে স্বাগত জানাচ্ছি। কিন্তু যদি আলি রা.-এর পক্ষ থেকে আসেন তাহলে ফিরে যান। শামে প্রবেশ করতে হলে আপনাকে আমাদের রক্ত মাড়িয়েই প্রবেশ করতে হবে।

তখন সাহল ইবনে হুনাইফ রা. মদিনায় ফিরে যান।[১৯৮]

এদিকে মিশরের গভর্নর কায়স ইবনে সাদ রা. মিশরে পৌঁছে দায়িত্ব বুঝে নিতে সক্ষম হন। তখন মিশরের জনগণ তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। তাদের অধিকাংশই কায়স ইবনে সাদ রা.-এর হাতে বাইআত গ্রহণ করে। কিছু লোক কোনো মতামত দেয়নি, আর কিছু লোক বলেছিল, যারা উসমান রা.-এর রক্তের মূল্য আদায় করবে আমরা তাদের পক্ষে।[১৯৯]

আলি রা. মুআবিয়া রা.-এর কাছে চিঠি পাঠিয়ে তাকে বাইআত গ্রহণে উৎসাহিত করেন, যেন তিনি বিদ্রোহী সাব্যস্ত না হন। কিন্তু মুআবিয়া রা. ইজতেহাদ করে দেখলেন, উসমান রা.-এর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ না করলে আল্লাহ তাআলার পবিত্র কুরআনের বিরোধিতা হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর কুরআনের বিরোধিতা করবে তার হাতে বাইআত গ্রহণ করা বৈধ হবে না। মুআবিয়া রা.-এর মাথায় কখনোই খেলাফত অথবা নেতৃত্বের চিন্তা ছিল না। যেমনটি শিয়াদের গ্রন্থগুলোতে পাওয়া যায়। এমনকি আহলুস সুন্নাহ

---

১৯৮. *তারিখুত তবারি*, ৪/৪৪২; *আল-কামিল ফিত তারিখ*, ২/৫৬৫

১৯৯. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/২৫৬

ওয়াল জামাআর মধ্যে যারা কোনো বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়াই বিভিন্ন বর্ণনা ও মত উল্লেখ করে, তারাও এ কথা প্রচার করে থাকে।

আলি রা. মুআবিয়া রা.-এর কাছে তিনটি চিঠি পাঠান। মুআবিয়া রা. একটিরও জবাব লিখে পাঠাননি।[২০০] তবে আলি রা.-এর কাছে একটি খালি চিঠি প্রেরণ করেন মুআবিয়া রা.। যেন চিঠিটি খোলার পর ফিতনাবাজরা চিঠিবাহককে হত্যা না করে। চিঠি বাহক আলি রা.-এর কাছে প্রবেশ করেই হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে বুঝিয়ে দেন যে, মুআবিয়া রা. বাইআত করবেন না। চিঠিবাহক আলি রা.-কে বলেন, আমি আপনার কাছে নিরাপত্তা চাচ্ছি। তখন আলি রা. তাকে নিরাপত্তা প্রদান করেন। এরপর চিঠিবাহক আলি রা.-কে বলেন, মুআবিয়া রা. আপনাকে বলেছেন যে, তিনি উসমান রা.-এর খুনিদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের পরই বাইআত গ্রহণ করবেন। হয়তো আপনি প্রতিশোধ গ্রহণ করুন, নয়তো আমরাই প্রতিশোধ গ্রহণ করব। আলি রা. তার এ কথায় অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেন, নিশ্চয় মুআবিয়া রা. খেলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে। যারা বিদ্রোহ করে তাদেরকে খেলাফতের অনুগত বাহিনীর মাধ্যমে দমন করা হবে। অর্থাৎ, আলি রা. তার অনুগত বাহিনীর সহায়তায় বিরুদ্ধচারণকারীদের দমন করতে চান।

শামের উদ্দেশে আলি রা.

আলি রা. সেনাবাহিনী প্রস্তুত করে শাম অভিমুখে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। মুআবিয়া রা. যদি বাইআত গ্রহণ না করে তবে তার সঙ্গে লড়াই হবে। পরিস্থিতির বিবেচনায় তার এই ইজতেহাদ ছিল সঠিক।

তাই আলি রা. মুসলিমদের কাছে সহায়তা কামনা শুরু করেন। কুফায় আবু মুসা আশআরি রা., বসরায় উসমান ইবনে হুনাইফ রা., মিশরে কায়স ইবনে সাদ রা. ও ইয়ামেনে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর কাছে চিঠি প্রেরণ করে তাদের কাছে এ বিষয়ে সাহায্য চান। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. তার এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন। কিন্তু আলি রা. নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। তখন হাসান রা. এসে আলি রা.-কে বলেন, বাবা, আপনি এমনটি করা থেকে বিরত হোন। এতে মুসলিমদেরই রক্তপাত হবে এবং তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হবে।

---

২০০. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/২৫৬

আলি রা. তার এ কথা না মেনে যুদ্ধের সিদ্ধান্তে অটল থাকেন এবং শামের উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী প্রস্তুত করতে শুরু করেন।

আলি রা. তার চাচাতো ভাই কুসাম ইবনে আব্বাস রা.-কে মদিনায় তার স্থলাভিষিক্ত করে শামে গমনের জন্য বাহিনী প্রস্তুত করে ফেলেন। বাহিনীর ডান ভাগে ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.। মতের অমিল থাকা সত্ত্বেও তিনি আলি রা.-এর সঙ্গে বের হওয়া থেকে বিরত থাকেননি। বাহিনীর বামদিকের নেতৃত্বে ছিলেন আমর[২০১] ইবনে আবি সালামা রা. এবং অগ্রভাগে ছিলেন আবু লায়লা ইবনে আমর জাররাহ। তিনি ছিলেন আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা.-এর ভাতিজা।[২০২]

আলি রা. যখন তার বাহিনী নিয়ে মদিনা থেকে শাম অভিমুখে বেরিয়ে পড়েছিলেন, তখন মক্কায় এক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে যায়। ফলে আলি রা. তার পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করে ফেলেন।

আয়েশা রা. এবং রাসুল ﷺ-এর অন্যান্য স্ত্রীগণ তখন মক্কায় অবস্থান করছিলেন। শুধু উম্মে হাবিবা রা. অবস্থান করছিলেন মদিনায়। এদিকে তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রা., যুবায়ের ইবনুল আওয়াম রা. ও মুগিরা ইবনে শুবা রা. প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবিগণও তখন মক্কায় ছিলেন। উসমান রা.-এর পক্ষ থেকে নিযুক্ত ইয়ামেনের গভর্নর ইয়ালা ইবনে উমাইয়া তামিমি রা.-ও ফিতনার ঘটনার সময় মক্কায় চলে এসেছিলেন। তার সঙ্গে ছিল ইয়ামেনের বায়তুল মাল তথা রাষ্ট্রীয় কোষাগারের ৬০০ উট ও ৬ লক্ষ দিরহাম। তারা সকলে মিলে সার্বিক অবস্থা বিবেচনার পর, আলি রা.-এর হাতে বাইআত গ্রহণ করা সত্ত্বেও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, উসমান রা.-এর হত্যার প্রতিশোধগ্রহণের বিষয়টি প্রাধান্য দিতে হবে। কোনোভাবেই এই বিষয়ে বিলম্ব করা ঠিক হবে না। দুজন বিশিষ্ট সাহাবি তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রা. ও যুবায়ের ইবনুল আওয়াম রা. ছিলেন এই মতের পক্ষপাতীদের প্রধান। এ বিষয়টিই জঙ্গে জামাল তথা উটের যুদ্ধের ভূমিকা হিসাবে কাজ করেছিল।

---

২০১. **আমর :** তার নাম আমর নয়, বরং উমর।-সম্পাদক

২০২. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/২৫৭

গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্নোত্তর

এক নং প্রশ্ন :

বর্তমানে আমাদের কাছে সবকিছু স্পষ্ট। আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি অমুক সত্যের ওপর রয়েছে, আর অমুক রয়েছে ভুলের ওপর। তাই কখনো আমরা নিজেদের প্রশ্ন করি, অমুক সাহাবি এই মত কেন গ্রহণ করলেন না, আমাদের দৃষ্টিতে তো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, এই মত সঠিক ছিল।

উত্তর : সাহাবিগণের ক্ষেত্রে এমনটি বলা মোটেই সমীচীন নয়। নিশ্চয় প্রত্যেক সাহাবির জন্যই ইসলামে রয়েছে বিশেষ অবস্থান, সম্মান ও মর্যাদা। আলি ইবনে আবু তালেব রা. ছিলেন সে সময়ে উম্মাহর সবচেয়ে বিজ্ঞ ও দূরদর্শী ব্যক্তি। যুবায়ের ইবনুল আওয়াম রা. ছিলেন রাসুল ﷺ-এর সহচর। এমনইভাবে তালহা রা.-এরও রয়েছে বিশেষ মর্যাদা ও অবস্থান। তাকে বলা হতো 'তালহাতুল খাইর' অর্থাৎ কল্যাণময় তালহা। উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রা.-ও ছিলেন বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। তার মতেরও ছিল গ্রহণযোগ্যতা। আমরা দেখতে পাই যে, প্রত্যেক যুগেই যারা বিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ এবং দূরদর্শী ছিলেন। তারা সকলেই নিজ নিজ চিন্তাভাবনা ও গবেষণা অনুযায়ী মত প্রকাশ করতেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আলি রা., যুবায়ের রা., তালহা রা. ও আয়েশা রা. প্রমুখ সাহাবি ছিলেন তৎকালীন সময়ের সবচেয়ে খোদাভীরু ব্যক্তি।

তাদের জ্ঞান, প্রজ্ঞা, খোদাভীরুতা ও অন্যান্য প্রশংসনীয় গুণাবলি থাকার পাশাপাশি প্রত্যেকেই বিষয়টি নিজস্ব চিন্তা-চেতনা, বুদ্ধি ও পর্যবেক্ষণের আলোকে বিচার করেছেন। ফলে তাদের সামসময়িকদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে।

কিন্তু আমাদের এ কী অবস্থা! আমরা একটি ঘটনা সংঘটিত হওয়ার ১৪শ বছর পরে এসেও সেই ঘটনার ওপর রায় প্রদান করতে দ্বিধাবোধ করি না। অথচ আমরা এ কথাও বিশ্বাস করি যে, প্রকৃত ইতিহাসকে ইচ্ছাকৃত কিংবা অজ্ঞতাবশত বিকৃত করা হয়েছে।

আমরা উল্লেখ করেছি যে, অনেক ইতিহাসগ্রন্থে সাহাবিগণের ওপর ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা অজ্ঞতাবশত আঘাত করা হয়েছে। আমাদের স্কুল-ভার্সিটিগুলোয় বিকৃত এবং ভুল ইতিহাস পড়ে পড়ে আমাদের অনেকের কাছেই এগুলো সত্য বলে মনে হয়। এমনকি যারা এই ভুল ইতিহাসের বিপক্ষে বলে তাদের সঙ্গে আমরা তর্কেও জড়িয়ে পড়ি।

এ ক্ষেত্রে আমি বলতে চাই, যদি আপনি কোনো বিষয়ে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে না পারেন, তবে ধরে নিন যে, এ ক্ষেত্রে কিছু বিষয় আপনি এখনো জানেন না। কিন্তু কখনোই এমনটি মনে করবেন না যে, ওই সকল মহান সাহাবি ইচ্ছা করেই এমন ফিতনার সূত্রপাত ঘটিয়েছেন অথবা তারা রাজত্ব, নেতৃত্ব, সম্পদ কিংবা দুনিয়ার লোভে পরস্পর লড়াই করেছেন। তারা হলেন ওই সকল লোক, যাদের ওপর রাসুল ﷺ আমৃত্যু সন্তুষ্ট ছিলেন। বহু আয়াত এবং হাদিসের মাধ্যমে এ কথা জানা যায়। এটি আমাদের আকিদা-বিশ্বাসের অংশ। তাই কেউ যেন ওই সকল মহান সাহাবির ব্যাপারে কোনো মন্দ ধারণা পোষণ করে এই আকিদার বিরোধিতা না করে।

আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। তা হচ্ছে, সাহাবিগণ ও সাম্রাজ্যের দূরদূরান্তে বসবাসকারী লোকদের মধ্যে তখন কোনো শক্তিশালী যোগাযোগব্যবস্থা ছিল না। ফলে তারা ফিতনাবাজদের ছড়িয়ে দেওয়া ভ্রান্ত ও মিথ্যা তথ্য এবং সাহাবিগণের নামে চালিয়ে দেওয়া বানোয়াট চিঠিগুলোর মাধ্যমে প্রভাবিত হয়। যদি এমনটি আজকের আধুনিক যুগে সংঘটিত হতো, যেখানে মোবাইল, টেলিফোন টেলিভিশন ইত্যাদি বিভিন্ন যোগাযোগব্যবস্থা পর্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যমান; তাহলে হয়তো কখনোই পরিস্থিতি এতটা বিপজ্জনক হতো না। ফিতনার মূলহোতারা উসমান রা. এবং অন্যান্য গভর্নরদের অগোচরেই পরিস্থিতি ক্রমেই গুরুতর করে তুলেছিল। উসমান রা. তা জানতে পেরেছিলেন অনেকদিন অথবা অনেক মাস পর। আর লোকদের চিন্তাধারা যদি নষ্ট হয়ে যায় তবে তা সংশোধনে অনেক সময় লেগে যায়। ফলে অনেক মানুষই তখন বিভ্রান্তির শিকার হয়ে পড়েছিল।

তবে যা ঘটেছিল, নিশ্চয় তা ছিল আল্লাহ তাআলার ফয়সালা ও সাহাবিগণের প্রতি পরীক্ষা।

﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا﴾

আর আল্লাহ তাআলার বিধান সুনির্ধারিত। [সুরা আহযাব : ৩৮]

দুই নং প্রশ্ন :

কেউ কেউ প্রশ্ন করেন যে, এই সংকটপূর্ণ মুহূর্তে উসমান রা. সাহাবিগণকে তার পক্ষে প্রতিরোধ করার অনুমতি দিলেন না কেন?

উত্তর : শরিয়তের নিয়ম হলো, একজন ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে দুটি ক্ষতির মধ্যে অপেক্ষাকৃত বড় ক্ষতিকে দূর করতে এবং দুটি উপকারী বস্তুর মধ্য থেকে অধিক উপকারী বস্তুটি অর্জন করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা। তাই যদি কোথাও দুটি নিশ্চিত ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে এবং তন্মধ্যে যেকোনো একটি গ্রহণ করা অনিবার্য হয়ে পড়ে, তাহলে কম ক্ষতির দিকটিই বেছে নিতে হবে: যেন অধিক ক্ষতিকর কিছু না হয়। এমনইভাবে উপকারের ক্ষেত্রে কম উপকারীর চেয়ে অধিক উপকারী বিষয়টিই গ্রহণ করতে হবে। অন্যায় কাজের প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রেও এই নিয়মটি প্রযোজ্য হবে। কোনো অন্যায় কাজকে তার তুলনায় বড় অন্যায় কাজ দিয়ে প্রতিরোধ করা কিছুতেই বৈধ নয়।

এই নিয়মের ওপর ভিত্তি করেই উসমান রা. উপকার এবং ক্ষতির দিকটি তুলনা করেছেন। তখন তিনি দেখতে পেয়েছেন যে, যদি বিষয়টি তাকে হত্যা করা পর্যন্ত গড়ায় এবং এর বিনিময়ে অন্য সকল সাহাবিকে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে ইসলাম এবং মুসলিম উম্মাহর জন্য এটিই অধিক উত্তম তাই তিনি নিজেকে উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত স্থির করে নেন। নিশ্চয় এটি অতুলনীয় বীরত্বের পরিচয়। এটি কোনো নেতিবাচক কাজ, প্রান্তিকতা কিংবা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষমতা নয়। তিনি নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন, যেন সাহাবিগণ ওই সকল বিদ্রোহীদের সঙ্গে লড়াইয়ে জড়িয়ে না পড়েন এমনটি হলে সাহাবিগণ হত্যাকাণ্ডের শিকার হতেন। কারণ, ফিতনাবাজরা সংখ্যায় সাহাবিগণের চেয়ে অনেক বেশি ছিল।

উসমান রা. সবাইকে নির্দেশ দেন; বরং তাদেরকে কসম দিয়ে বলেন যে, যাদের ওপর তার (আনুগত্য প্রাপ্তির) অধিকার রয়েছে, তাদের প্রত্যেকেই যেন তরবারি কোষবদ্ধ করে নেয়। তাই যদি তারা উসমান রা.-এর পক্ষে প্রতিরোধ করতেন তবে এতে তার অবাধ্যতা করা হতো। আলি রা.-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আপনি কীভাবে পারলেন উসমান রা.-কে মৃত্যুর মুখে ছেড়ে আসতে, তখন তিনি এমনই উত্তর দিয়েছিলেন।

তিনি বলেছিলেন, যদি আমরা তার পক্ষে প্রতিরোধ করতাম তবে এতে তারই অবাধ্যতা হতো। কারণ তিনি বলেছিলেন, যে তরবারি উন্মুক্ত করবে সে আমার কেউ নয়।[২০৩]

এমনকি উসমান রা. তার গোলামদের এ কথাও বলেছিলেন যে, যে তার তরবারি কোষবদ্ধ রাখবে সে মুক্ত।

উসমান রা. চেয়েছিলেন যেন কোনোভাবেই ফিতনা সৃষ্টি না হয়।

তিন নং প্রশ্ন :

কেউ কেউ বলেন যে, এত কিছু করেও তো সেই ফিতনার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়নি। জামাল এবং সিফফিনের যুদ্ধে মুসলিমদের রক্ত ঝরেছে!

উত্তর : আমরা বলব, এগুলো উসমান রা.-এর ধারণায় ছিল না। উসমান রা. তার স্বভাবসুলভ মানবিক বিবেচনা থেকে ভেবেছিলেন যে, তিনি যে সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছেন তা শুরুতেই ফিতনাকে থামিয়ে দেবে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে পরিস্থিতি এমনভাবে মোড় নেয়, যা ছিল সাহাবিগণের প্রত্যাশার সম্পূর্ণ বিপরীত। 'আর আল্লাহ তাআলার বিধান সুনির্ধারিত'। [সুরা আহযাব : ৩৮]

এ ধরনের মাসআলা নিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত প্রদানের সময় আমাদের বিবেককে কাজে লাগানো উচিত। কোনো বিষয়ই আবেগ দিয়ে বিচার করা উচিত নয়। উসমান রা.-এর হত্যাকাণ্ড ছিল কদর্য ও ঘৃণ্য, যেমনটি ইতিপূর্বে আর কখনো ঘটেনি। এমতাবস্থায় কেউ কেউ প্রথমেই উসমান রা.-এর রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণের দাবি উঠাতে পারে, ক্রোধবশত কোনো বড় ক্ষতি থেকে বাঁচার লক্ষ্যে অপেক্ষাকৃত ছোট ক্ষতি অবলম্বনের শরয়ি নীতি ভুলে যেতে পারে। এসব বিষয় আলি রা.-এর কাছে একেবারেই পরিষ্কার ছিল। পাশাপাশি তখনও পর্যন্ত তার ক্ষমতা সুদৃঢ় হয়নি। তাই তিনি উসমান রা.-এর খুনিদের ব্যাপারে সাময়িক নীরব থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি যদি খুনিদের থেকে প্রতিশোধ নিতেন, তবে এরপর কখনোই তিনি বিভিন্ন অঞ্চলের পরিস্থিতি শান্ত করতে পারতেন না। তিনি যদি আবেগের বশবর্তী হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতেন, তাহলে কেমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হতো তা আমাদের ভেবে দেখা উচিত। এই সিদ্ধান্তের কী ফলাফল হতো তা নিয়েও আমাদের ভাবা উচিত। তা কি আগের চেয়ে অধিক ক্ষতিকর হতো নাকি কম, এসব নিয়ে

---

২০৩. *আল-ইকদুল ফারিদ*, ৫/৫৩

গভীরভাবে ভাবলেই আমরা সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারব। পাশাপাশি এটাও লক্ষ রাখা উচিত যে, আলি রা. সকল সাহাবির চেয়ে বড় ফকিহ না হলেও তৎকালীন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ফকিহ তিনিই ছিলেন।

চার নং প্রশ্ন :

কেউ কেউ প্রশ্ন তোলেন, তাহলে উসমান রা. ক্ষমতা থেকে সরে গেলেই ফিতনা শেষ হয়ে যেত; তিনি তা কেন করলেন না?

উত্তর : পূর্বেই আমরা আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত সহিহ হাদিস উল্লেখ করেছি। তিনি বলেন, রাসুল ﷺ বলেছেন, হে উসমান, যদি আল্লাহ তাআলা কখনো তোমার হাতে এই ক্ষমতা সঁপে দেন, অতঃপর মুনাফেকরা তোমার শরীর থেকে আল্লাহপ্রদত্ত এই সম্মানের পোশাক খুলে ফেলতে চায়, তবে তুমি খুলবে না। এ কথা তিনি তিনবার বলেন। এই হাদিসের মাধ্যমে স্পষ্টভাবেই বোঝা যায় যে, রাসুল ﷺ তাকে ক্ষমতা ধরে রাখার এবং ওই সকল মুনাফেকদের কথা না শোনার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

রাসুল ﷺ-এর তিনবার পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল যে, উসমান রা.-কে ক্ষমতা ধরে রাখতেই হবে এবং মুনাফেকদের কথা উপেক্ষা করতে হবে। যদি তিনি তা না করে ক্ষমতা ছেড়ে দিতেন তবে সেটা হতো হাদিসের স্পষ্ট বিরোধিতা। হাদিসটি তিরমিজি রহ., ইবনে মাজাহ রহ., আহমাদ রহ. ও হাকিম রহ. প্রমুখ বর্ণনা করেছেন।[২০৪]

তা ছাড়া এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে মুসলিমদের আকিদা-বিশ্বাসের প্রশ্নও। কারণ, মুসলিমদের আকিদা হলো রাসুল ﷺ যা বলেছেন এবং যা নির্ভরযোগ্য সূত্রে রাসুল ﷺ-এর কথা হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে, সেগুলো বিশ্বাস করা। এমনকি রাসুল ﷺ যে অদৃশ্যের সংবাদ প্রদান করেছেন, তার পক্ষে যদি কোনো চাক্ষুষ প্রমাণ নাও থাকে, তবুও তা বিশ্বাস করতে হবে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে উল্লিখিত হাদিস; যা জোরালোভাবে নির্দেশ করে যে, ফিতনা সংঘটিত হওয়ার সময় উসমান রা.-কে খেলাফত আঁকড়ে ধরতে হবে। মুনাফেকদের কাছে তা কিছুতেই ছেড়ে দেওয়া যাবে না।

---

২০৪. *সহিহ ইবনি হিব্বান*, ৬৯১৫; *আল-মুসতাদরাক লিল হাকিম*, ৪৫৪৪; *সুনানুত তিরমিজি*, ৩৭০৫; *সুনানু ইবনি মাজাহ*, ১১২

উসমান রা. দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন রাসুল ﷺ যা বলেছেন তা সত্য। অবশ্যই তার অনুসরণ করা উচিত। রাসুল ﷺ-এর পক্ষ থেকে এ ছিল স্পষ্ট নির্দেশ। আর উসমান রা. কর্তৃক এই নির্দেশের অনুসরণ নিঃসন্দেহে তার খাঁটি ঈমানের প্রমাণ বহন করে।

বস্তুবাদীরা অদৃশ্য বিষয় মেনে নিতে চাইবে না। কিন্তু আমরা কথা বলছি মুমিনদের উদ্দেশে। যে-সকল মুমিনের গুণাবলির ব্যাপারে কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ﴾

যারা অদৃশ্যের প্রতি ঈমান আনে, নামাজ প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদের যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে খরচ করে। [সুরা বাকারা : ৩]

তাই রাসুল ﷺ অদৃশ্যের যে সংবাদ দিয়েছেন তার ওপর নিশ্চিতভাবে ঈমান আনতে হবে। রাসুল ﷺ কীভাবে জানতেন যে, এই ফিতনা উসমান রা.-এর সময়ে ঘটবে?

'নিশ্চয় এটি ছিল আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওহি।' [সুরা নাজম : ৪]

কেন এই মতভিন্নতা

পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, উসমান রা.-এর হত্যাকাণ্ডের পর সকল সাহাবি আলি রা.-এর কাছে সমবেত হন। তিনি খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণে স্পষ্ট অস্বীকৃতি জানান। এরপর অনেক চাপাচাপি এবং অনুরোধের কারণে তিনি খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণে বাধ্য হন। উসমান রা.-কে হত্যার পাঁচদিন পর তিনি খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রা. ও যুবায়ের ইবনুল আওয়াম রা.-ও আলি রা.-এর হাতে বাইআত গ্রহণ করেন। অবশ্য কিছু বর্ণনায় বলা হয়েছে, তারা বাধ্য হয়ে বাইআত গ্রহণ করেছিলেন।[২০৫], [২০৬]

---

২০৫. *তারিখু ইবনি খালদুন*, ২/৬১০

২০৬. এ কথাটি সঠিক নয়। কারণ, সহিহ সূত্রে বর্ণিত একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, তারা স্বেচ্ছায় উসমান রা.-এর হাতে বাইআত গ্রহণ করেছিলেন। সূত্র : *সহিহু ওয়া যয়িফু তারিখিত তবারি* (টীকা অংশ), ৩/৩৭২ (শামেলা)-স

এরপর অন্য সবাই আলি রা.-এর হাতে বাইআত গ্রহণ করে। কিছু লোক বিলম্ব করলেও পরবর্তী সময়ে বাইআত গ্রহণ করে নেয়। আলি রা. ইসলামি সাম্রাজ্যের অধীন প্রতিটি শহরে এ সংবাদ জানিয়ে চিঠি পাঠান। তাই প্রতিটি শহরের দায়িত্বশীলগণের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় আলি রা.-এর কাছে বাইআত গ্রহণের সংবাদ জানিয়ে দেওয়া।

এ সময় পর্যন্ত মদিনার সার্বিক নিয়ন্ত্রণ ফিতনাবাজদের হাতেই ছিল। এর পেছনে রহস্য ছিল তাদের জনবল এবং সামরিক অস্ত্রশস্ত্র। আলি রা.-এর হাতে তখনও সে শক্তি ছিল না, যা প্রয়োগ করে তিনি বিভিন্ন শহরে কোনোরূপ ফিতনা ছাড়াই উসমান রা.-এর খুনিদের বিচারের আওতায় নিয়ে আসতে পারবেন। এসব খুনিদের হত্যা করলে দ্রুতই সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সাম্প্রদায়িক বিদ্রোহ দেখা দিত। তাই আলি রা. সাম্রাজ্যের ভিত মজবুত হওয়া পর্যন্ত ওই সমস্ত খুনিদের বিচার স্থগিত রাখেন। সাম্রাজ্যের ভিত মজবুত হওয়ার পর ওই সকল ফিতনাবাজদের ক্ষেত্রে তিনি যা সমীচীন মনে করেন তাই করবেন। এদের মধ্যে যারা নেতৃত্ব দিয়েছে, প্ররোচিত করেছে কিংবা সরাসরি হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছে তাদেরকে দেওয়া হবে মৃত্যুদণ্ড আর যে-সকল অজ্ঞ লোক প্রবঞ্চনার শিকার হয়ে এটিকে সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ মনে করেছে, তাদের প্রত্যেককেই দেওয়া হবে সমুচিত শাস্তি। কিন্তু এই অস্থির সময়ে এসব রায় কার্যকর করা ছিল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ, তখনও অনেক বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ ছিল বিদ্রোহীদের হাতে। এমনইভাবে ফিতনাবাজ নেতাদের সঙ্গে এমন কিছু গোত্রও ছিল, যারা সদ্য ইসলাম গ্রহণ করেছে। তখনও তাদের অন্তরে সাহাবিগণের মতো ঈমান মজবুত হয়নি।

রাসুল ﷺ সাহাবিগণকে মক্কায় ১৩ বছর দীক্ষা দিয়েছেন। আর মদিনায় আসার পর মুহাজির এবং আনসারদের হৃদয়ে যখন ঈমান মজবুত হয়ে যায়, তখন থেকেই ইসলামি শরিয়তের বিধিবিধান অবতীর্ণ হওয়া শুরু হয়। এর অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের দান করেন রাজত্ব ও ক্ষমতা। এরপর তাদের মধ্যে কোনো বিরোধ দেখা যায়নি। কিন্তু যারা এমন দীক্ষা পায়নি, খেলাফত অথবা ক্ষমতা যদি তাদের হাতে চলে যায়, তবে তাদের হাতে বিরাট বিপদ এবং বিভিন্ন ফিতনা-বিশৃঙ্খলা ঘটে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ফিতনাবাজদের পাশে সমবেত হওয়া এসব গোত্রের মধ্যে ছিল গোত্রীয় সাম্প্রদায়িকতা, দুনিয়া ও নেতৃত্বের লোভ। ফিতনাবাজদের যদি

হত্যা করা হয়, তাহলে ওই সব গোত্র কী ঘটাতে পারে তা আলি রা.-এর জানার সুযোগ ছিল না। তারা সেনা একত্র করে মিশর, কুফা এবং বসরার বিভিন্ন প্রান্তে বিদ্রোহ করবে। প্রতিটি অঞ্চলের গভর্নর নিজ অঞ্চল নিয়ে পৃথক হয়ে যাবে। ইসলামি সাম্রাজ্য হয়ে যাবে খণ্ডবিখণ্ড। যদি ওই সময় উসমান রা.-এর খুনিদের হত্যা করা হতো, তাহলে হয়তো পরিস্থিতি এমনই দাঁড়াত।

তাহলে ইসলামের দাঁড়িপাল্লায় কোনটি বেশি ক্ষতিকর, বর্তমানের মতো ইসলামি সাম্রাজ্য বিভক্ত হয়ে প্রতিটি অঞ্চলের আলাদা আলাদা শাসক হওয়া, নাকি উসমান রা.-এর হত্যাকাণ্ডের বিচারের জন্য কিছুদিন অপেক্ষা করা; অতঃপর যখন ইসলামি সাম্রাজ্যের প্রতিটি প্রান্ত আলি রা.-এর আনুগত্য স্বীকার করবে, ক্ষমতা নিষ্কণ্টক হবে এবং ফিতনার পথ বন্ধ হয়ে যাবে, তখন প্রত্যেককেই যথাযথ শাস্তি প্রদান করা?

মূলত, এসব বিষয় ছিল ইজতেহাদ তথা সাহাবিগণের গবেষণা প্রসূত। এ ক্ষেত্রে কে ঠিক আর কে বেঠিক, তা পূর্ণরূপে স্পষ্ট ছিল না। আলি রা.- কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে অনেক ভেবেচিন্তে এবং পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিতেন।

ফিতনার বিষয়গুলো ছিল খুবই রহস্যময়। যেমন, ফিতনার বর্ণনা দিতে গিয়ে একজন বলেছিলেন, এ নিয়ে অত্যন্ত সহনশীল ব্যক্তিও পেরেশান হয়ে যায়। সাহাবিগণও এ বিষয়টি নিয়ে খুবই চিন্তিত এবং উদ্‌বিগ্ন ছিলেন। তারাও গভীর চিন্তাভাবনা করেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এখন যাদের ইজতেহাদ সঠিক ছিল তারা দুটি সওয়াব পেয়েছেন এবং যারা ভুল করেছেন তারা একটি সওয়াব পেয়েছেন। তারা কেউ নিষ্পাপ নন (তবে আল্লাহ তাআলা তাদের পাপমুক্ত করেই এ পৃথিবী থেকে নিয়ে গিয়েছেন)। তাদের প্রত্যেকেরই ছিল ইজতেহাদ করার যোগ্যতা। এখানে এই প্রশ্ন করার কোনো সুযোগ নেই যে, সবচেয়ে বিজ্ঞ এবং প্রাজ্ঞ আলি রা. বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সাহাবিগণ কেন ইজতেহাদ করতে গেলেন?

নিশ্চয় সকল সাহাবিই ইজতেহাদ করার যোগ্যতা রাখতেন। উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রা., যুবায়ের ইবনুল আওয়াম রা., তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রা., আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. ও সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা. প্রমুখ সকলেই

ছিলেন ইজতেহাদের যোগ্য। তবে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. এ বিষয়ে ইজতেহাদকারীগণ থেকে আলাদা ছিলেন।

দেখা যায়, আলি রা. এবং তার বিরুদ্ধে যারা লড়াই করেছেন তারা সকলেই ছিলেন মুজতাহিদ। একজন মুজতাহিদের অধিকার রয়েছে বিভিন্ন বিষয় মিলিয়ে উপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, তাদের ব্যাপারে মন্দ ধারণা পোষণ করে আমাদের মুখ অথবা বিবেককে কলুষিত না করা। আর প্রতিটি ঘটনা তখনই স্পষ্ট হয়, যখন তা সমাপ্ত হয়ে যায়।

ইতিপূর্বে জেনেছি,আলি রা. উসমান ইবনে হুনাইফ রা.-কে বসরার গভর্নর নিযুক্ত করে পাঠান। তিনি সেখানে গিয়ে মিম্বরে আরোহণ করে সবাইকে জানিয়ে দেন যে, আলি রা. তাকে গভর্নর নিযুক্ত করেছেন। পূর্বের গভর্নর আবদুল্লাহ ইবনে আমের ইবনে কুরাইজ রা. ছিলেন উসমান রা.-এর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের পক্ষে। তিনি ইতিমধ্যে মক্কায় চলে গিয়েছিলেন।

মিশরের গভর্নর নিযুক্ত করা হয় কায়স ইবনে সাদ রা.-কে। সেখানকার অধিকাংশ লোক তার আনুগত্য মেনে নেয়। তবে অল্প কিছু লোক একটি গ্রামে পৃথক হয়ে থাকাকে পছন্দ করে। তারা আলি রা.-এর বাইআত গ্রহণ করেনি। যারা বাইআত গ্রহণ করেছে তাদের সঙ্গে সংঘর্ষেও লিপ্ত হয়নি।

কুফার গভর্নর পদে আবু মুসা আশআরি রা.-কেই বহাল রাখা হয়।

আর শামের কথা! পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, আলি রা. মুআবিয়া রা.-এর উদ্দেশে তিনটি চিঠি প্রেরণ করে তাকে বাইআত গ্রহণের আহ্বান জানান। কিন্তু মুআবিয়া রা.-এর বক্তব্য ছিল প্রথমে উসমান রা.-এর হত্যার প্রতিশোধ নিতে হবে। এরপর বাইআত গ্রহণ করবেন।

মুআবিয়া রা. খেলাফত ও নেতৃত্ব কিংবা ইসলামি সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ লাভে আগ্রহী ছিলেন না। তিনি ছিলেন উসমান রা.-এর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের দাবিতে অনড়, চাই সেই প্রতিশোধ আলি রা.-এর হাতে হোক অথবা তার নিজের হাতে। তার কথা ছিল একটাই, প্রথমে ওই সকল খুনির থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে, এরপরই আলি রা.-এর হাতে বাইআত গ্রহণ করবেন। প্রতিশোধ গ্রহণের আগ পর্যন্ত তিনি কিছুতেই বাইআত গ্রহণ করবেন না। তার সঙ্গে ছিল আরও ৭০ হাজার লোক। যারা দামেশকে মসজিদের মিম্বরের ওপর ঝুলিয়ে রাখা উসমান রা.-এর রক্তমাখা জামা ও

নায়েলা বিনতে ফারাফিসা রহ.-এর হাতের কর্তিত কবজি এবং আঙুলের নিচে দিবানিশি কান্নাকাটি করে যাচ্ছিল।

অবশেষে মুআবিয়া রা. আলি রা.-এর কাছে একটি খালি চিঠি প্রেরণ করেন। কারণ, পথে যদি ফিতনাবাজদের কেউ চিঠি খুলে দেখে, তাহলে যেন চিঠিবাহককে হত্যা না করে। চিঠিবাহক আলি রা.-এর কাছে প্রবেশ করেই হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে বুঝিয়ে দেন যে, মুআবিয়া রা. বাইআত গ্রহণ করবেন না। অতঃপর আলি রা.-কে বলেন, আমি আপনার কাছে নিরাপত্তা চাইছি। তখন আলি রা. তাকে নিরাপত্তা প্রদান করেন। এরপর চিঠিবাহক আলি রা.-কে বলেন, মুআবিয়া রা. আপনাকে বলেছেন যে, তিনি উসমান রা.-এর খুনিদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের পরই বাইআত গ্রহণ করবেন। সুতরাং আপনি প্রতিশোধ গ্রহণ করুন। আর যদি আপনি না পারেন তবে আমরাই প্রতিশোধ গ্রহণ করব।[২০৭] ফিতনাবাজরা চিঠিবাহককে হত্যা করার জন্য উদ্যত হয়েছিল, যেমনটি মুআবিয়া রা. পূর্বেই আশঙ্কা করেছিলেন। কিন্তু আলি রা. তার নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়ে মদিনার বাহির পর্যন্ত পৌঁছে দেন। অতঃপর চিঠিবাহক দামেশকে ফিরে যান।

দেখা যায় যে, আলি রা.-এর পক্ষে সঠিকভাবে বাইআত সম্পন্ন হওয়া এবং বিশিষ্ট ও বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবিগণ আলি রা.-কে খলিফা হিসাবে নির্বাচনে একমত হওয়ার পরও মুআবিয়া রা. আলি রা.-এর বাইআত গ্রহণ প্রত্যাখ্যান করলেন। এর ফলে তিনি খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী সাব্যস্ত হলেন। তাই খলিফা আলি রা. সেনাবাহিনী প্রস্তুতের এবং মুআবিয়া রা.-কে এই বিদ্রোহ থেকে ফেরানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। যদি শান্তিপূর্ণভাবে হয় তাহলে ভালো, নয়তো তার সঙ্গে লড়াই করাই শ্রেয়। অতঃপর তিনি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের গভর্নরদের চিঠি লিখে সেনাবাহিনী প্রস্তুত করে শাম অভিমুখে যাত্রা করার নির্দেশ দেন।

***

২০৭. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/২৫৬; *তারিখু ইবনি খালদুন*, ২/৬০৫

জঙ্গে জামালের প্রেক্ষাপট

আয়েশা রা. ও তার বাহিনীর বসরায় গমনের সিদ্ধান্ত

ইতিপূর্বে জেনেছি, আলি রা. মুআবিয়া রা.-এর সঙ্গে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর তার কাছে মক্কা থেকে সংবাদ আসে। যা তার যাত্রাপথকে পরিবর্তন করে দেয়। আয়েশা রা. ও রাসুল ﷺ-এর অন্যান্য স্ত্রীগণ তখন মক্কায় অবস্থান করছিলেন; শুধু উম্মে হাবিবা রা. ব্যতীত। তিনি মদিনায় অবস্থান করছিলেন। এদিকে তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রা., যুবায়ের ইবনুল আওয়াম রা. ও মুগিরা ইবনে শুবা রা. প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবিগণও তখন মক্কায় ছিলেন। উসমান রা.-এর পক্ষ থেকে নিযুক্ত ইয়ামেনের গভর্নর ইয়ালা ইবনে উমাইয়া তামিমি রা.-ও ফিতনার ঘটনার সময় মক্কায় চলে গিয়েছিলেন। তার সঙ্গে ছিল ইয়ামেনের বায়তুল মাল তথা রাষ্ট্রীয় কোষাগারের ৬০০ উট ও ৬ লক্ষ দিরহাম। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও ছিলেন যারা আলি রা.-এর হাতে বাইআত গ্রহণ করেছেন। এতৎসত্ত্বেও তারা সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, উসমান রা.-এর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণকে প্রাধান্য দিতে হবে। কোনোভাবেই এই বিষয়টিতে বিলম্ব করা ঠিক হবে না। দুজন বিশিষ্ট সাহাবি তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রা. ও যুবায়ের ইবনুল আওয়াম রা. এই মতের পক্ষপাতীদের নেতৃত্বে ছিলেন।

তারা সকলেই আয়েশা রা.-এর সঙ্গে মিলিত হন। প্রথমে উসমান রা.-এর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের ব্যাখ্যা ছিল এই যে, যদি এ সময়ে উসমান রা. হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ না করা হয়, তাহলে এতে আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত একটি বিধানকে অমান্য করা হবে এবং কুরআনে যে কিসাসের বিধানের কথা বলা হয়েছে, তা ছেড়ে দেওয়া হবে। এ বিষয়টিই তাদের চিন্তিত করে রেখেছিল। তারা পেরেশান হয়ে ভাবছিলেন, আল্লাহ তাআলার এমন একটি বিধান প্রয়োগে কীভাবে বিলম্ব করা যেতে পারে!

তারা মনে করেছিলেন, যে ব্যক্তি এই বিধান অমান্য করবে, সেই ব্যক্তির হাতে বাইআত গ্রহণ বৈধ হবে না। আলি রা.-এর ওপর তাদের ব্যক্তিগত কোনো আপত্তি ছিল না; বরং তারা ইজতেহাদ করে দেখেছিলেন যে, প্রথমে

উসমান রা.-এর হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণ করা আবশ্যক। তালহা রা. ও যুবায়ের রা. ইতিমধ্যেই বাইআত গ্রহণ করে ফেলেছিলেন। তাই তাদের জন্য আপত্তি করাও ঠিক ছিল না (এজন্য তারা আপত্তি করেননি)। তারা ইজতেহাদ করে এমনটি বলেছিলেন মাত্র; কিন্তু তাদের এই ইজতেহাদ সঠিক হয়নি। তবে তারা এর বিনিময়ে একটি সওয়াব নিশ্চয় পাবেন। যদিও ধরে নিই যে, তারা দুজন বাধ্য হয়েই বাইআত গ্রহণ করেছিলেন, তবুও তাদের জন্য খলিফার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচারণ বৈধ হবে না এবং মুসলিমদের ঐকমত্য ছাড়া শাসককে অপসারণ করা যাবে না।

মক্কায় যারা ছিলেন তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, তারা সেনাবাহিনী প্রস্তুত করবেন এবং উসমান রা.-এর হত্যাকারীদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। কারণ, আলি রা.-এর পক্ষে একা তাদের সঙ্গে লড়াই করা সম্ভব নয়। আয়েশা রা. এবং রাসুল ﷺ-এর অন্য সকল স্ত্রীগণ এ ক্ষেত্রে সহমত পোষণ করেন।

কিছু লোক শামে গিয়ে মুআবিয়া রা.-এর কাছে সাহায্য চাওয়ার মতও প্রকাশ করেন। তখন আবদুল্লাহ ইবনে আমের রা. বলেন, নিশ্চয় মুআবিয়া রা. শামে আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। তিনি তাদের বসরায় যাওয়ার পরামর্শ দেন। যেখানে তিনি ইতিপূর্বে গভর্নর হিসাবে ছিলেন। সেখানে গেলে আরও অধিক সহায়তা এবং জনবল পাওয়া যাবে। সেখানে তার অনেক ভক্ত রয়েছে। তিনি আরও বলেন, তালহা রা.-এরও সেখানে অনেক ভক্ত রয়েছে। তিনি দীর্ঘ সময় সেখানে গভর্নর হিসাবে ছিলেন এবং বসরার জনগণ তার মাধ্যমে প্রভাবিত হয়েছে। তাই আবদুল্লাহ ইবনে আমের রা. বসরা যাওয়ার পক্ষে মত দেন। সেখানে উসমান রা.-এর যে-সকল খুনি অবস্থান করছে প্রথমে তাদের হত্যা করে প্রতিশোধ গ্রহণ শুরু হবে। অতঃপর জনবল এবং শক্তি বাড়িয়ে তারা মদিনায় এসে অবশিষ্ট খুনিদের পাকড়াও করবেন।

সকলেই এই মতে সন্তুষ্ট হলেন। কিন্তু আয়েশা রা. দ্বীমত প্রকাশ করলেন। তখন সবাই আয়েশা রা.-কে বললেন,

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾

তাদের অধিকাংশ শলাপরামর্শে কোনো কল্যাণ নেই। তবে যারা সদকা করার, সৎ কাজের এবং মানুষের মধ্যে সংশোধন করার নির্দেশ দেয় তারা ভিন্ন। আর যারা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এ কাজ করে অচিরেই আমি তাদেরকে বিরাট প্রতিদান দেবো। [সুরা নিসা : ১১৪]

আমরা লোকেদের মধ্যে মীমাংসা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই এই অভিযানে বের হচ্ছি। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾

তোমরা নিজ নিজ গৃহে অবস্থান করো। [সুরা আহযাব : ৩৩]

আমাদের এই অভিযান আল্লাহ তাআলার এ কথার বিরোধী হবে না।

একমাত্র হাফসা রা. ব্যতীত রাসুল ﷺ-এর অন্য সকল স্ত্রী বসরা গমনে অস্বীকৃতি জানান। হাফসা রা. আয়েশা রা.-এর সঙ্গে বসরায় গমনের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু তার ভাই আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. তাকে বলেন, এখন ফিতনার সময়। তাই আপনার উচিত বের না হয়ে নিজ ঘরেই অবস্থান করা।

অতঃপর আয়েশা রা. যখন তার সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলেন তখন তিনি জানান, তার ভাই আবদুল্লাহ ইবনে উমর তাকে নিষেধ করেছেন। তখন আয়েশা রা. বলেন, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন।[২০৮]

এখান থেকে বসরায় গমনের ব্যাপারে আয়েশা রা.-এর সন্তুষ্টি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. কর্তৃক হাফসা রা.-কে বসরায় যেতে নিষেধ করাকে গুনাহ মনে করেছিলেন এবং আল্লাহ তাআলার কাছে তার জন্য ক্ষমা চেয়েছিলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর অবস্থান ছিল, ফিতনা থেকে দূরে থাকা। তিনি এই ফিতনাকে মনে করতেন মুসলিম উম্মাহর ওপর নেমে আসা কালো মেঘ, যার কারণে কেউ কোনো কিছু দেখতে পাচ্ছে না।

প্রত্যেকেই নিজ নিজ পথ ধরে সঠিক গন্তব্যে পৌঁছতে চাচ্ছে। একদল লোক এক পথে হেঁটেছেন, অতঃপর তারা সঠিক গন্তব্যে পৌঁছতে পেরেছেন। এরা ছিলেন আলি রা. ও তার সহচরবৃন্দ। আরেকদলও ইজতেহাদ করে সঠিক গন্তব্যে পৌঁছতে চেয়েছেন। কিন্তু তারা পৌঁছতে পারেননি। মুআবিয়া রা. ও

---

২০৮. *তারিখুত তবারি*, ৪/৪৫৪

তার সঙ্গীগণ ছিলেন এ দলের। আর কিছু লোক এই দুশ্চিন্তার কালো মেঘ সরে যাওয়ার অপেক্ষা করছিলেন। সরে যাওয়ার পর তারা নিজেদের চিন্তাভাবনা প্রকাশ করবেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. ছিলেন এ দলের লোক। তবে পরবর্তী সময় তিনি বলেছিলেন, মুজাহিদ অর্থাৎ আলি রা. ই উত্তম। অথচ তিনি যে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তা ছিল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ এমনকি তাতে ভুলের আশঙ্কাও ছিল।

আলি রা. কাউকেই তার সঙ্গে বের হওয়ার জন্য বাধ্য করেননি; বরং বিষয়টি সকলের ঐচ্ছিক ছিল। তাই যদি কেউ আলি রা. থেকে পৃথক হয়ে যান, তবে এতে তাদের কোনো অপরাধ নেই এবং কোনোভাবেই তাদের জোর করা যাবে না।

আয়েশা রা. মক্কা থেকে তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রা., যুবায়ের ইবনুল আওয়াম রা. ও তার পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. প্রমুখ সাহাবিগণকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা.-কে ইমামতির জন্য নির্বাচিত করেন।[২০৯] পিতার উপস্থিতিসত্ত্বেও আয়েশা রা. আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা.-কেই সবচেয়ে বিজ্ঞ মনে করতেন। ইয়ালা ইবনে উমাইয়া তামিমি রা. ইয়ামেন থেকে মক্কা অভিমুখে ফিরে আসার সময় সঙ্গে করে যে ৬০০ উট এবং সরঞ্জাম নিয়ে এসেছিলেন সেগুলোর মাধ্যমেই এই বাহিনী প্রস্তুত করা হয়।

মক্কা থেকে বের হওয়ার সময় তারা সংখ্যায় ছিলেন ৯০০জন। কিন্তু অল্প সময়ের ব্যবধানেই বসরা গমন পথে তাদের লোক সংখ্যা ৩ হাজার হয়ে যায়। তারা সকলে মিলে আয়েশা রা.-এর জন্য একটি উট ক্রয় করে দেন এবং তিনি উটের পিঠের হাওদায় বসে বসরা অভিমুখে যাত্রা করেন।

আলি রা. এসব বিষয় যখন জানতে পারেন, তখন তিনি শাম অভিমুখে প্রায় বেরিয়ে পড়ছিলেন। কিন্তু এই নতুন সংবাদ শুনে তিনি কিছুদিন অপেক্ষা করে পরিস্থিতি কোনদিকে গড়ায়, তা দেখার সিদ্ধান্ত নেন।

আয়েশা রা. ও তার বাহিনীর বসরায় পদার্পণ

মক্কা থেকে আয়েশা রা.-এর বাহিনী বসরায় পৌঁছে যায়। শহরে প্রবেশ করার পূর্বে তারা আলি রা.-এর পক্ষ থেকে নিযুক্ত বসরার গভর্নর উসমান ইবনে

---

২০৯. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/২৫৮

হুনাইফ রা.-এর কাছে কয়েকটি চিঠি প্রেরণ করে সামরিক সাহায্য সংগ্রহ এবং উসমান রা.-এর খুনিদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের লক্ষ্যে আয়েশা রা.-এর বাহিনীর জন্য বসরা শহর খালি করে দিতে বলেন। বসরার অধিবাসীদের মধ্য থেকে কারা উসমান রা.-এর হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল, কারা এর পক্ষে মত দিয়েছিল এবং কারা মত দেয়নি এ ব্যাপারে উসমান ইবনে হুনাইফ রা. কিছুই জানতেন না। তবে জানা যায় যে, উসমান রা.-কে হত্যা করার পর হত্যাকাণ্ডের অন্যতম মূলহোতা হাকিম ইবনে জাবালা মদিনা থেকে বসরায় পালিয়ে গিয়েছিল। একটি অজ্ঞাত স্থানে সে আত্মগোপন করেছিল। আর সে ছিল একটি বড় গোত্রের সদস্য এবং নিজ সম্প্রদায়ের সর্দার।

অতঃপর আয়েশা রা. এবং উসমান ইবনে হুনাইফ রা.-এর মধ্যে দূত মারফত কথাবার্তা চলতে থাকে। এ সময় আয়েশা রা.-এর সঙ্গে যুবায়ের ইবনুল আওয়াম রা. ও তালহা রা.-ও ছিলেন।

উসমান ইবনে হুনাইফ রা. জিজ্ঞাসা করেন, আপনারা কেন এসেছেন?

আয়েশা রা. বলেন, আমরা কেবল মীমাংসা ও শান্তি চাই।

অর্থাৎ, বসরায় আসার পেছনে তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করা। আর তারা মনে করেন যে, উসমান রা.-এর খুনিদের হত্যা করা ছাড়া কখনো মুসলিম উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ হতে পারবে না।

উসমান ইবনে হুনাইফ রা. তালহা রা. ও যুবায়ের রা.-কে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞাসা করেন, আপনারা কি আলি রা.-এর হাতে বাইআত গ্রহণ করেননি?

তারা বলেন, আমরা অনিচ্ছায় বাইআত গ্রহণ করেছি।[২১০]

অতঃপর উসমান ইবনে হুনাইফ রা. মিম্বরে দাঁড়িয়ে লোকদের কাছে এ বিষয়ে পরামর্শ কামনা করেন। তখন আসওয়াদ ইবনে সুরাই নামক এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে যান। তিনি বলেন, উসমান রা.-এর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মক্কা থেকে আগত এই বাহিনীর সঙ্গে যদি বসরাবাসীরা ওই সকল খুনিদের বসরা থেকে নির্মূল করার লক্ষ্যে নিজেদের হাত মেলায়, তবে এতে আপত্তির কিছু দেখি না। এ কথা বলার পরপরই তার ওপর পাথর নিক্ষেপ শুরু হয়। তখন উসমান ইবনে হুনাইফ রা. বুঝে যান যে, বসরায় অবশ্যই খুনিদের সহযোগী রয়েছে। উসমান রা.-এর খুনিদের এ মুহূর্তে হত্যা করা

---

২১০. *তারিখু ইবনি খালদুন*, ২/৬০৯

হলে আলি রা. যেমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা করেছিলেন, তা প্রায় বাস্তবায়িত হয়ে যাচ্ছিল।[২১১]

তখন বসরার গভর্নর উসমান ইবনে হুনাইফ রা. আয়েশা রা.-এর বাহিনীকে বসরায় প্রবেশ করতে নিষেধ করেন। আয়েশা রা.-এর বাহিনী থেকে জানানো হয়, তারা তাহলে জোরপূর্বক বসরায় প্রবেশ করবেন। তখন উসমান ইবনে হুনাইফ রা. তার বাহিনী নিয়ে বসরার সীমান্তে অবস্থান করেন। অতঃপর তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রা. দাঁড়িয়ে লোকদেরকে উসমান রা. হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। এরপর যুবায়ের ইবনুল আওয়াম রা. লোকদের উদ্দেশে বক্তব্য প্রদান করেন। কিন্তু তাদের অবস্থা পূর্বের মতোই থেকে যায়। অতঃপর আয়েশা রা. দাঁড়িয়ে এক জ্বালাময়ী বক্তব্য প্রদান করেন, ফলে উসমান রা.-এর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য লোকদের অন্তর বিগলিত হয়ে যায়। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত কোনো হদ প্রয়োগে বিলম্ব করে, সেই হদ বাস্তবায়ন করার পরই তার হাতে বাইআত গ্রহণ ওয়াজিব হবে। আমরা এই হদ বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যেই এসেছি। যদি আলি এই হদ বাস্তবায়নের দায়িত্ব নেন এবং অপরাধীদের ওপর হদ প্রয়োগ করেন, তাহলে আমরা তার বাইআত গ্রহণ করব।

আয়েশা রা.-এর বক্তব্যের পর উসমান ইবনে হুনাইফ রা.-এর বাহিনী দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল চলে যায় আয়েশা রা. এবং তার বাহিনীর সঙ্গে। আরেকদল থেকে যায় উসমান ইবনে হুনাইফ রা.-এর সঙ্গে। এতে আয়েশা রা.-এর পক্ষ শক্তিশালী হয়ে যায় এবং উসমান ইবনে হুনাইফ রা. এবং তার সঙ্গে থাকা আলি রা.-এর অনুগত বাহিনী দুর্বল হয়ে পড়ে। এদের মধ্যে অনেকেই ছিল উসমান রা.-এর হত্যার সমর্থক। তাদের গোত্র থেকে অনেকেই উসমান রা.-এর হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছিল। যদিও এরা সরাসরি হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেনি, কিন্তু তারাও নিজেদের হাতে ক্ষমতার চাবিকাঠি দেখতে চাইত। পরিস্থিতি দেখার পর উসমান ইবনে হুনাইফ রা. সামনে কী করবেন তা নিয়ে ভাবতে থাকেন। তিনি কি ফিতনা নির্মূল করার লক্ষ্যে সন্ধিস্থাপন করবেন নাকি আলি রা.-এর কাছে চিঠি পাঠাবেন।

---

২১১. আল-কামিল ফিত তারিখ, ২/৫৭৫

ফিতনাবাজরা সন্ধির ব্যাপারে চিন্তা করে শঙ্কিত হয়ে ওঠে। কারণ, এমনটি তাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে না। তখন হাকিম ইবনে জাবালা এবং তার গোত্রের কিছু লোক যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটায়। তারা আয়েশা রা.-এর বাহিনীর ওপর তির নিক্ষেপ শুরু করে। আয়েশা রা.-এর বাহিনীও দিতে থাকে পাল্টা জবাব। এভাবেই দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ চলতে থাকে এবং বাড়তে থাকে হতাহতের সংখ্যা। উসমান ইবনে হুনাইফ রা. এই পরিস্থিতি দেখে সন্ধি এবং সমঝোতা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। তখন আয়েশা রা.-এর বাহিনীতে থাকা সাহাবিগণ লড়াই থামিয়ে দেন। অতঃপর আয়েশা রা. এবং উসমান ইবনে হুনাইফ রা.-এর বাহিনী বসরা থেকে মদিনার উদ্দেশে দূত প্রেরণ করতে একমত হয় এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করার জন্য যে, তালহা রা. ও যুবায়ের রা. সত্যিই অনিচ্ছায় বাইআত গ্রহণ করেছিলেন কি না।

তারা যদি অনিচ্ছায় বাইআত গ্রহণ করে থাকেন তাহলে উসমান ইবনে হুনাইফ রা. বসরাকে আয়েশা রা.-এর বাহিনীর জন্য উন্মুক্ত করে দেবেন। আর যদি তারা দুজন স্বেচ্ছায় বাইআত গ্রহণ করে থাকেন তবে তারা বসরা ছেড়ে মক্কায় ফিরে যাবেন। বসরার বিচারক কাব ইবনে সাওর রহ.-কে মদিনার উদ্দেশে প্রেরণ করা হয়। তিনি মদিনায় পৌঁছে লোকদের সামনে দাঁড়িয়ে বসরায় যা ঘটেছে তার ইতিবৃত্ত বর্ণনা করেন। সেদিন ছিল জুমার দিন। তিনি লোকদের জিজ্ঞাসা করেন, তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ এবং যুবায়ের ইবনুল আওয়াম কি স্বেচ্ছায় বাইআত গ্রহণ করেছিলেন নাকি অনিচ্ছায়?

তখন রাসুল ﷺ-এর প্রিয়পাত্র এবং প্রিয়পাত্রের পুত্র উসামা ইবনে যায়দ রা. দাঁড়িয়ে বলেন, তারা অনিচ্ছায় বাইআত গ্রহণ করেছিলেন।

তখন মদিনায় অবস্থানরত ফিতনাবাজরা তাকে প্রায় মেরেই ফেলতে চেয়েছিল। সুহাইব ইবনে সিনান রুমি রা. ও আবু আইয়ুব আনসারি রা. দুজন তাকে উদ্ধার করেন এবং বলেন, আমরা যেভাবে নীরব ছিলাম, তুমি কি সেভাবে নীরব থাকতে পারতে না?

কাব ইবনে সাওর রহ. বসরায় ফিরে গিয়ে লোকদের জানিয়ে দেন যে, তালহা এবং যুবায়ের রা. অনিচ্ছায় বাইআত গ্রহণ করেছেন।[২১২]

২১২. *আল-কামিল ফিত তারিখ*, ২/৫৭৬

আলি রা. কাব ইবনে সাওর রহ.-এর আগমন এবং এই খবর নিয়ে প্রস্থানের ব্যাপারে জানতে পারেন। তখন তিনি উসমান ইবনে হুনাইফ রা.-এর কাছে চিঠি পাঠিয়ে এই সন্ধির ফিকহি দিকগুলো স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন যে, এমনটি করা কিছুতেই জায়েজ হবে না। যদিও তারা দুজন অনিচ্ছায় বাইআত গ্রহণ করেছে, তবুও তাদের হাতে ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। খলিফাকে অনুসরণ করাই হচ্ছে সঠিক পন্থা। উসমান ইবনে হুনাইফ রা. তার বাহিনীর দুর্বলতা দেখে বাধ্য হয়েই সন্ধি স্থাপনে রাজি হয়েছিলেন। এবার তিনি আয়েশা রা.-এর বাহিনীর হাতে বসরা সমর্পণ না করার সিদ্ধান্তেই অটল থাকেন। ফলে আবারও সংঘর্ষ বেধে যায়। এতে হাকিম ইবনে জাবালা এবং বসরার ৬০০ লোক নিহত হয়। উসমান ইবনে হুনাইফ রা.-কে বন্দি করা হয়। তবে পরে তাকে হত্যা না করে মুক্ত করে দেওয়া হয়।

এ সংবাদ জানতে পেরে আলি রা. ৯০০ সেনার এক বাহিনী নিয়ে বসরার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েন। তাদের নিয়ে তিনি যিকার নামক স্থানের উদ্দেশে রওনা হন। তখন ইবনে আবি রিফাআ নামক এক ব্যক্তি আলি রা.-এর মুখোমুখি হয়ে বলেন, হে আমিরুল মুমিনিন, আপনি কী চান এবং আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?

আলি রা. তাকে বললেন, আমি চাই মীমাংসা করতে, যদি তারা আমার প্রস্তাবে সাড়া দেয়।

ইবনে আবি রিফাআ বললেন, যদি তারা সম্মত না হয়?

আলি রা. বললেন, তবে তাদের বিশ্বাসঘাতকতার ওপরেই তাদের ছেড়ে দেবো। তাদের হক তাদের প্রদান করব এবং ধৈর্যধারণ করব।

ইবনে আবি রিফাআ বললেন, যদি এতেও তারা সম্মত না হয়?

আলি রা. বললেন, আমরা তাদের ছেড়ে দেবো, যদি তারা আমাদেরও ছেড়ে দেয়।

ইবনে আবি রিফাআ বললেন, যদি তারা আমাদের না ছাড়ে?

আলি রা. বললেন, তবে তরবারির মাধ্যমে তাদের প্রতিরোধ করব।

ইবনে আবি রিফাআ বললেন, তাহলে ঠিক আছে। এই বলে তিনিও তাদের সাথে রওনা হন।

হাজ্জাজ ইবনে গাজিয়্যা আনসারি রা. আলি রা.-কে বলেন, যেভাবে আপনি আমাকে কথার মাধ্যমে সন্তুষ্ট করেছেন, তেমনইভাবে আমি আপনাকে কাজের মাধ্যমে সন্তুষ্ট করব। অবশ্যই আল্লাহ তাআলা আমাদের সাহায্য করবেন, যেভাবে তিনি আমাদের নাম দিয়েছেন আনসার তথা সাহায্যকারী।[২১৩]

যিকারে পৌঁছার পূর্বে উসমান ইবনে হুনাইফ রা. আলি রা.-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং বসরায় ৬০০-এর অধিক লোক নিহত হওয়ার ব্যাপারে তাকে অবহিত করেন। তখন আলি রা. বলে ওঠেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

তখন তিনি তার পুত্র হাসান রা., কাকা ইবনে আমর রা. এবং আম্মার ইবনে ইয়াসির রা.-কে কুফায় সাহায্য চাওয়ার উদ্দেশ্যে পাঠান।

কুফার গভর্নর আবু মুসা আশআরি রা. ছিলেন ইবনে উমর রা.-এর মতো ফিতনা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা থাকার পক্ষে। তিনি মনে করতেন, মুসলিমগণ একে অপরকে তরবারি দিয়ে আঘাত করা কিছুতেই সমীচীন হবে না। তখন হাসান রা., কাকা ইবনে আমর রা. এবং আম্মার ইবনে ইয়াসির রা. কুফার মসজিদে দাঁড়িয়ে লোকদের তাদের সঙ্গে বের হওয়ার ব্যাপারে উদ্‌বুদ্ধ করতে থাকেন। কিন্তু এর আগেই আবু মুসা আশআরি রা. লোকদের বলেছিলেন, এ ব্যাপারে নীরব থাকা এবং দুই দলের কারও পক্ষাবলম্বন না করাই উত্তম। এ সময় কুফার এক ব্যক্তি আগত তিনজন সাহাবিকে খুশি করার উদ্দেশ্যে আয়েশা রা.-কে গালিগালাজ করতে শুরু করে। সে ভেবেছিল এতে তারা সন্তুষ্ট হবেন।

তখন আম্মার ইবনে ইয়াসির রা. ওই ব্যক্তিকে বললেন, চুপ কর, হে নরাধম ও নিকৃষ্ট। অতঃপর তিনি বললেন, নিশ্চয় আমি জানি, তিনি দুনিয়া ও আখেরাতে রাসুল ﷺ-এর সহধর্মিণী। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আপনাদের পরীক্ষায় ফেলেছেন যে, আপনারা আলির অনুসরণ করেন নাকি আয়েশার।[২১৪] *সহিহ বুখারি*-তে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে।

অতঃপর হুজর ইবনে আদি রা. দাঁড়িয়ে কুফার লোকদের বলেন, আপনারা সকলেই হালকা অথবা ভারী রণসম্ভার নিয়ে আমিরুল মুমিনিনের সাহায্যের জন্য

২১৩. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/২৬২

২১৪. *সহিহ বুখারি*, ৭১০০, ৩৭৭২; *সুনান* ...; *আল-মুসতাদরাক লিল হাকিম*, ৫৬৮৪

বের হন এবং নিজেদের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় তার পক্ষে লড়াই করুন। এটিই আপনাদের জন্য উত্তম, যদি আপনারা বুঝতে পারেন।

কুফার লোকেরা আগত তিনজন সাহাবির সঙ্গে সহমত পোষণ করতে শুরু করে। অতঃপর তারা ১২ হাজার লোক সঙ্গে নিয়ে কুফা থেকে বেরিয়ে পড়েন।[২১৫]

বনু তাই নামক গোত্রের কিছু লোক আলি রা.-এর কাছে এসে বলে, আমাদের মধ্য থেকে কিছু লোক আপনার সঙ্গে যেতে চান এবং কিছু লোক আপনার কাছে আত্মসমর্পণের জন্য এসেছেন।

তখন আলি রা. বললেন, উভয়টিই উত্তম। এরপর তিনি তেলাওয়াত করেন,

﴿وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ أَجْرًا عَظِيْمًا﴾

> আল্লাহ তাআলা বসে থাকা ব্যক্তিদের ওপর মুজাহিদদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে বিরাট প্রতিদান দান করেছেন। [সুরা নিসা : ৯৫]

যিকারের উদ্দেশে যাত্রাপথে কুফার লোকদের সাক্ষাৎ হয় আলি রা.-এর প্রধান উপদেষ্টা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর সঙ্গে। তিনি লোকদের উদ্দেশে বলেন, হে কুফাবাসী, আপনারা অনারব পারস্যের রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন এবং তাদের চূর্ণ করে দিয়েছেন। আমরা আপনাদের তলব করেছি আমাদের সঙ্গে বসরার ভাইদের মুখোমুখি বসার জন্য। যদি তারা ফিরে যান তবে ভালো। আমাদের উদ্দেশ্য এটিই। আর যদি তারা অস্বীকৃতি জানান তাহলে নম্রতার সঙ্গে তাদের আমরা আহ্বান করব, যতক্ষণ না তারা আমাদের ওপর অত্যাচার শুরু করে। যে কাজে ফিতনার আশঙ্কা রয়েছে সেই তুলনায় যে কাজে কল্যাণ রয়েছে সেটিকেই আমরা প্রাধান্য দেবো। ইনশাআল্লাহ।

অতঃপর সকলেই তার এ কথায় একমত হয়।[২১৬]

কাকা ইবনে আমর রা. ও সন্ধির সুসংবাদ

যিকারে সমবেত হওয়ার পর আলি রা.-এর বাহিনী বসরা অভিমুখী হয়। এ সময়ের মধ্যে আলি রা.-এর সমর্থকগণ তার কাতারে এসে সমবেত হতে থাকেন এবং আয়েশা রা.-এর সমর্থকগণ সমবেত হতে থাকেন তার বাহিনীর

২১৫. *তারিখুত তবারি*, ৪/৪৮৫; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/২৬৪
২১৬. *তারিখুত তবারি*, ৪/৪৭৮; *আল-কামিল ফিত তারিখ*, ২/৫৯১; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/২৬৪

কাতারে। এভাবে আলি রা.-এর বাহিনীর সদস্যসংখ্যা দাঁড়ায় ২০ হাজার এবং আয়েশা রা.-এর বাহিনীর সদস্য হয়ে যায় ৩০ হাজার। অতঃপর উভয় বাহিনীই বসরার নিকটবর্তী হয়ে যায়। দুইপক্ষের কোনো পক্ষই লড়াইয়ে আগ্রহী ছিল না। তখন আলি রা. কাকা ইবনে আমর রা.-কে প্রেরণ করেন আয়েশা রা., তালহা রা. ও যুবায়ের রা.-এর সঙ্গে সমঝোতা এবং সন্ধিচুক্তি নিয়ে কথা বলার জন্য। কাকা ইবনে আমর রা. আয়েশা রা.-কে বলেন, উম্মুল মুমিনিন, কেন আপনি এই শহরে এলেন?

আয়েশা রা. বললেন, বৎস, আমি এসেছি লোকদের কল্যাণ এবং মীমাংসার উদ্দেশ্যে।

অতঃপর কাকা ইবনে আমর রা. আয়েশা রা.-কে তালহা রা. ও যুবায়ের রা.-কে ডাকার অনুরোধ করলেন। তিনি তাদের সংবাদ পাঠালে তারা এসে উপস্থিত হন। কাকা ইবনে আমর রা. তাদের উদ্দেশে বলেন, আমি উম্মুল মুমিনিনকে তার এখানে আগমনের কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি জবাব দিয়েছেন যে, তিনি লোকদের কল্যাণ ও মীমাংসার লক্ষ্যেই এসেছেন।

তারা দুজন বললেন, আমাদেরও একই উদ্দেশ্য।

তখন কাকা ইবনে আমর রা. বললেন, তাহলে সেই মীমাংসার পদ্ধতি কী? কীভাবে তা সম্ভব হতে পারে? আল্লাহর শপথ! যদি আমরা সেটাকে মীমাংসা ও সমাধানের সঠিক পদ্ধতি মনে করি তবে আমরা সন্ধি করব, আর যদি সেটাকে সঠিক পদ্ধতি মনে না করি তবে সন্ধি করব না।

তারা দুজন বললেন, উসমান রা.-এর খুনিদের শাস্তি দিতে হবে। যদি এই শাস্তি প্রদান না করা হয় তাহলে কুরআনকে অমান্য করা হবে।

কাকা ইবনে আমর রা. বললেন, আপনারা বসরায় উসমান রা.-এর যে-সকল খুনি ছিল তাদের হত্যা করেছেন। আর ইতিপূর্বে আপনারা আজকের চেয়ে অধিক দৃঢ় ছিলেন। আপনারা ৬০০জনকে হত্যা করেছেন। এ কারণে ৬ হাজার লোক আপনাদের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে আপনাদের ছেড়ে চলে গিয়েছে। আপনারা হুরকুস ইবনে যুহাইরকে[২১৭] তলব করেছেন। কিন্তু ৬ হাজার লোক তাকে নিরাপত্তা দিচ্ছে। এখন যদি আপনারা তাকে ছেড়ে দেন, তাহলে আপনাদের কথামতো আপনারাই কুরআন অমান্য করলেন। আর যদি

২১৭. **হুরকুস ইবনে যুহাইর :** সে ছিল খারেজিদের একজন। ৩৭ হিজরিতে মারা যায়।-সম্পাদক

আপনারা তাদের সঙ্গে লড়াই করেন এবং ক্ষিপ্ত লোকেরা আপনাদের শত্রুপক্ষকে সাহায্য করে, তবে আপনারা যে বিভেদ এড়াতে চাচ্ছেন তাই সৃষ্টি হবে; বরং বিশৃঙ্খলা আরও বৃদ্ধি পাবে।

অর্থাৎ, উসমান রা.-এর খুনিদের হত্যার মাধ্যমে আপনারা মীমাংসা এবং কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন ঠিকই, কিন্তু এমনটি করলে এর ফলাফল কল্যাণকর না হয়ে অধিক ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াবে। যেমনইভাবে ৬ হাজার লোকের প্রতিরোধের কারণে আপনারা হুরকুস ইবনে যুহাইরের ওপর প্রতিশোধ নিতে পারেননি, তেমনইভাবে আলি রা.-ও এ কারণেই এ সময়ে উসমান রা.-এর খুনিদের ছাড় দিচ্ছেন। তিনি পূর্ণ ক্ষমতালাভের আগ পর্যন্ত উসমান রা.-এর খুনিদের শাস্তি বিলম্বিত করছেন। এখন সাম্রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তেই লোকেরা বিভিন্ন ধরনের কথা বলছে। অতঃপর তিনি তাদের জানিয়ে দিলেন যে, রবিআ এবং মুজার গোত্রের কিছু লোক বসরার লোকদের হত্যা করার কারণে তাদের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য সমবেত হয়েছে।

উপস্থিত লোকেরা কাকা ইবনে আমর রা.-এর কথায় প্রভাবিত হতে শুরু করে।

তখন আয়েশা রা. তাকে বলেন, এ ব্যাপারে তোমার কী অভিমত?

তিনি বললেন, আমার মত হচ্ছে, যা ঘটে গিয়েছে এর একমাত্র প্রতিষেধক হচ্ছে সবার শান্ত হয়ে যাওয়া। পরিস্থিতি শান্ত হয়ে গেলেই প্রতিকারের ব্যবস্থা হবে। যদি আপনারা আমাদের সঙ্গে বাইআত গ্রহণ করেন তবে তা উত্তম ও কল্যাণকর। এতেই প্রতিশোধ গ্রহণ সম্ভব। কিন্তু আপনারা যদি অস্বীকার করেন তবে বিষয়টি আরও গুরুতর হয়ে দাঁড়াবে। এটি হবে আমাদের জন্য অনিষ্টকর এবং এই সাম্রাজ্যের পতনের কারণ। তাই আপনারা নিরাপত্তাকে প্রাধান্য দিন। অবশ্যই আপনাদের তা দেওয়া হবে। এভাবেই আপনারা হয়ে উঠুন কল্যাণের উৎস, যেমনইভাবে ইতিপূর্বে কল্যাণের উৎস হয়ে ছিলেন। আমাদের কোনো বিপদের মুখোমুখি করবেন না। না হয় আপনারাও বিপদের মুখোমুখি হবেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের এবং আপনাদের সংঘর্ষের মুখোমুখি করবেন। আল্লাহর শপথ! নিশ্চয় এ কথা বলার মাধ্যমে আমি আপনাদের এই সমাধানের দিকে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। আমি আশঙ্কা করছি, যদি এমনটি সম্পন্ন না হয় তাহলে আল্লাহ তাআলা এই উম্মত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন, ইতিমধ্যেই যে উম্মতের পুঁজি স্বল্প হয়ে গিয়েছে এবং এর ওপর নেমে এসেছে দুর্যোগ। যে বিষয়টি ঘটে গিয়েছে নিশ্চয় তা অনেক গুরুতর। এটি একজন ব্যক্তির আরেক

ব্যক্তিকে হত্যা অথবা একটি দল মিলে একজনকে হত্যা করা অথবা একটি গোত্র মিলে অপর গোত্রকে হত্যা করার মতো নয়।

তখন সবাই বললেন, আপনি সঠিক এবং সুন্দর কথা বলেছেন। এখন যদি আলি রা. আসেন এবং তিনিও আপনার মতোই অভিমত প্রকাশ করেন, তবে বিষয়টি সমাধান হয়ে যাবে।[২১৮]

কাকা ইবনে আমর রা. আলি রা.-কে এই সংবাদ দিলে তিনি খুবই আনন্দিত হন। অতঃপর উভয় পক্ষ সন্ধির জন্য সম্মত হয়ে যায়। যারা অপছন্দ করার তারা এই সন্ধিকে অপছন্দ করে, আর যারা সন্তুষ্ট হওয়ার তারা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেন। আয়েশা রা. চিঠির মাধ্যমে আলি রা.-কে জানিয়ে দেন যে, তিনি এই মীমাংসা এবং সন্ধির লক্ষ্যেই এসেছিলেন। তখন উভয় পক্ষই আনন্দিত হন। আলি রা. লোকদের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। তাদের স্মরণ করিয়ে দেন জাহেলি যুগ ও তখনকার বর্বরতার কথা। উল্লেখ করেন ইসলামের কথা, মুসলিমদের সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি ও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সৌভাগ্যের কথা।

আলি রা. বলেন, আমি আমার লোকদের নিয়ে তাদের কাছে সন্ধির লক্ষ্যে যাচ্ছি। সুতরাং উসমান রা.-এর হত্যায় যাদের হাত আছে তারা যেন আমাদের অনুসরণ না করে। তখন ২ হাজার ৫০০ লোক ব্যতীত সকলেই আলি রা.-এর সঙ্গে চলে যায়। এই লোকেরাই উসমান রা.-এর হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল এবং তার মৃত্যুতে সন্তুষ্ট হয়েছিল। এখন তারা তা প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে দিলো।[২১৯]

ওই সকল খুনিরা তাদের প্রতি আলি রা.-এর ক্রোধের কথা অনুধাবন করে নিজেদের নিয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়ে। আলি রা. তার লোকদের নিয়ে আয়েশা রা. এবং তার বাহিনীর কাছে যান। ইতিমধ্যেই রাত নেমে আসে। দীর্ঘদিন পর মুসলিমদের জীবনে আসে এমন স্বস্তির রাত। কিন্তু ফিতনাবাজদের জন্য এ রাত ছিল কঠিন। তারা নির্ঘুম চোখে ভাবতে থাকে, কীভাবে তারা এই সন্ধির হাত থেকে বাঁচতে পারে! এই সন্ধি হয়ে গেলে অচিরেই তাদের গর্দানগুলো এর বিনিময় হতে যাচ্ছে। তাই তারা নতুন করে ফিতনা সৃষ্টির ষড়যন্ত্র আঁটতে শুরু করে। এই প্রেক্ষিতেই সংঘটিত হয় জঙ্গে জামাল তথা উটের যুদ্ধ।

---

২১৮. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/২৬৫
২১৯. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/২৬৫

জঙ্গে জামালের আলোচনা শুরু করার পূর্বে কিছু সংশয় এবং প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব।

সংশয় : আলি রা.-এর বাইআত গ্রহণ শরয়ি বাইআত ছিল না। তাই মুআবিয়া রা.-এর জন্য আলি রা.-এর বাইআত গ্রহণ না করার অধিকার ছিল। কারণ, যারা আলি রা.-এর হাতে বাইআত গ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে ফিতনাবাজরাও ছিল। আর তাদের বাইআত শরয়ি বাইআত নয় এবং এটি জায়েজও নয়।

জবাব : অধিকাংশ মানুষ, বিশেষ করে বিশিষ্ট সাহাবিগণের অধিকাংশই (যারা আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ[২২০] ছিলেন) আলি রা.-এর হাতে বাইআত গ্রহণ করেছিলেন। তাদের মধ্যে তালহা রা. এবং যুবায়ের রা.-ও ছিলেন। তারা উসমান রা.-কে হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু প্রথমে তারাও বাইআত গ্রহণ করেছিলেন। তাদের সঙ্গে ফিতনাবাজরাও বাইআত গ্রহণ করেছিল। এদিক দিয়ে বিশিষ্ট সাহাবিগণের বাইআত গ্রহণের পরে তাদের বাইআত গ্রহণ বিশেষ কোনো গুরুত্ব রাখে না। এ ক্ষেত্রে শুধু এতটুকুই ঘটেছে যে, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বিশিষ্ট সাহাবিগণের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মিলে গিয়েছিল। ফিতনাবাজরাও চেয়েছিল আলি রা.-এর হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে। সমস্ত মদিনাবাসীর ইচ্ছাও ছিল এমনই। কেউই আলি রা.-এর ক্ষমতা গ্রহণে আপত্তি করেননি। মুআবিয়া রা.-ও সার্বিক দিক দিয়ে আলি রা.-এর ক্ষমতা গ্রহণের ব্যাপারে আপত্তি করেননি। তবে তাদের মধ্যে মতভিন্নতা ছিল কোন কাজটি প্রাধান্য দেওয়া হবে তা নিয়ে। মুআবিয়া রা. চেয়েছিলেন প্রথমে উসমান রা.-এর খুনিদের কিসাস গ্রহণ করতে। আর আলি রা. চেয়েছিলেন প্রথমে সাম্রাজ্যকে স্থির করতে। এরপর ফিতনাবাজদের ব্যাপারটি দেখবেন; যাদের হত্যা করা সমীচীন তাদের হত্যা করবেন আর

---

২২০. **আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ :** রাষ্ট্রের আলেম, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও গুণীজনদের বুঝায়, যাদের শাসক নিয়োগ বা বরখাস্তের অধিকার রয়েছে। *আল-মাওসুয়া ফিকহিয়্যা কুয়েতিয়্যা*, ৭/১১৫, ১১৭; (শামেলা)-সম্পাদক

যাদের শাস্তি দেওয়ার শাস্তি দেবেন। তবে তা মুসলিমদের পক্ষ শক্তিশালী হওয়া এবং চলমান ফিতনা দূর হওয়ার পর।

দেখা গেল যে, সবাই আলি রা.-এর খেলাফত গ্রহণের পক্ষেই ছিলেন। এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করে রাখি যে, আলি রা. ইতিপূর্বে উসমান রা.-এর সঙ্গেও খেলাফতের জন্য মনোনয়নপ্রাপ্ত ছিলেন। কিন্তু মদিনাবাসী তাদের দুজনের কাকে প্রধান্য দেবে তা নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গেলে অবশেষে উসমান রা.-এর পক্ষে সবাই একমত হয়। তাই উসমান রা.-এর পর আলি রা.-ই খলিফা হওয়া স্বাভাবিক ছিল। এ ছাড়া 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ'-এর অন্তর্ভুক্ত যত বিশিষ্ট সাহাবি রয়েছেন সবাই তার খেলাফতের ব্যাপারে একমত হয়েছিলেন।

এক নং প্রশ্ন : আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের নির্বাচন কীভাবে হতো?

উত্তর : তখন আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ ছিলেন মুহাজির, আনসার ও বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিশিষ্ট সাহাবিগণ। আবু বকর রা., উমর রা. ও উসমান রা.-এর সময় থেকে নিয়ে তখন পর্যন্ত তারাই ছিলেন আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ। তারা সবাই একসঙ্গে পরামর্শ করতেন এবং খলিফা এককভাবে যেসব সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন না, তারা সকলে মিলে এমন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করতেন। আর যখন কোনো শাসক থাকত না, তখন উম্মাহর কল্যাণের লক্ষ্যে শাসক নিয়োগের দায়িত্ব তাদের কাঁধেই ন্যস্ত থাকত।

দুই নং প্রশ্ন : আলি রা. ও মুআবিয়া রা. একসঙ্গে মিলে খুনিদের শাস্তি দেওয়ার পরও তো খলিফা নির্বাচন ও তার বাইআত গ্রহণের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যেত, তাহলে কেন এমনটি করলেন না?

উত্তর : উসমান রা.-এর খুনিদের শাস্তি দেওয়ার চেয়ে খলিফা নির্বাচন করা ছিল বহুগুণে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, খলিফা ব্যতীত রাষ্ট্র চলতে পারে না, তাহলে খলিফা ব্যতীত ওই সকল খুনিদের শাস্তি দেওয়া কীভাবে সম্ভব? বরং খলিফা ব্যতীত শাস্তি দেওয়ার কারণে তখন ইসলামি সাম্রাজ্যের প্রতিটি অঞ্চলে ব্যাপক লড়াই শুরু হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। আমরা দেখেছি এক বসরা শহরেই ৬০০জন নিহত হয়েছিল। এমনটি যদি অন্য শহরগুলোতেও হতো, তাহলে পরিস্থিতি কেমন ভয়াবহ হতো!

অতঃপর যদি ফিতনাবাজদের সঙ্গে লড়াই শুরু হয়ে যেত, তাহলে যুদ্ধ চালু রাখার অথবা থামিয়ে দেওয়ার নির্দেশ কে প্রদান করত? আলি রা. নাকি মুআবিয়া রা.? আয়েশা রা. নাকি তালহা রা.? যুবায়ের রা. নাকি তাদের সকলের সম্মিলিত নির্দেশে?

অতঃপর এ দেখে ইসলামি সাম্রাজ্যের বিরোধী শক্তিরা যদি সুযোগ বুঝে ইসলামি সাম্রাজ্যের ওপর আক্রমণ করে বসত, তখন সিদ্ধান্ত কে নিতেন?

ফিতনাবাজদের সঙ্গে যুদ্ধ থামিয়ে বহিরাগত শত্রুদের সঙ্গে লড়াই করা অথবা উভয়দিকেই সমানভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত কে নিতেন?

যদি খলিফাই না থাকত তাহলে কে নিতেন এসব সিদ্ধান্ত?

নিঃসন্দেহে তখন বিষয়টি আরও বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াত। এ ছাড়াও যখন দুটি উপকারী বিষয় একত্র হয় তখন যেটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ সেটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় এবং অপরটিকে সাময়িকের জন্য বিলম্বিত করা হয়। আর যখন দুটি ক্ষতি সংঘটিত হওয়া অনিবার্য হয়, তখন অধিক ক্ষতিকর বিষয় থেকে বাঁচতে অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকর বিষয়টি মেনে নিতে হয়।

সে সময়ে এমন বিপজ্জনক এক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল, যার ফলে পুরো ইসলামি সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এমন সংকট থেকে মুসলিমদের পরিত্রাণ দিয়েছেন।

উসমান রা.-এর মৃত্যুর পর ইসলামি সাম্রাজ্যের বিবদমান অবস্থা দেখে রোমক সম্রাট কনস্টান্টিন নৌবহর প্রস্তুত করে ইসলামি সাম্রাজ্যের ওপর আক্রমণ করার জন্য সমুদ্রপথে শাম অভিমুখে রওনা হয়েছিল। মুসলিমদের মধ্যে যে পারস্পরিক বিভেদ চলছিল, এমতাবস্থায় সে যদি শামে পৌঁছে যেত, তাহলে মুসলিমদের ধ্বংস অনিবার্য ছিল। কিন্তু পথিমধ্যেই আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে রোমক নৌবহরের উদ্দেশে পাঠিয়ে দিলেন সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়। শামে পৌঁছার পূর্বেই নৌবহরের অধিকাংশ জাহাজই গভীর সমুদ্রে তলিয়ে যায়। কনস্টান্টিন ও অবশিষ্ট সৈন্যরা কোনোরকমে সিসিলিতে ফিরে যেতে সক্ষম হয়। অতঃপর রোমক সাম্রাজ্যের মন্ত্রী, সভাসদ ও সহযোগীরা একত্র হয়ে সম্রাট কনস্টান্টিনকে বলে, আপনি আমাদের সেনাদের হত্যা করেছেন। অতঃপর তারা সম্রাট কনস্টান্টিনকে হত্যা করে ফেলে।[২২১]

---

২২১. *তারিখুত তবারি*, ৪/৪৪১; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/২৫৬

এই কনস্টান্টিন যদি শামের উত্তর উপকূলে পৌঁছে যেত তাহলে এই রোমক বাহিনীর প্রতিরোধে সেনাবাহিনী প্রস্তুত করার ক্ষমতা কার হাতে থাকত তখন? কোন সেনাবাহিনীকে দেওয়া হতো এ দায়িত্ব? তখন প্রতিটি শহরের জন্য থাকত আলাদা শাসক ও বাহিনী। তাই একজন খলিফা নির্বাচিত করে তার হাতে বাইআত গ্রহণ করা ছিল খুবই জরুরি।

উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর হত্যাকাণ্ডের পর মজলিসে শুরা উসমান রা.-কে নির্বাচিত করতে তিন দিন সময় নিয়েছিলেন। এই অল্প সময়েও মুসলিমগণ আমিরবিহীন ছিলেন না। এই তিন দিন আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. ছিলেন মুসলিমদের আমির। সুতরাং, মুসলিমদের জন্য একদিনও আমির ব্যতীত অতিবাহিত করা ঠিক নয়। উসমান রা.-এর হাতে যখন খেলাফতের বাইআত গ্রহণ করা হয়, তখন আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. বলেছিলেন, আমার কাঁধে যে দায়িত্ব ছিল তা উসমানের কাঁধে দিয়ে আমি মুক্ত হলাম।[২২২]

এমনকি রাসুল ﷺ-এর দাফন সম্পন্ন করার পূর্বেই সাহাবিগণ খলিফা নির্বাচন করে নিয়েছিলেন। আবু বকর সিদ্দিক রা. ইন্তেকাল করেছিলেন মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে। পরদিন ফজরেই সবাই উমর রা.-এর হাতে বাইআত গ্রহণ করেন। সুতরাং এ বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোনোভাবেই তাতে বিলম্ব করা ঠিক নয়। আর আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ, মদিনার অধিবাসীগণ এবং বিভিন্ন অঞ্চলের অধিকাংশ লোক মিলে যে খলিফাকে নির্বাচিত করেছিলেন, সকলের জন্যই তার হাতে বাইআত গ্রহণ করা আবশ্যক ছিল। আর সেই খলিফা ছিলেন আলি রা.।

তিন নং প্রশ্ন : আলি রা. যখন কুফা অভিমুখী হলেন তখন কাকে তার স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করে গিয়েছিলেন?

উত্তর : আলি রা. তার চাচাতো ভাই কুসাম ইবনে আব্বাস ইবনে আবদিল মুত্তালিব রা.-কে তার স্থলাভিষিক্ত করে গিয়েছিলেন। ফিতনাবাজদের মধ্যে কাউকে স্থলাভিষিক্ত করেননি; বরং তিনি তাদেরকে নিজের বাহিনীর সঙ্গে নিয়ে নিয়েছিলেন। আলি রা. ফিতনাবাজদের সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করা

---

২২২. *তারিখুত তবারি*, ৪/২৩৮; *আল-কামিল ফিত তারিখ*, ২/৪৪৪; *তারিখুল ইসলাম*, ৩/১০২

সত্ত্বেও প্রয়োজনের কারণে তাদেরকে বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করতে বাধ্য ছিলেন।

তিনি যখন শুনেছিলেন, আয়েশা রা.-এর বাহিনীর লোকেরা দোয়া করছে, হে আল্লাহ, আপনি উসমান রা.-এর খুনিদের অভিসম্পাত করুন। তখন তিনিও বলেছিলেন, হে আল্লাহ, আপনি উসমান রা.-এর খুনিদের অভিসম্পাত করুন।

সুতরাং তিনি তাদের প্রতি ভালোবাসা অথবা তাদের সমর্থনের কারণে তার বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করেননি।

হাওয়াব জলাশয়ের পানি ও কুকুরের ডাকের ঘটনা

বর্ণিত আছে, আয়েশা রা. এবং তার সঙ্গের লোকেরা যাত্রাপথে রাতের বেলায় হাওয়াব নামক এক জলাশয়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন কিছু কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। আয়েশা রা. সেই ডাক শুনে জিজ্ঞাসা করেন, এই জায়গার নাম কী?

উত্তর এলো, হাওয়াব।

তখন তিনি তার এক হাত দিয়ে আরেক হাতে আঘাত করে বললেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আমাকে এখনই ফিরে যেতে হবে।

সঙ্গের লোকেরা বললেন, কেন?

তিনি বললেন, আমি রাসুল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি তার স্ত্রীগণকে বলছিলেন, তোমাদের মধ্য থেকে কাকে দেখে হাওয়াবের কুকুররা ঘেউ ঘেউ করবে, আমি যদি তা জানতাম!

অতঃপর তিনি উটের পিঠে আঘাত করে সেটিকে বসিয়ে দেন এবং বলেন, আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। আল্লাহর শপথ! আমিই হাওয়াবের জলাশয়ের সেই নারী।[২২৩]

ইবনুল আরাবি রহ. *আল-আওয়াসিম মিনাল কাওয়াসিম* গ্রন্থে বলেন, এই বর্ণনার কোনো ভিত্তি নেই। এমন কোনো সহিহ বর্ণনাই নেই।[২২৪]

---

২২৩. *আল-মুসনাদ লিল ইমাম আহমাদ*, ২৪২৫৪; *সহিহ ইবনি হিব্বান*, ৬৭৩২; *আল-মুসতাদরাক লিল হাকিম*, ৪৬১৩

২২৪. *আল-আওয়াসিম মিনাল-কাওয়াসিম*, পৃ. ১৪৮-১৬১

তবে কেউ কেউ এই বর্ণনাটিকে সহিহ আখ্যা দিয়েছেন।[২২৫] শিয়ারাও তাদের গ্রন্থে এই হাদিসটিকে সহিহ দাবি করেছে। এমনইভাবে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর অন্তর্ভুক্ত কিছু লেখক—যারা কোনো যাচাই-বাছাই ছাড়া লেখে—তারা নিজেদের গ্রন্থে এই ঘটনাকে উল্লেখ করে এ কথাও সংযুক্ত করে দিয়েছে যে, আয়েশা রা. নিজেকে রাসুল ﷺ-এর বলা সেই হাওয়াবের নারী সন্দেহ করে যখন ফিরে যাওয়ার সংকল্প করেন, তখন এ নিয়ে সাহাবিগণের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়।

তালহা রা., যুবায়ের রা. ও আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. প্রমুখ সাহাবিগণ আয়েশা রা.-এর কাছে এসে শপথ করে বলেন, এ জায়গা হাওয়াবের জলাশয় নয়। তারা এই কথার পক্ষে ৫০জন সাক্ষীও উপস্থিত করেন। শিয়াদের অন্যতম আলেম মাসউদি তার *মুরুজুয যাহাব* গ্রন্থে এই সাক্ষ্যের ব্যাপারে বলেন, এটা ছিল ইসলামের ইতিহাসে প্রথম মিথ্যা সাক্ষ্যের ঘটনা।[২২৬]

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, এই হাদিসের কোনো ভিত্তি নেই। আর যদি তা সহিহ হয়েও থাকে, তবুও আয়েশা রা. এ হাদিসে উদ্দেশ্য হওয়া নির্দিষ্ট নয়। তিনি যদি এ কথা বলেই থাকেন, তবে তা বলেছিলেন নিজের তাকওয়ার কারণে এবং এই আশঙ্কা করে যে, হয়তো এ কথার দ্বারা তিনিই উদ্দেশ্য। আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. তাকে বলেছিলেন, তিনি মুসলিমদের মধ্যে কল্যাণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বেরিয়েছেন। তাই তিনি কখনোই হাওয়াবের

---

২২৫. উল্লিখিত হাদিস সহিহ নয় বলে ইবনুল আরাবি রহ. যে দাবি করেছেন তা সঠিক নয়। হাদিসটি সহিহ সূত্রে প্রমাণিত। হাফেজ যাহাবি রহ., হাফেজ ইবনে কাসির রহ., হাফেজ নুরুদ্দিন হাইসামি রহ. ও হাফেজ সুয়ুতি রহ. হাদিসটিকে সহিহ তথা বিশুদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন। এ ছাড়া সামসময়িক মুহাদ্দিসগণের মধ্যে শায়খ আলবানি রহ. ও শায়খ শুয়াইব আরানাউত রহ.-ও হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন। দেখুন, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৬/২৩৬; *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ২/১৭৮; *মাজমাউয যাওয়ায়িদ*, ১২০২৫; *ফাতহুল বারি*, ১৩/৫৫; *মানাহিলুস সাফা*, ১/১৫২; *সিলসিলাতুল আহাদিসিস সহিহা*, ৪৭৪
বস্তুত আয়েশা রা. সতর্কতার কারণে প্রথমে নিজেকে এ হাদিসের উদ্দিষ্ট নারী মনে করে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময় ইজতেহাদ ও চিন্তাভাবনা করার পর তার কাছে স্পষ্ট হয়েছিল যে, এ হাদিসের উদ্দিষ্ট নারী তিনি নন। কারণ তিনি মুসলিমদের মধ্যে সৃষ্ট পরিস্থিতির সমাধানের জন্যই বসরায় যাচ্ছিলেন। এ কারণে তিনি মদিনায় ফিরে যাননি; বরং বসরায় যাত্রা অব্যাহত রেখেছেন।-সম্পাদক

২২৬. *মুরুজুয যাহাব*, ১/৩১৬

হাদিসের উদ্দেশ্য হতে পারেন না। এ ব্যাপারে আরেকটি বর্ণনা আছে। সেটির বিশুদ্ধতা নিয়েও সন্দেহ আছে। তাতে বলা হয়েছে, রাসুল ﷺ-এর স্ত্রীগণকে যখন হাওয়াবের জলাশয়ের হাদিসের কথা বলা হয়েছিল, তখন তাদের সঙ্গে একজন বাঁদিও ছিল। এই বাঁদি পরবর্তী সময়ে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল এবং রিদ্দার যুদ্ধে[২২৭] খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা.-এর হাতে নিহত হয়েছিল। সেই বর্ণনার ভাষ্য অনুযায়ী হাদিসের দ্বারা এই বাঁদিকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছিল।

যদি প্রথম বর্ণনাটি সহিহ হয়েও থাকে, তাহলেও এটি অসম্ভব যে, আয়েশা রা. নিজেকে এই হাদিসের উদ্দেশ্য বিশ্বাস করেও নিজের যাত্রা অব্যাহত রেখেছেন। এটাও অসম্ভব যে, যুবায়ের ইবনুল আওয়াম রা., তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রা. ও আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবি মিথ্যা সাক্ষ্য দেবেন, অথচ রাসুল ﷺ তাদের জান্নাতি হওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছেন।

ফিতনাবাজ নেতাদের ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা

আয়েশা রা., তালহা রা. ও যুবায়ের রা. প্রমুখের সঙ্গে কাকা ইবনে আমর রা.-এর সংলাপ এবং আলি রা. তার সহচরদের নিয়ে আয়েশা রা.-এর কাছে যাওয়ার পর উভয় পক্ষ একই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সম্মত হয়ে যায়। ইতিমধ্যেই রাত নেমে আসে। দীর্ঘদিন পর মুসলিমরা এমন স্বস্তির রাত কাটায়। কিন্তু ফিতনাবাজদের জন্য এ রাত ছিল খুব কষ্টের। তারা নির্ঘুম চোখে ভাবতে থাকে, কীভাবে তারা এই সন্ধির হাত থেকে বাঁচতে পারে। এই সন্ধি বাস্তবায়ন হয়ে গেলে অচিরেই তাদের গর্দানগুলো এর বিনিময় হতে যাচ্ছে। তাই তারা নতুন করে ফিতনা সৃষ্টির ষড়যন্ত্র আঁটতে শুরু করে।

এ সময় তালহা রা. ও যুবায়ের রা.-কে কিছু লোক পরামর্শ দেয় যে, উসমান রা.-এর খুনিদের শায়েস্তা করার এটিই সুবর্ণ সুযোগ। কারণ, আলি রা. যখন সন্ধির জন্য বসরা অভিমুখে রওনা দেন তখন বলেছিলেন, উসমান রা.-এর হত্যায় অংশগ্রহণকারী অথবা সহযোগী কেউই যেন আমাদের সঙ্গী না হয়। ফলে যারা হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছিল এবং সহযোগী ছিল তারা পৃথক হয়ে গিয়েছে। অবশিষ্ট বাহিনী বসরার উদ্দেশে চলে এসেছে। ফলে

---

২২৭. **রিদ্দার যুদ্ধ :** আবু বকর রা.-এর খেলাফতকালে সংঘটিত ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে রিদ্দার যুদ্ধ বলা হয়।-সম্পাদক

ফিতনাবাজরা এখন আলি রা.-এর বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন। তখন তালহা রা. ও যুবায়ের রা. বললেন, আলি পরিস্থিতি শান্তকরণের নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং এ কথা স্পষ্ট যে, তারা সন্ধি ও আলি রা.-এর সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন।

অপরদিকে উসমান রা.-এর খুনিরাও বসে থাকেনি। তারা একত্র হয়ে সলাপরামর্শ শুরু করে। তাদের কেউ কেউ বলে, আমাদের ব্যাপারে তালহা এবং যুবায়েরের অভিমতের কথা তো জানতে পেরেছি। কিন্তু আলির কী অভিমত তা আজও জানতে পারিনি। তিনি যদি তাদের সঙ্গে সন্ধি করে নেন, তবে নিশ্চয় আমাদের হত্যার ব্যাপারেই সেই সন্ধি হবে। যদি বিষয়টি এমনই হয় তাহলে আমরা আলিকেও উসমানের সঙ্গে যুক্ত করে দেবো।

এখানে তাদেরকে আলি রা.-কেও হত্যা করতে ইচ্ছুক দেখা যাচ্ছে । এর মাধ্যমে অকাট্যভাবে প্রমাণ হয়, ওই সকল খুনিদের সঙ্গে আলি রা.-এর কোনো সম্পর্ক ছিল না। এজন্যই তো তারা আলি রা.-কে হত্যা করে ফিতনার চাকাকে স্থায়ীভাবে সচল করতে চাচ্ছে!

তাদের এ পরিকল্পনার কথা শুনে পাপিষ্ঠ আবদুল্লাহ ইবনে সাবা বলে ওঠে, তাকে যদি হত্যা করো তাহলে মুসলিমরা সবাই এক হয়ে যাবে এবং তোমাদের কচুকাটা করবে।

মূলত এই ফিতনাবাজ দলটির উদ্দেশ্য হচ্ছে পার্থিব জীবন। আর আলি রা. ও আয়েশা রা.-এর বাহিনীর উদ্দেশ্য ছিল শুধু আখেরাত ও আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি। তারা নিজেদের সঠিক পথের ওপর মনে করেই আল্লাহর পথে লড়াইয়ে নেমেছিলেন। যুদ্ধের ময়দানে নিহত হলে নিজেদের শহিদ গণ্য করেই এসেছিলেন।

অতঃপর তাদের মধ্য থেকে একজন বলে, তাদের কথা ছাড়ো। আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে চলো; যেন আমরা কোনো শহরে আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারি। অর্থাৎ, প্রত্যেকেই নিজ নিজ গোত্রের কাছে ফিরে যাবে এবং তাদের মাধ্যমে আত্মরক্ষা করবে।

আবদুল্লাহ ইবনে সাবা এই মত প্রত্যাখ্যান করে বলে, আলি যদি ক্ষমতা নিষ্কণ্টক করতে সক্ষম হন তবে বিভিন্ন শহর থেকে তোমাদের ধরে এনে হত্যা করবেন।

আবদুল্লাহ ইবনে সাবা ছিল ফিতনাবাজদের সঙ্গে শয়তানের ভূমিকায়। সে-ই তাদের সব কাজ বিন্যস্ত করে দিত, যেন তাদের দৃষ্টিতে সবচেয়ে সঠিক সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করা যায়। তাই যে রাত-পরবর্তী প্রভাতেই মুসলিমগণ সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন করে নেবেন, সেই রাতেই ইবনে সাবা তার সহচরদের একটি দল আলি রা.-এর বাহিনীর দিকে এবং আরেকটি দল আয়েশা রা.-এর বাহিনীর দিকে পাঠানোর পরামর্শ দেয়। সেখানে গিয়ে ঘুমন্ত মুসলিমদের ওপর হামলা করে হত্যাকাণ্ড শুরু করবে। অতঃপর আলি রা.-এর বাহিনীর কাছে যাওয়া দলটি চিৎকার করে বলে উঠবে, আয়েশার বাহিনী আমাদের ওপর হামলা করেছে। এদিকে আয়েশা রা.-এর বাহিনীর কাছে যাওয়া দলটি বলে উঠবে, আলির বাহিনী আমাদের ওপর হামলা করেছে।

ফজরের পূর্বমুহূর্তে ফিতনাবাজরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে নিজেদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে ফেলে। উভয় পক্ষের এক বিরাট অংশকে তারা হত্যা করে পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী চিৎকার করতে শুরু করে। তখন ঘুম থেকে জেগে উঠে মুসলিমগণ দৌড়ে গিয়ে তাদের তরবারি উন্মুক্ত করেন। তারা নিশ্চিতভাবে মনে করেন যে, অপর পক্ষ তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে ও সন্ধির জন্য যে চুক্তিতে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন তা ভঙ্গ করেছে। রাতের অন্ধকারে প্রকৃত সত্য নির্ণয়ের সুযোগ কারও সামনেই ছিল না। ইতিমধ্যে তরবারি তার কাজ সম্পন্ন করে ফেলেছে এবং হতাহতের সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছে। তাই উভয় পক্ষেরই তখন মনোযোগ ছিল নিজেদের প্রতিরক্ষার দিকে।

'আর আল্লাহ তাআলার বিধান সুনির্ধারিত। [সুরা আহযাব : ৩৮][২২৮]

সে রাতে ফিতনাবাজদের হত্যাকাণ্ডের পূর্বে আবু সালাম দালানি আলি রা.-এর কাছে গিয়েছিলেন। তিনি আলি রা.-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আয়েশা রা., তালহা রা. ও যুবায়ের রা. প্রমুখ যদি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই উসমান রা.-এর হত্যার প্রতিশোধ দাবি করে থাকে, তবে এর স্বপক্ষে কি তাদের কোনো প্রমাণ রয়েছে?

আলি রা. বলেন, হ্যাঁ।

আবু সালাম দালানি জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে সেই বিধান বিলম্বিত করার পক্ষে আপনার কি কোনো প্রমাণ রয়েছে?

---

২২৮. *আল-বিদয়া ওয়ান-নিহায়া*, ৭/২৬৭

আলি রা. বলেন, হ্যাঁ, তাও আছে।

তখন আবু সালাম দালানি বললেন, তাহলে যদি আগামীকাল আল্লাহ তাআলার পরীক্ষাস্বরূপ উভয় পক্ষের মধ্যে লড়াই বেধে যায় তাহলে আমাদের কী হবে আর তাদের কী হবে?

আলি রা. বলেন, আমি চাইব আমাদের এবং তাদের মধ্য থেকে কেউ যেন হতাহত না হয়। যদি কেউ নিহত হয় তাহলে আল্লাহ যেন তার অন্তর পরিচ্ছন্ন করে তাকে জান্নাত দান করেন।[২২৯]

তিনি এমনটি বলেছিলেন, কারণ, উভয় পক্ষই নিজ নিজ ব্যাখ্যা অনুযায়ী সত্যের ওপর ছিলেন। এ নিয়ে তারা ইজতেহাদ করেছিলেন। ফলে যাদের ইজতেহাদ সঠিক হয়েছে তারা দুটি সওয়াব পাবেন। আর যারা ভুল করেছেন তারা একটি সওয়াব পাবেন। তাদের ক্ষেত্রে নিম্নে উল্লেখিত হাদিস প্রয়োগ হবে না।

> যখন দুইজন মুসলিম তাদের তরবারি নিয়ে মুখোমুখি হয়, তখন নিহত এবং হত্যাকারী উভয় ব্যক্তিই জাহান্নামে যাবে।[২৩০]

***

---

২২৯. *আল-কামিল-ফিত-তারিখ*, ২/৫৯৫; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/২৬৬

২৩০. *সহিহ বুখারি*, ৩১; *সহিহ মুসলিম*, ২৮৮৮; *সুনানু আবি দাউদ*, ৪২৬৮; *সুনানুন নাসায়ি*, ৪১২৩

যুদ্ধের সূচনা

৩৬ হিজরির ১৫ জুমাদাল আখিরা মোতাবেক ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর, বুধবার শুরু হয় জঙ্গে জামাল তথা উটের যুদ্ধ। আলি রা. ঘুম থেকে জেগে ওঠেন তরবারির ঝনঝন শব্দ, মানুষের চিৎকার এবং চ্যাঁচামেচি শুনে। যুদ্ধের সূত্রপাত কীভাবে হয়েছে এবং কোত্থেকে হয়েছে কেউ তা জানে না। আয়েশা রা., তালহা রা. ও যুবায়ের রা.-এর ঘাঁটিরও একই অবস্থা। আলি রা. চিৎকার করে সবাইকে থামতে বলেন। কিন্তু তুমুল লড়াই বেধে যাওয়ায় তিনি তা আর থামাতে পারেননি। যখন তিনি দেখলেন যে, এক মুসলিমের আঘাতে অপর মুসলিমের মুণ্ডু উড়ে যাচ্ছে, তখন তিনি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলে ওঠেন, হায়! যদি এর ২০ বছর আগেই আমার মৃত্যু হতো!

তিনি চিৎকার করে লোকদের আহ্বান করতে থাকেন, আল্লাহর বান্দারা, থামো। আল্লাহর বান্দারা, তোমরা থামো!

অতঃপর তিনি তার পুত্র হাসান রা.-কে জড়িয়ে ধরে বলতে থাকেন, হায়! তোমার পিতা যদি ২০ বছর আগেই মারা যেত!

হাসান রা. বলেন, বাবা, আমি আগেই আপনাকে এ থেকে নিষেধ করেছিলাম।

তিনি বলেন, ছেলে, আমি কখনোই ভাবিনি যে, বিষয়টি এতদূর গড়িয়ে যাবে।[২৩১]

বিষয়টি যে এত চরম আকার ধারণ করবে এমনটি কেউই ভাবেননি। অতঃপর আলি রা. বলে ওঠেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

আলি রা. এভাবেই লোকদের থামানোর চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু তিনি তাতে সক্ষম হননি। কারণ, ফিতনা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং লড়াই চরম আকার ধারণ করেছিল।

এ যুদ্ধে যারা একে অপরের বিরুদ্ধে তরবারি ধারণ করেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন যুবায়ের ইবনুল আওয়াম রা. ও আম্মার ইবনে ইয়াসির রা.।

---

২৩১. *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, ৪২/৪৫৮; *তারিখুল ইসলাম*, ৩/১৬০; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/২৭৮

অথচ বদর ও তৎপরবর্তী সময়ে কতবার তারা রাসুল ﷺ-এর পতাকাতলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছেন। জঙ্গে জামালের সময় আম্মার ইবনে ইয়াসির রা.-এর বয়স ছিল ৯০ বছর। যুবায়ের ইবনুল আওয়াম রা.-এর বয়স ছিল ৭৫ বছর। যুবায়ের রা.-এর শক্তি ছিল আম্মার রা.-কে হত্যা করার; কিন্তু তিনি তা করতে পারেন না। ইসলামি সাম্রাজ্যের বিনির্মাণে তারা দুজন একই সঙ্গে অনেক দায়িত্ব পালন করেছেন, সহ্য করেছেন অনেক কষ্ট। অথচ সেই ইসলামি সাম্রাজ্যের অনেক খুঁটি আজ নিঃশেষ হওয়ার পথে। তারা দুজন একই সঙ্গে রাসুল ﷺ-এর হাতে লালিতপালিত হয়েছেন। আল্লাহ তাআলার রাস্তায় অনেক কষ্টের শিকার হয়েছেন। কিন্তু ফিতনা এসে লিখে দিয়েছে এই নির্মম পরিণতি। জীবনের এই পর্যায়ে এসে বাতিলের পক্ষে অথবা দুনিয়ার লোভে তারা লড়াইয়ে আগ্রহী ছিলেন না।

যুবায়ের রা. আম্মার ইবনে ইয়াসির রা.-কে বললেন, আবুল ইয়াকজান, আপনি কি আমাকে হত্যা করবেন?

আম্মার ইবনে ইয়াসির রা. যুবায়ের রা.-এর দিকে তিরের মৃদু আঘাত করে বললেন, আবু আবদুল্লাহ, না।[২৩২]

যুবায়ের ইবনুল আওয়াম রা. আশঙ্কা করছিলেন, আম্মার ইবনে ইয়াসির রা.-কে হত্যা করে তিনি যেন রাসুল ﷺ-এর ঘোষিত বিদ্রোহী দলের অন্তর্ভুক্ত না হন। কারণ, রাসুল ﷺ আম্মার ইবনে ইয়াসির রা.-কে বলেছিলেন, সুমাইয়ার পুত্র, তোমার জন্য দুঃখ হয়, বিদ্রোহী দল তোমাকে হত্যা করবে।[২৩৩]

তাই যুবায়ের রা. এই বিদ্রোহী দলের অন্তর্ভুক্ত হতে চাননি। তার সঙ্গে লড়াই করা থেকে নিবৃত্ত থাকতে চেয়েছেন। এমনটিই ঘটেছে। তারা দুজন একে অপরকে হত্যা করেননি।

আলি রা. যুবায়ের ইবনুল আওয়াম রা.-কে খুঁজছিলেন। অতঃপর দুজনের দেখা হলে আলি রা. যুবায়ের রা.-কে বলেন, আপনার কি সেদিনের কথা মনে আছে, যেদিন আমি রাসুল ﷺ-এর সঙ্গে বনু গানম গোত্রের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ রাসুল ﷺ আমার দিকে তাকিয়ে হেসে দিলেন এবং আমিও হেসে দেই। তখন আপনি বলেছিলেন, আবু তালিবের পুত্রের মজা করার অভ্যাস আর গেল না!

---

২৩২. *আল-কামিল ফিত তারিখ*, ২/৬০০; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/২৬৭

২৩৩. *সহিহ বুখারি*, ৪৪৭; *সহিহ মুসলিম*, ২৯১৬

তখন রাসুল ﷺ আপনাকে বললেন, 'নিশ্চয় সে উদ্ধত নয়। তুমি জালেম হয়ে তার সঙ্গে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবে।'

যুবায়ের রা. বললেন, হ্যাঁ। যদি আমার স্মরণ হতো তবে আমি কখনো এ পথে হাঁটতাম না। আল্লাহর শপথ! আমি আপনার সঙ্গে লড়াই করব না।[২৩৪]

অতঃপর যুবায়ের ইবনুল আওয়াম রা. তার ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রস্থান করেন। দম্ভ ও অহংকার তাকে যুদ্ধক্ষেত্রে আবদ্ধ করে রাখতে পারেনি। তিনি ছিলেন ৩০ হাজার সৈন্যবাহিনীর এক বিরাট দলের অন্যতম নেতা। তিনি ফিরে যাচ্ছিলেন রাসুল ﷺ-এর হাদিসের কথা মনে করে। রণাঙ্গন থেকে তিনি যখন ফিরে যাচ্ছিলেন তখন পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. তাকে বলেন, লোকদের একত্র করে আপনি এখন ফিরে যাচ্ছেন?

তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি আলি রা.-এর সঙ্গে লড়াই করব না।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে যুবায়ের রা. মক্কার উদ্দেশে যাত্রা করেন। বসরা থেকে কয়েক মাইল দূরে ওয়াদিউস সিবা নামক অঞ্চলে আমর ইবনে জুরমুয নামক ব্যক্তি তার পিছু নেয়। সে ছিল আলি রা.-এর বাহিনীর একজন সদস্য। এ সময় যুবায়ের রা.-এর সঙ্গে তার এক গোলামও ছিল। ইবনে জুরমুয তাদের দুজনকে বলে, আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?

তারা দুজন জবাব দেন, মক্কায় যাচ্ছি।

সে বলে, আমিও আপনাদের সঙ্গে যাব।

এক বর্ণনায় আছে, যুবায়ের রা. বলেছিলেন, আমি এই ব্যক্তির চোখে মৃত্যু দেখতে পাচ্ছি।

নামাজের সময় হলে যুবায়ের রা. তার গোলাম এবং ইবনে জুরমুযের ইমামতি করেন। তাকবিরে তাহরিমা বলার পর ইবনে জুরমুয যুবায়ের রা.-এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং নামাজরত অবস্থায়ই তাকে শহিদ করে দেয়। এরপর সে আনন্দচিত্তে যুবায়ের রা.-এর তরবারি নিয়ে আলি রা.-এর কাছে চলে আসে। সে ভেবেছিল এতে আলি রা. সন্তুষ্ট হবেন। কিন্তু আলি রা.-এর কানে এ খবর পৌঁছতেই তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন। যুবায়ের রা.-এর তরবারিটি হাতে নিয়ে তিনি বলতে থাকেন, এই তরবারিটি কতদিন রাসুল ﷺ-এর বিপদ প্রতিহত করেছে!

---

২৩৪. *আল-মুসতাদরাক লিল হাকিম*, ৫৫৭৫

তিনি স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে দেন, ইবনে জুরমুয যেন আমার কাছে আসতে না পারে। বলে দেন, সফিয়ার পুত্রের[২৩৫] খুনিকে জাহান্নামের সুসংবাদ দিয়ে দাও।[২৩৬] এ খবর শুনতে পেয়ে ইবনে জুরমুয আত্মহত্যা করে নিজের জন্য জাহান্নামকে আবশ্যক করে নেয়। যেমনটি আলি রা. বলেছিলেন।[২৩৭]

উভয় পক্ষের মধ্যে লড়াই চলতে থাকে। তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রা. বামহাত দিয়ে লড়াই করছিলেন। কারণ, উহুদের যুদ্ধে রাসুল ﷺ-কে তিরের আঘাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে তার ডানহাত অবশ হয়ে গিয়েছিল। জঙ্গে জামালের সময় তার বয়স ছিল ৬৪ বছর। তিনি যুদ্ধ করছিলেন, এমন সময় হঠাৎ এক লক্ষ্যভ্রষ্ট তির এসে বিদ্ধ হয় তার শরীরে। তির কে নিক্ষেপ করেছে তা অজ্ঞাতই থেকে যায়। তবে যারা উমাইয়া খেলাফতকে অপছন্দ করে তাদের মন্তব্য হচ্ছে, এই তির নিক্ষেপকারী ছিলেন মারওয়ান ইবনে হাকাম।

কিন্তু কোনো বর্ণনাই এই বিষয়টি প্রমাণ করতে পারেনি। অবশেষে তালহা রা. এই তিরের আঘাতে ইন্তেকাল করেন। তিনি এবং যুবায়ের রা. ছিলেন প্রথমদিকে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবিগণের মধ্যে অন্যতম। রাসুল ﷺ-এর জীবদ্দশায় তার সঙ্গে সব যুদ্ধে তারা দুজন অংশগ্রহণ করেছেন। এ সময় পিতার পক্ষ থেকে বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা.।

লড়াই ক্রমেই তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। মানুষের মাথা এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিন্নভিন্ন হয়ে উড়ে যেতে থাকে। বর্ণনাকারীগণের মতে, এ যুদ্ধে হাত এবং পা কাটার ঘটনা ঘটেছিল সবচেয়ে বেশি।

---

২৩৫. যুবায়ের রা.-এর মায়ের নাম ছিল সফিয়া।-সম্পাদক

২৩৬. *আল-মুসনাদ লিল ইমাম আহমাদ*, ৬৭১; *আল-মুসতাদরাক লিল হাকিম*, ৫৫৮০

২৩৭. আলি রা. কর্তৃক জাহান্নামের সুসংবাদ পাওয়ার পরে ইবনে জারমুযের আত্মহত্যা করার ঘটনা সঠিক নয়; বরং সঠিক কথা হলো, এরপরেও সে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা.-এর খেলাফতকাল পর্যন্ত জীবিত ছিল। আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. যখন মুসআব ইবনে যুবায়ের রহ.-কে ইরাকের আমির নিযুক্ত করেন তখন ইবনে জুরমুয আত্মগোপন করে। কিন্তু মুসআব ইবনে যুবায়ের রহ. তাকে পিতার বদলে হত্যা করেননি; বরং ক্ষমা করে দিয়েছেন।-সম্পাদক

তখনও আয়েশা রা. যুদ্ধের ময়দানে প্রবেশ করেননি। বসরার বিচারক কাব ইবনে সাওর রহ. তাকে গিয়ে বলেন, হে উম্মুল মুমিনিন, আপনি মুসলিমদের উদ্ধার করুন।

তখন আয়েশা রা. উঠে দাঁড়ান। উটের পিঠে হাওদায় চড়ে তিনি রণাঙ্গনে প্রবেশ করেন মুসলিমদের এই লড়াই ও গণহত্যা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়ার জন্য। এমন লড়াই এর আগে মুসলিমরা কখনোই দেখেনি।

পাশ্চাত্যবাদী লেখকরা এ ব্যাপারে আয়েশা রা.-কে খুবই খারাপভাবে চিত্রায়ণ করে। তহা হুসাইন তার *আলি ওয়া বনুহু* (আলি রা. ও তার সন্তানগণ) গ্রন্থে লিখেছে, 'নিশ্চয় আয়েশা রা. তার ডানদিকের লোকদের গিয়ে উৎসাহিত করেছেন, বামদিকের লোকদের উসকে দিয়েছেন এবং তার সম্মুখভাগের লোকদের যুদ্ধের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। তিনি এভাবেই লোকদের লড়াইয়ে উৎসাহিত করেছেন।' আয়েশা কাদুরা

তহা হুসাইন আরও বলে, আলি রা. যখন শুনতে পেলেন, আয়েশা রা. ও তার সহচররা উসমান রা.-এর খুনিদের অভিসম্পাত করছেন, তখন তিনি বলেছিলেন, তারা উসমান রা.-এর খুনিদের অভিসম্পাত করছে! আল্লাহর শপথ! তারা নিজেদেরই অভিসম্পাত করছে। তারাই উসমান রা.-কে খুন করেছে। হে আল্লাহ, আপনি উসমান রা.-এর খুনিদের অভিসম্পাত করুন।

এই বর্ণনা থেকে শুধু শেষের বাক্যটিই সঠিক। আলি রা. ওই সময় এই দোয়া করেছিলেন, যখন তিনি অপর পক্ষকে উসমান রা.-এর খুনিদের ব্যাপারে এই দোয়া করতে শুনেছিলেন। আমি জানি না তহা হুসাইন কোথা থেকে এই বানোয়াট কিচ্ছা এবং অনির্ভরযোগ্য বর্ণনা নিয়ে এসেছে।

এই ধারা অনুসরণ করে জাহিয়া কাদুরা তার *আয়েশা : উম্মুল মুমিনিন* গ্রন্থে লিখেছে, 'আয়েশা রা. উসমান রা.-এর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের নাম দিয়ে প্রত্যক্ষ এবং প্রকাশ্যভাবে আলি রা.-এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। বরং তিনি আলি রা.-এর ওপর উসমান রা.-এর খুনের অপবাদও আরোপ করেন।' সে আরও লিখেছে, আয়েশা রা. ও আলি রা.-এর মধ্যকার এই বিরোধের কয়েকটি কারণ রয়েছে। যথা—

এক. খাদিজা রা.-এর মৃত্যুর পর রাসুল ﷺ প্রথম আয়েশা রা.-কেই বিয়ে করেছিলেন। আর খাদিজা রা. ছিলেন রাসুল ﷺ-এর কন্যা ফাতেমা রা.-এর মাতা। তাই সৎ মা হওয়ার কারণে ফাতেমা রা. আয়েশা রা.-কে পছন্দ করতেন না। আলি রা.-ও তার স্ত্রীর ব্যথায় ব্যথিত হন। এ কারণেই আলি রা. ও আয়েশা রা.-এর মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়।

দুই. রাসুল ﷺ ফাতেমা রা.-কে খুবই ভালোবাসতেন। তিনি তাকে বিশ্বজগতের সকল নারীর সর্দার আখ্যায়িত করেছেন। লেখিকার ভাষ্য অনুযায়ী এই কারণে আয়েশা রা.-এর মনে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়।

তিন. আয়েশা রা.-কে অপবাদ দেওয়ার সময় প্রকৃত সত্য উন্মোচিত হওয়ার পূর্বে আলি রা. রাসুল ﷺ-কে পরামর্শ দিয়েছিলেন, আয়েশা রা.-কে তালাক দেওয়ার জন্য। বলেছিলেন, তাকে ছাড়া আরও অনেক নারী আছে। আয়েশা রা.-কে অপছন্দ করার ফলেই তিনি এমনটি বলেছিলেন। লেখিকার ভাষ্য অনুযায়ী, এরপর তাদের মধ্যকার বিরোধ আরও গুরুতর হয়।

চার. যখন আয়েশা রা.-কে অপবাদ দেওয়া হয়েছিল, তখন ফাতেমা রা. ও আলি রা. মিলে গোপনে বা প্রকাশ্যে উল্লাস প্রকাশ করেছিলেন।

পাঁচ. আলি রা. আয়েশা রা.-এর ওপর হিংসা করতেন। কারণ, তার পিতা আবু বকর রা. ছিলেন রাসুল ﷺ-এর সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি। এর ফলে আয়েশা রা.-ও আলি রা.-এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতেন।

ছয়. আয়েশা রা. ছিলেন নিঃসন্তান। কিন্তু আলি রা. ও ফাতেমা রা.-এর ঘরে হাসান রা. ও হুসাইন রা. জন্মগ্রহণ করেছিলেন। রাসুল ﷺ তাদের খুবই ভালোবাসতেন। এজন্যও আয়েশা রা.-এর মনে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছিল।

সাত. মৃত্যুশয্যায় রাসুল ﷺ আয়েশা রা.-এর ঘরকে বেছে নিয়েছিলেন। এতে আলি রা. ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন।

আট. মৃত্যুশয্যায় রাসুল ﷺ আয়েশা রা.-কে বলেন, কাউকে নামাজ পড়াতে বলো। তখন তিনি বেলাল রা.-কে বলেন, আবু বকর রা.-কে বলুন নামাজের ইমামতি করতে।

এ কারণে আলি রা. তার প্রতি ক্ষিপ্ত হন এবং স্বজনপ্রীতির অপবাদ আরোপ করেন। রাসুল ﷺ-এর ইন্তেকালের পর লোকেরা বলাবলি করতে থাকে, রাসুল ﷺ তাকে নামাজের ইমামতির দায়িত্ব দিয়ে আমাদের দ্বীনের জন্য

মনোনীত করলেন, অথচ আমাদের দুনিয়ার ব্যাপারেই আমরা তার প্রতি সন্তুষ্ট নই! অতঃপর আবু বকর রা. মুসলিমদের জন্য রাসুল ﷺ-এর খলিফা হিসাবে মনোনীত হন।

লেখিকা ইঙ্গিত করতে চাচ্ছে যে, আয়েশা রা. তার পিতাকে খেলাফতে অধিষ্ঠিত করার জন্য এই কৌশল করেছিলেন। এরপর লেখিকা আরেকটি বর্ণনা এনেছে। সে বর্ণনাটি হলো, আব্বাস রা. আলি রা.-কে বলেছিলেন, তোমার হাত প্রসারিত করো, আমি বাইআত গ্রহণ করে ফেলি। তখন লোকেরা বলবে, রাসুল ﷺ-এর চাচা তার চাচাতো ভাইয়ের হাতে বাইআত গ্রহণ করেছেন। ফলে কেউ এ ব্যাপারে মতবিরোধ করবে না। তখন আলি রা. বলেছিলেন, আমি ছাড়া আর কে এই আশা করতে পারে?

নয়. ফাতেমা রা.-এর ইন্তেকালের পর রাসুল ﷺ-এর সকল স্ত্রী আলি রা.-কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য গিয়েছিলেন। কিন্তু আয়েশা রা. যাননি; বরং তার মুখ থেকে আলি রা.-এর প্রতি এমন কিছু কথা বের হয়েছে, যার মাধ্যমে এ কথা বুঝে আসে যে, তিনি ফাতেমা রা.-এর ইন্তেকালের কারণে আনন্দিত হয়েছিলেন।

এরপর লেখিকা বলে, 'এসব কারণেই তাদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয় এবং জঙ্গে জামালে বহু মানুষকে রক্তবন্যায় ভাসিয়ে এর সমাপ্তি ঘটে।'

লেখিকার এই গ্রন্থটিকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর গ্রন্থ হিসাবেই দেখা হয়। কিন্তু লেখিকার জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতে এই গ্রন্থের সব উৎসই শিয়াদের থেকে নেওয়া।

অথচ জঙ্গে জামালে আয়েশা রা.-এর ভূমিকা ছিল এই যে, বসরার বিচারক কাব ইবনে সাওয়ার রহ. যখন তার কাছে এই পরিস্থিতি থেকে মুসলিমদের উদ্ধারের কথা বলেন, তখন তিনি উটের হাওদায় চড়ে রণাঙ্গনে প্রবেশ করে মুসলিমদের আহ্বান করতে থাকেন, হে আমার সন্তানেরা, তোমরা কেয়ামত দিবসের কথা স্মরণ করো।

কাব ইবনে সাওয়ার রহ.-এর হাতে তার কুরআন শরিফটি দিয়ে বলেন, মানুষের মধ্যে এটিকে উঁচু করে ধরো। হয়তো আল্লাহ তাআলা এর মাধ্যমে মানুষের মনের ক্ষোভ দূর করে দেবেন।

কাব ইবনে সাওয়ার রহ. যখন কুরআন শরিফটি উঁচু করে ধরেন তখন তার দিকে সাঁইসাঁই করে তির ছুটে আসে এবং এর আঘাতেই তিনি ইন্তেকাল করেন।[২৩৮]

আয়েশা রা. তার উটের পিঠে চড়ে রণাঙ্গনে প্রবেশ করেছিলেন। এজন্যই এই যুদ্ধকে জঙ্গে জামাল অর্থাৎ উটের যুদ্ধ বলা হয়। তখন সবাই উটকে ঘিরে উদ্যমের সঙ্গে লড়াই করতে থাকে। উটের পিঠে বসানো হাওদার ভেতর থেকে আয়েশা রা. তাদেরকে লড়াই থামাতে বলছিলেন। কিন্তু উটকে ঘিরে ধরে সবাই প্রাণপণ লড়াই চালিয়ে যেতে থাকে। সেদিন যারা আয়েশা রা.-এর উটের লাগাম ধরেছিলেন তাদের মধ্য থেকে ৭০জন নিহত হন।[২৩৯] উটটিকে ঘিরেই যুদ্ধের উত্তাপ বাড়তে থাকে এবং লড়াই আরও চরম আকার ধারণ করতে থাকে। তখন কাকা ইবনে আমর রা. আয়েশা রা.-এর হাওদাকে নিরাপদ রেখে উটটিকে হত্যা অথবা আহত করার ইঙ্গিত করেন. যেন লড়াই থেমে যায় এবং ফিতনার কালো মেঘ সরে যায়। তখন একদল আসে উটটিকে হত্যা অথবা আহত করার জন্য। এদিকে আরেকদল দাঁড়িয়ে যায় উটটিকে রক্ষা করার জন্য। উটের প্রতিরক্ষাকারীদের মধ্যে সর্বশেষ ব্যক্তিটি ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা.। তিনি ছিলেন আয়েশা রা.-এর বোনের ছেলে। তার কথা জানতে পেরে আয়েশা রা. আঁতকে উঠে বলেন. হায়! আসমা বুঝি পুত্রহারা হবে!

তিনি মনে করেছিলেন, এভাবে চলতে থাকলে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের অচিরেই নিহত হবে। সেদিন তিনি ৩৭টি আঘাতে জর্জরিত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন বীর যোদ্ধাদের একজন। সেদিন ভাগ্যক্রমে তিনি বেঁচে যান এবং পরবর্তী সময়ে আরও অনেকদিন তার জীবনের সফর চলমান থাকে।[২৪০]

ক্লান্তিকর লড়াইয়ের পর আলি রা.-এর বাহিনী উটটিকে আঘাত করতে সক্ষম হয়। উটটি মাটিতে পড়ে গেলে আয়েশা রা.-এর বাহিনীর উদ্দীপনা কমে আসে এবং তারা পালাতে শুরু করেন। ফলে যুদ্ধে জয়ের পাল্লা আলি রা.-এর দিকেই ঝুঁকে পড়ে। উট মাটিতে পড়ে যাওয়ার পূর্বে আয়েশা রা.-এর

---

২৩৮. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/২৭০

২৩৯. *তারিখুত তবারি*, ৪/৫০৯; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/২৭১

২৪০. *আত-তবাকাতুল কুবরা*, ৩/৩৭; *তারিখুত তবারি*, ৪/৫০৯

হাওদাকে বর্ষার আঘাতে জর্জরিত করা হয়। বর্ণনাকারীদের মত অনুযায়ী, হাওদাটি দেখতে তখন শজারুর মতো মনে হচ্ছিল। আলি রা. লোকদের হাওদায় তির নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু তির নিক্ষেপের ক্ষেত্রে হাওদা আর উটের মধ্যে পার্থক্য করা হয়নি। কিছু তির ফিতনাবাজদের পক্ষ থেকে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, আর কিছু উদ্দেশ্যহীনভাবেও নিক্ষেপ করা হয়েছিল।

এবার মুসলিমরা আয়েশা রা.-এর হাওদার পাশে এসে সমবেত হন। পতিত উটের পিঠ থেকে উঠিয়ে হাওদাটি জমিনের ওপর এনে রাখা হয়। আলি রা. হাওদার ওপর তাঁবু খাটানোর নির্দেশ দেন, যেন আয়েশা রা.-এর পর্দা রক্ষা হয়। নির্দেশ অনুযায়ী তাঁবু খাটানো হয়। অতঃপর তার ভাই মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর রা. আসেন, যিনি উসমান রা.-এর অবরোধে অংশ নিয়েছিলেন। তবে তিনি এজন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে তওবা করেছিলেন। অতঃপর মুসলিমদের কাতারে এসে তার তরবারি দিয়ে উসমান রা.-এর খুনিদের প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাতে সক্ষম হননি। এরপর তিনি আলি রা.-এর হাতে বাইআত গ্রহণ করেন। এখন তিনি আলি রা.-এর বাহিনীর হয়ে লড়াই করছেন। তিনি আয়েশা রা.-কে বললেন, আপনার শরীরের কোথাও কি কোনো আঘাত লেগেছে?

আয়েশা রা. বললেন, না, তা দিয়ে তোমার কী কাজ?[২৪১]

বুঝা যায় যে, ইতিপূর্বে উসমান রা.-এর সঙ্গে মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর রা. যা করেছেন সেজন্য আয়েশা রা. তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

অতঃপর আসেন আম্মার ইবনে ইয়াসির রা.। তখন তার বয়স ছিল ৯০ আর আয়েশা রা.-এর বয়স ছিল ৪৪ অথবা ৪৫ বছর। তিনি আয়েশা রা.-কে বলেন, আপনি কেমন আছেন মা?

আয়েশা রা. বলেন, আমি আপনার মা নই।

আম্মার রা. বললেন, আপনি অপছন্দ করলেও আপনি আমার মা।[২৪২]

---

২৪১. *আল-কামিল ফিত তারিখ*, ২/৬১০

২৪২. *আল-কামিল ফিত তারিখ*, ২/৬১০

আলি রা. ও আয়েশা রা.-এর মধ্যকার সংলাপ

আমিরুল মুমিনিন আলি রা. এসে আয়েশা রা.-কে সালাম প্রদান করে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কেমন আছেন উম্মুল মুমিনিন?

আয়েশা রা. বললেন, আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছি।

আলি রা. বললেন, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। এক বর্ণনা অনুযায়ী আয়েশা রা.-ও বলেন, এবং আপনাকেও ক্ষমা করুন।[২৪৩]

অতঃপর আলি রা.-এর বাহিনীর নেতৃবর্গ ও সহযোগীদের মধ্য থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এসে উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রা.-কে সালাম জানাতে থাকেন। এভাবেই তারা রাসুল ﷺ-এর সহধর্মিণী এই মহীয়সী নারীকে সম্মান জানান।[২৪৪]

নিজের ইজতেহাদ অনুসারে আয়েশা রা. যুদ্ধের সমাপ্তি পর্যন্ত নিশ্চিত ছিলেন যে, তিনি সত্যের ওপর আছেন। তিনি ছিলেন খুবই বিজ্ঞ একজন নারী এবং আবু হুরাইরা রা.-এর পর সবচেয়ে বেশি হাদিস বর্ণনাকারী। আবু মুসা আশআরি রা. বলতেন, যদি কখনো রাসুল ﷺ-এর কোনো হাদিস জটিল মনে হতো, তখন আয়েশা রা.-এর কাছে সেই হাদিসের সঠিক সমাধান জানতে পারতাম।

তিনি ছিলেন রাসুল ﷺ-এর সবচেয়ে প্রিয় মানুষ। *সহিহ বুখারি*-তে আমর ইবনুল আস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ তাকে সেনাপতি হিসাবে যাতুস সালাসিল যুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন। তিনি বলেন, যুদ্ধ থেকে ফিরে রাসুল ﷺ-এর কাছে এসে বললাম, আপনার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ কে?

তিনি বললেন, আয়েশা।

আমি বললাম, পুরুষদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় কে?

তিনি বললেন, তার (আয়েশা রা.-এর) পিতা।

আমি বললাম, তারপর কে?

---

২৪৩. *আল-কামিল ফিত তারিখ*, ২/৬১১

২৪৪. *আল-কামিল ফিত তারিখ*, ২/৬১১

তিনি বললেন, উমর ইবনুল খাত্তাব।

এভাবে তিনি আরও কয়েকজনের নাম বলেন।[২৪৫]

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর মধ্যে এ নিয়ে কোনো মতানৈক্য নেই যে, খাদিজা রা. ও আয়েশা রা. ছিলেন রাসুল ﷺ-এর স্ত্রীগণের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। তবে তাদের দুজনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, এ নিয়ে সামান্য মতভেদ রয়েছে।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর আয়েশা রা. উপলব্ধি করেন যে, তিনি ভুলের ওপর ছিলেন। নিজের আগমনের কারণে তিনি অনুতপ্ত হন। এরপর যখনই তার কাছে জঙ্গে জামালের কথা আলোচনা করা হতো, তিনি কাঁদতেন এবং কামনা করতেন যদি এই দিনের ২০ বছর পূর্বে তিনি মারা যেতেন!

অতঃপর আলি রা. নির্দেশ দেন আয়েশা রা.-এর হাওদাকে বসরার সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত ঘরে নিয়ে যেতে। তাই তাকে সসম্মানে এবং নিরাপত্তার সঙ্গে আবদুল্লাহ ইবনে খালাফ খোজায়ি[২৪৬] নামক এক ব্যক্তির বাড়িতে নেওয়া হয়।[২৪৭] আলি রা. চলে যান উভয় পক্ষের নিহতদের খোঁজ করতে। আলি রা.-এর জন্য এ ছিল খুবই কঠিন ও পীড়াদায়ক মুহূর্ত। এ সময় তিনি আওয়াজ করে কান্না করছিলেন। যখন তিনি যুদ্ধে নিহত হওয়া তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রা.-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তার পাশে বসে পড়েন এবং কান্নাভেজা কণ্ঠে বলতে থাকেন, হে আবু মুহাম্মাদ, আপনার জন্য আমার মনে কী যে বেদনার ঝড় বইছে তা যদি বুঝাতে পারতাম!

তালহা রা.-এর পুত্র মুহাম্মাদ ইবনে তালহা রা.। তিনিও জঙ্গে জামালে নিহত হয়েছিলেন। তাকে দেখে আলি রা. কাঁদতে কাঁদতে বলেন, এই ব্যক্তিকে আমরা সাজ্জাদ তথা অধিক সেজদাকারী নামে ডাকতাম। অধিক সেজদা করার কারণে তাকে এ নামে ডাকা হতো। তিনি ছিলেন একজন খোদাভীরু ও আল্লাহওয়ালা ব্যক্তি। এভাবে আলি রা. উভয় পক্ষের নিহত ব্যক্তিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তাদের সকলের জন্যই ক্ষমা ও রহমতের দোয়া করছিলেন। উভয় পক্ষের শহিদগণের জানাজার নামাজ আদায় করে তাদের

---

২৪৫. *সহিহ বুখারি*, ৩৬৬২; *সহিহ মুসলিম*, ২৩৮৪

২৪৬. **আবদুল্লাহ ইবনে খালাফ খোজায়ি :** তিনি তাবেয়ি ছিলেন।-সম্পাদক

২৪৭. *আল-কামিল ফিত তারিখ*, ২/৬১১; *তারিখু ইবনি খালদুন*, ২/৬৩০; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/২৭৩

দাফনের নির্দেশ দেন এবং বসরার বাহিনী যা ফেলে গিয়েছে সেগুলো জমা করতে বলেন। অতঃপর এগুলো বসরার মসজিদে রেখে ঘোষণা দেন, যে ব্যক্তি তার সম্পদ চিনতে পারবে, সে যেন তা নিয়ে যায়।

তিনি আহতদের হত্যা করতে নিষেধ করেন এবং চিকিৎসার নির্দেশ দেন। এমনইভাবে পলায়নকারীদের পিছু নিতে এবং কোনো বন্দিকে হত্যা করতে কড়াভাবে নিষেধ করেন।[২৪৮] কারণ, উভয় পক্ষই মনে করতেন, তারা হকের ওপরে আছেন এবং উভয় পক্ষই ছিল মুসলিম।

ফিতনাবাজরা চেয়েছিল তাদের যেন গনিমতের সম্পদ বণ্টন করে দেওয়া হয়। আলি রা. তার প্রজ্ঞা থেকে বলেছিলেন, মুসলিমদের মধ্যকার যুদ্ধে কোনো গনিমতের সম্পদ হবে না। গনিমত লাভ হয় কেবল শত্রুদের কাছ থেকে। ফিতনাবাজরা তাদের মতে অটল থাকলে পরিশেষে আলি রা. তাদের বলেন, তবে চলো, গনিমতের সম্পদ বণ্টন করি। এখন বলো, আয়েশা রা. কার ভাগে যাবে?

এ কথা শুনে তারা হতভম্ব হয়ে এ বিষয়টি ছেড়ে দেয় এবং ফিরে যায়।[২৪৯]

আলি রা. আবদুল্লাহ ইবনে খালাফ খোজায়ি রহ.-এর বাড়িতে আয়েশা রা.-এর কাছে যান এবং সবচেয়ে উত্তমরূপে তার মক্কা যাত্রার ব্যবস্থা করেন। বসরার অভিজাত ৪০জন মহিলাকে তার সফরসঙ্গী হিসাবে নির্বাচন করা হয়। তাদের সঙ্গে মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর রা. ও আম্মার ইবনে ইয়াসির রা.-কেও পাঠানো হয়।[২৫০]

আবদুল্লাহ ইবনে খালাফ খোজায়ি রহ.-এর বাড়ির দরজায় আলি রা.-কে জানানো হয় যে, দুজন ব্যক্তি আয়েশা রা.-এর ব্যাপারে মন্দ বলেছে। তখন তাদের দুজনকেই উম্মুল মুমিনিন এবং রাসুল ﷺ-এর সম্মানিতা সহধর্মিণীকে গালি দেওয়ার শাস্তি হিসাবে ১০০ করে বেত্রাঘাত প্রদানের নির্দেশ প্রদান করেন।

এখানে যুদ্ধের পরিভাষায় কেউ বিজয়ী অথবা পরাজিত হয়নি। কারণ, যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকলেই ছিল মুসলিম। (বাহ্যত) আলি রা.-এর পক্ষে বিজয়

---

২৪৮. *আল-কামিল ফিত তারিখ*, ২/৬২০; *তারিখু ইবনি খালদুন*, ২/৬১৯

২৪৯. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/২৭৩

২৫০. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/২৭

আসা সত্ত্বেও তিনিই ছিলেন সবচেয়ে দুঃখিত, ব্যথিত ও যন্ত্রণাদগ্ধ। বিজয়ী এবং পরাজিত উভয় পক্ষের অনুভূতি এমনই ছিল।

এই মর্মান্তিক ঘটনায় উভয় পক্ষের মোট ১০ হাজার মুসলিম শহিদ হন; আলি রা.-এর বাহিনীর ৫ হাজার, আর আয়েশা রা., তালহা রা., যুবায়ের রা. ও যুবায়ের ইবনুল আওয়াম রা.-এর বাহিনীর ৫ হাজার।[২৫১] এরা সকলেই ছিলেন মুসলিম, যারা অপর মুসলিম ভাইয়ের হাতে নিহত হয়েছেন। একদিনে এতসংখ্যক মুসলিম এর আগে আর কখনোই নিহত হয়নি। যেখানে কাদিসিয়ার যুদ্ধে একদিনে শহিদ হয়েছেন ৮ হাজার ৫০০ মুসলিম। ইয়ারমুকের যুদ্ধে শহিদ হয়েছিলেন ৩ হাজার মুসলিম। আর ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম ট্র্যাজেডি জিসর অর্থাৎ সেতুর যুদ্ধে একদিনে শহিদ হয়েছিলেন ৪ হাজার মুসলিম। অথচ জঙ্গে জামালে একদিনেই শহিদ হয়েছেন ১০ হাজার মুসলিম। তাই মুসলিমদের জন্য এটি ছিল খুবই কঠিন ও মর্মান্তিক এক ঘটনা। আল্লাহ তাআলা যা ফয়সালা করেন তা অবশ্যম্ভাবী। যারা ইজতেহাদ করেছেন, তাদের মধ্যে যারা সঠিক ছিলেন আল্লাহ তাআলা তাদের দুটি সওয়াব দান করেছেন। আর যারা ইজতেহাদের ভুল করেছেন তারাও একটি করে সওয়াব পেয়েছেন এবং তাদের সকলেই ছিলেন মুসলিম উম্মাহর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের অন্তর্ভুক্ত।

***

২৫১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭/২৭৩

সিফফিন যুদ্ধের প্রেক্ষাপট

ইতিমধ্যেই জেনেছি, জঙ্গে জামাল সমাপ্তির পর আলি রা. প্রথমেই মনোনিবেশ করেন আয়েশা রা.-এর হাওদার প্রতি। এমনকি তিনি আয়েশা রা.-কে বসরার সবচেয়ে অভিজাত বাড়িতে রাখার ব্যবস্থা করেন। আয়েশা রা. যখন মক্কায় চলে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন তখন তিনি বসরার অভিজাত ৪০জন মহিলাকে তার সফরসঙ্গী নির্বাচিত করেন। সঙ্গে মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর রা., আম্মার ইবনে ইয়াসির রা.-কেও পাঠানো হয়। একদল সৈন্যের মাধ্যমে তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। বিদায় জানানোর জন্য আলি রা. কাফেলার সঙ্গে কয়েক মাইল পর্যন্ত এগিয়ে যান। এমনইভাবে হাসান রা. ও হুসাইন রা.-ও আয়েশা রা.-এর পিছু পিছু বহুদূর পর্যন্ত যান। তারা তাকে মক্কার গমনপথ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসেন।

বসরা থেকে প্রস্থানের পূর্বে আয়েশা রা. সকলের কাছ থেকে বিদায় নেন। লোকদের উদ্দেশে বলেন, আমাদের কেউ যেন অপরের বিষোদগার না করে। আল্লাহর শপথ! আমার এবং আলির মধ্যে পূর্বে তেমনই সম্পর্ক ছিল যেমনটি একজন স্ত্রী এবং তার স্বামীর নিকটাত্মীয়দের মধ্যে হয়ে থাকে। নিশ্চয় আলি একজন উত্তম ব্যক্তি। তখন আলি রা. বলেন, তিনি সত্য বলেছেন। আল্লাহর শপথ! আমাদের মধ্যে এমনই সম্পর্ক ছিল। আর নিশ্চয় দুনিয়া এবং আখেরাতে তিনি আমাদের সম্মানিত নবীর সম্মানিতা স্ত্রী।[২৫২]

এই ছিল তাদের দুজনের একে অপরের ব্যাপারে মন্তব্য।

এরপর আয়েশা রা. মক্কায় অবস্থান করেন এবং সে বছর অর্থাৎ ৩৬ হিজরিতে হজ আদায় করেন। হজের পর তিনি মদিনা মুনাওয়ারায় ফিরে আসেন। জঙ্গে জামালের পর বসরার সকল অধিবাসী আলি রা.-এর হাতে বাইআত গ্রহণ করেন, যুদ্ধে যারা তার পক্ষে ছিল এবং যারা বিপক্ষে ছিল সকলেই বাইআত গ্রহণ করেন; এভাবে বসরার নিয়ন্ত্রণ নিষ্কণ্টক হওয়ার পর তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-কে সেখানকার গভর্নর নিযুক্ত করেন। অতঃপর বসরা ত্যাগ করে কুফা অভিমুখে রওনা হন। তার বাহিনীর অধিকাংশই ছিল

---

২৫২. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/২৭৪

সেখানকার অধিবাসী। সেখানে গিয়ে তিনি একটি সাধারণ ঘরে অবস্থান করেন এবং কুফার বিখ্যাত শ্বেতপ্রাসাদে অবস্থানে অস্বীকৃতি জানান। কারণ, প্রাসাদটি অতি উৎকৃষ্ট হওয়ায় উমর রা. এটিকে অপছন্দ করতেন। আলি রা. কুফার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সেখানে কিছুদিন অবস্থান করেন। বসরা ও কুফা তার বশ্যতা মেনে নেয়। এর ফলে বিশাল এক অঞ্চলে তার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এ দুই অঞ্চলে অনেক সৈন্যও রয়েছে। এ সময় পর্যন্তও ফিতনাবাজদের কিছু লোক আলি রা.-এর বাহিনীতে ছিল। তাদের মধ্য থেকে বসরার প্রথম যুদ্ধে নিহত হয়েছিল ৬০০জন, আর জঙ্গে জামালে নিহত হয়েছিল আরও অনেকেই।

উসমান রা.-এর খেলাফতের সময় মিশরের গভর্নর ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে আবু সারহ রা.। তিনি তার বাহিনী নিয়ে উসমান রা.-এর সাহায্যের জন্য এসেছিলেন। কিন্তু হত্যাকাণ্ডের কথা জানতে পেরে তিনি শাম অভিমুখে রওনা দেন। মুআবিয়া রা., আয়েশা রা., তালহা রা. ও যুবায়ের রা. প্রমুখের মতো তিনিও বাইআত গ্রহণের পূর্বে উসমান রা.-এর খুনিদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার পক্ষে ছিলেন।

ইবনে আবু সারহ রা. চলে আসার পর মিশরের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় মুহাম্মাদ ইবনে আবু হুজাইফা। ইয়ামামার যুদ্ধে শহিদ হওয়া বীর মুজাহিদ হুজাইফা ইবনে উতবা রা.-এর সন্তান এবং উসমান রা.-এর কাছে লালিতপালিত হওয়া সত্ত্বেও এই অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিটি ছিল ফিতনাবাজদের অন্যতম মূলহোতা। তার অভিযোগ ছিল, উসমান রা. তার যোগ্যতার মূল্যায়ন করে তাকে কোনো অঞ্চলের গভর্নর নিয়োগ দেননি। তাই সে উসমান রা.-এর ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করে এবং ফিতনার পরিকল্পনায় আবদুল্লাহ ইবনে সাবাকে সহযোগিতা করে। অতঃপর মিশরের ক্ষমতা দখল করে নেয়। মুআবিয়া রা. তখন শামে অবস্থান করছেন, যা ছিল মদিনা ও ইরাকের তুলনায় মিশরের সবচেয়ে নিকটবর্তী অঞ্চল। ফিতনার ঘটনা এবং বসরার যুদ্ধের সময় মুআবিয়া রা. মিশরের এই ফিতনাবাজদের দমনে ছোট্ট একটি বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। মুহাম্মাদ ইবনে আবু হুজাইফাও তাদের উদ্দেশে বের হয়। সিনাই উপত্যকার আরিশ নামক স্থানে তাদের মধ্যে লড়াই হয়। এতে মুহাম্মাদ ইবনে আবু হুজাইফা এবং তার সহযোগী ৩০ ফিতনাবাজ নিহত হয়।

মুআবিয়া রা.-এর বাহিনী মিশরের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পূর্বেই আলি রা. মিশরের গভর্নর হিসাবে কায়স ইবনে সাদ রা.-কে পাঠিয়ে দেন। তিনি সাতজনের

এক কাফেলা নিয়ে মুআবিয়া রা.-এর বাহিনীর পূর্বেই মিশরে পৌঁছে সেখানকার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেন এবং মিম্বরে আরোহণ করে ঘোষণা দিয়ে দেন যে, তিনি আলি রা.-এর পক্ষে বাইআত গ্রহণ করবেন। তখন মিশরের প্রায় সকলেই তার হাতে বাইআত গ্রহণ করে। তবে অল্প কিছু লোক বাইআত না হয়ে মিশরের বুহাইরা প্রদেশের খারবাতাহ নামক গ্রামে চলে যান। সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য কায়স ইবনে সাদ রা. তাদের ব্যাপারটি উপেক্ষা করেন। অতঃপর মিশরে আলি রা.-এর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয়ে যায়। এতে মুআবিয়া রা. সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তিনি আলি রা.-এর পক্ষ থেকে নিযুক্ত মিশরের গভর্নর কায়স ইবনে সাদ রা.-এর কাছে চিঠি লিখে পাঠান এবং তার বিরুদ্ধে প্রমাণ উপস্থাপন করেন। মুআবিয়া রা. তখন উসমান রা.-এর খুনিদের সন্ধানে এবং তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তায় উদ্‌গ্রীব ছিলেন।

কায়স ইবনে সাদ রা. ছিলেন আলি রা. থেকে অনেক দূরে। তিনি ছিলেন মিশরে, আর আলি রা. ছিলেন ইরাকে। তাদের দুজনের মাঝখানে শামে ছিলেন মুআবিয়া রা.। কায়স ইবনে সাদ রা. মুআবিয়া রা.-এর চিঠির কোনো কড়া জবাব লিখে পাঠাননি। বরং তার প্রেরিত জবাবে বেশ কিছু বিষয় নিয়ে সন্দেহ জাগে। শামজুড়ে খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, মুআবিয়া রা.-এর সঙ্গে কায়স ইবনে সাদ রা.-এর গোপন আঁতাত রয়েছে। আলি রা. মিশরের পরিস্থিতির পরিবর্তন এবং বসরায় যা ঘটেছে তার পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা করেন। তাই তিনি বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য কায়স রা.-কে বরখাস্ত করেন এবং তার স্থলে মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর রা.-কে নিযুক্ত করেন।

এরপর পুরো মিশর আলি রা.-এর নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। বরখাস্ত হওয়ার পর কায়স ইবনে সাদ রা. আলি রা.-এর কাছে ফিরে গিয়ে মুআবিয়া রা.-এর কাছে পাঠানো জবাবের পক্ষে অপারগতা প্রকাশ করেন এবং এর কারণ ব্যক্ত করেন। আলি রা. তার অপারগতা গ্রহণ করে নেন। অতঃপর তিনি আলি রা.-এর বাহিনীতে যুক্ত হয়ে যান।

কুফায় অবস্থানকালে আলি রা. দুটি চিঠি প্রেরণ করেন। এর একটি ছিল উসমান রা.-এর পক্ষ থেকে নিযুক্ত পারস্যের হামাদান অঞ্চলের গভর্নর জারির ইবনে আবদুল্লাহ বাজালি রা.-এর কাছে। চিঠি পাঠিয়ে তার থেকে বাইআত তলব করেন। তিনি পুরো হামাদানবাসীর থেকে আলি রা.-এর পক্ষে বাইআত গ্রহণ করেন এবং বাইআতের অঙ্গীকার নিয়ে আলি রা.-এর কাছে আসেন।

অপর চিঠিটি ছিল আজারবাইজানের গভর্নর আশআস ইবনে কায়সের উদ্দেশে। তিনি সেখানে আলি রা.-এর পক্ষে বাইআত গ্রহণ করেন। এর ফলে ইরাকের পূর্বদিকের অঞ্চলসমূহের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আলি রা.-এর হাতে চলে আসে এবং কুফা, বসরা ও পার্শ্ববর্তী সব অঞ্চল তার অধীন হয়ে যায়। পাশাপাশি মক্কা, মদিনা, ইয়ামেন এবং মিশর অঞ্চলেও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয়ে যায়। একমাত্র শামেই তখন আলি রা.-এর বাইআত গ্রহণ বাকি ছিল। মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রতিটি অঞ্চল আলি রা.-এর খেলাফতের ব্যাপারে একমত হয়ে যায়। একমাত্র শাম অঞ্চলই তার বিরোধিতা করে। অবশ্য তা ছিল বিশাল একটি অঞ্চল।

এটি ছিল খুবই গুরুতর একটি সমস্যা। তাই আলি রা.-এর পক্ষ থেকে সহনশীল ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন ছিল। ফলে তিনি জারির ইবনে আবদুল্লাহ বাজালি রা.-কে মুআবিয়া রা.-এর কাছে প্রেরণ করেন, যেন তিনি তার সঙ্গে কথা বলে মুসলিমদের মধ্যে কোনো সংঘাত ছাড়াই এই সংকটের সমাধানে পৌঁছতে পারেন। বিশেষ করে জঙ্গে জামালের মর্মান্তিক ঘটনায় ১০ হাজার মুসলিম শহিদ হওয়ার পর তিনি কোনোভাবেই মুসলিমদের মধ্যে যুদ্ধ চাচ্ছিলেন না। জারির ইবনে আবদুল্লাহ রা. মুআবিয়া রা.-এর কাছে যান এবং মুসলিমদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও পরস্পর যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার লক্ষ্যে আলি রা.-এর হাতে বাইআত গ্রহণের প্রস্তাব পেশ করেন। তখন মুআবিয়া রা. শামের নেতৃস্থানীয় লোকদের একত্র করেন। তাদের মধ্যে ছিলেন অনেক সাহাবি, ফকিহ, বিশিষ্ট তাবেয়ি ও বিচারকবৃন্দ। তিনি তাদের কাছে এ ব্যাপারে পরামর্শ চাইলে তারা সকলেই ইজতেহাদ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, উসমান রা.-এর হত্যার প্রতিশোধ না নিয়ে বাইআত গ্রহণ করা বৈধ হবে না। তারা বলেন, আলি রা. উসমান রা.-এর খুনিদের আশ্রয় দিয়েছেন এবং আল্লাহ তাআলার একটি বিধানকে বিলম্বিত করছেন। তাই তার জন্য বাইআত গ্রহণ করা বৈধ হবে না।

মুআবিয়া রা. নিশ্চিত ছিলেন, তিনিই এখন উসমান রা.-এর রক্তের উত্তরসূরি। তাই ওই সকল খুনিদের শাস্তিবিধানের কোনো বিকল্প নেই। কোনোমতেই এ ব্যাপারে ত্রুটি করা বৈধ হবে না। তিনি কুরআনের এই আয়াতের ব্যাখ্যা করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا﴾

যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হয়, আমি তার উত্তরাধিকারীকে ক্ষমতা দান করেছি। অতএব, সে যেন হত্যার ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন না করে। নিশ্চয় সে সাহায্যপ্রাপ্ত। [সুরা বনি ইসরাইল : ৩৩]

উসমান রা. ও মুআবিয়া রা. ছিলেন চাচাতো ভাই এবং তার উত্তরাধিকারী। নায়েলা রহ. তাকে বলেছিলেন, আপনিই এখন তার উত্তরসূরি।

এই দায়িত্বই তাকে উসমান রা.-এর খুনিদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্‌বুদ্ধ করেছিল।

আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা হচ্ছে, নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা চাইলে খুনিকে ক্ষমা করে দিতে পারে অথবা শাসকের কাছে নিহতের পক্ষে কিসাসের দাবি জানাতে পারে। রক্তের দাবিদার নিজ হাতে বিচার তুলে নেবে না। তাই প্রথমে এমন একজন শাসকের প্রয়োজন, লোকেরা পূর্ব থেকেই যার হাতে বাইআত গ্রহণ করেছে। রক্তের দাবিদার তার কাছে বাইআত গ্রহণ করে নিহত ব্যক্তির পক্ষে কিসাস গ্রহণের দাবি জানাবে। বাইআত গ্রহণ না করে কিসাসের দাবি জানাতে পারবে না। কিন্তু মুআবিয়া রা. জারির ইবনে আবদুল্লাহ রা.-এর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এমনকি উলটো তিনি নিজের পক্ষ থেকে আলি রা.-এর কাছে এ মর্মে কয়েকজন দূত প্রেরণ করেন যে, উসমান রা.-এর খুনিদের হস্তান্তর করার পর অথবা আলি রা. নিজেই তাদের হত্যা করার পর মুআবিয়া রা. তার কাছে বাইআত গ্রহণ করবেন।

আলি রা. দেখছিলেন, সমস্ত ইসলামি সাম্রাজ্য থেকে একমাত্র এই দলটিই তার বিরোধিতা করছে। তাই সত্য ও মুসলিম ঐক্যের দিকে ফিরিয়ে আনার জন্য তাদের সঙ্গে লড়াই করা অনিবার্য হয়ে পড়েছে। তবে যুদ্ধ শুরুর পূর্বে শামবাসীদেরকে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝানোর এবং লড়াইয়ের হুমকি দিয়ে দমানোর চেষ্টাও করেন। এরপর তিনি সেনাবাহিনী প্রস্তুত করার নির্দেশ দেন এবং লোকদের কাছে পরামর্শ চান। তখন প্রায় সকলেই সেনাবাহিনী অভিযানে বের হওয়ার এবং আলি রা. নিজে বাহিনী পরিচালনার পক্ষে মত প্রদান করেন। তবে যারা তার এই অভিযানের বিরোধিতা করেন তাদের মধ্যে হাসান রা. ছিলেন অন্যতম। তিনি মনে করতেন যে, শামবাসীদের

সঙ্গে লড়াইয়ের ফলে অচিরেই আরেকটি বিরাট ফিতনা সংঘটিত হবে। কিন্তু আলি রা. চেয়েছিলেন ফিতনাকে মূল থেকে উৎখাত করতে এবং অঙ্কুরেই শেষ করে দিতে।

সিফফিনের উদ্দেশে উভয় পক্ষের যাত্রা

আলি রা. কুফা থেকে বেরিয়ে কুফার বাইরে নাখিলা নামক অঞ্চলে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেন। কুফায় তার স্থলাভিষিক্ত করে যান বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবি উকবা ইবনে আমের আনসারি রা.-কে। আলি রা. অগ্রবর্তী দলকে শামের উদ্দেশে পাঠিয়ে দেন। তারা ফোরাত নদী অতিক্রম করে সিফফিন নামক অঞ্চলে পৌঁছে যায়। আর তিনি অগ্রবর্তী দলের পেছনে পেছনে তার বাহিনী নিয়ে চলতে থাকেন।

মুআবিয়া রা.-এর কাছে সংবাদ পৌঁছায় যে, শামবাসী আলি রা.-এর বাইআত গ্রহণ না করায় আলি রা. তার বাহিনী নিয়ে ইরাক থেকে শামের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন। মুআবিয়া রা. শামের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ করলে তারা আলি রা.-এর বাহিনীর অপেক্ষায় শামে বসে না থেকে তাদের উদ্দেশে বের হওয়ার পরামর্শ দেন। তারা আরও বলেন, যেমনইভাবে আলি রা. নিজে তার বাহিনীর সঙ্গে এসেছেন, তেমনইভাবে মুআবিয়া রা. নিজেই যেন তার বাহিনী পরিচালনা করেন।

মুআবিয়া রা. তাদের এই মতের সঙ্গে একমত হন এবং নিজেই বাহিনী নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। সেদিন যারা তাকে উৎসাহিত করেছিলেন তাদের মধ্যে আমর ইবনুল আস রা. ছিলেন অন্যতম। তিনি লোকদের উদ্দেশে বলেন, বসরা এবং কুফার বীর যোদ্ধাদের অধিকাংশই জঙ্গে জামালের দিন নিহত হয়েছে। আলির সঙ্গে এখন অল্প কিছু লোকই অবশিষ্ট আছে। খলিফা উসমান ইবনে আফফান রা.-কে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। তাই তোমরা উসমান রা.-এর রক্ত বৃথা যেতে দেওয়ার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। আমর ইবনুল আস রা. এভাবেই লোকদের যুদ্ধে বের হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। এরপর সেনাবাহিনীর বিগ্রেড গঠন করা হয়। মুআবিয়া রা. তার বাহিনী নিয়ে বেরিয়ে পড়েন এবং বাহিনীর অগ্রভাগকে আলি রা.-এর বাহিনীর উদ্দেশে পাঠিয়ে দিয়ে তাদের অনুসরণ করতে থাকেন।

তখন আমর ইবনুল আস রা.-এর বয়স ছিল ৮৬ বছর। এ বয়সে এসেও তিনি লোকদের লড়াইয়ের জন্য উদ্বুদ্ধ করছিলেন। তিনি ছিলেন একজন

সম্মানিত ব্যক্তি এবং রাসুল ﷺ-এর একজন বিশিষ্ট সাহাবি। তার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে অসংখ্য হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তাই কারও জন্যই তার প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করা উচিত নয়। কেউ যেন এই ধারণা না করেন যে, জীবনের এই পর্যায়ে, আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সাক্ষাতের দরজায় দাঁড়িয়ে তিনি ক্ষমতা অথবা দুনিয়ালাভে আগ্রহী ছিলেন।

আলি রা.-এর অগ্রবর্তী দলের নেতৃত্বে ছিলেন যিয়াদ ইবনে নজর রহ. এবং মুআবিয়া রা.-এর অগ্রবর্তী দলের নেতৃত্বে ছিলেন আবুল আওয়ার সুলামি রা.। উভয় পক্ষের অগ্রবর্তী দল সিফফিনের প্রান্তরে পরস্পর মুখোমুখি হন।

আলি রা. তার বাহিনীর অগ্রভাগে এই মর্মে নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন যে, তোমরা তাদেরকে বারবার বাইআতের দিকে আহ্বান করো। যদি তারা অস্বীকার করে, তবে তোমরা তাদের আগে লড়াই শুরু করো না। তাদের মধ্য থেকে যুদ্ধে আগ্রহী কেউ যেন তোমাদের কাছাকাছি আসতে না পারে এবং কেউ যেন তাদের থেকে ভীত হয়ে দূরে সরে না যায়।

আলি রা.-এর বাহিনীর অগ্রবর্তী দল মুআবিয়া রা.-এর বাহিনীর অগ্রবর্তী দলের কাছে বারবার বাইআত গ্রহণের প্রস্তাব পেশ করে। কিন্তু তারা বাইআত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। মুআবিয়া রা.-এর বাহিনীর আবুল আওয়ার সুলামি রা.-ই প্রথমে যুদ্ধ শুরু করেন। কিছুক্ষণ তাদের মধ্যে লড়াই হয় এবং বেশ কিছু লোক শহিদ হন। এরপর তারা বিরত হন। তখন ৩৬ হিজরির জিলহজ মাস কেবল শুরু হয়েছে। অর্থাৎ জঙ্গে জামালের সাত অথবা আট মাস পর শুরু হয় এই যুদ্ধ। পরদিন উভয় পক্ষ পুনরায় কিছু সময়ের জন্য লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। অতঃপর কিছু লোকের শাহাদাতবরণের পর আবার তারা লড়াই থেকে বিরত হন।[২৫৩]

তৃতীয় দিন আলি রা. অবশিষ্ট বাহিনী নিয়ে উপস্থিত হন এবং মুআবিয়া রা.-ও উপস্থিত হন তার অবশিষ্ট বাহিনী নিয়ে।

আলি রা.-এর বাহিনীর সেনাসংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ২০ হাজার। এদিকে মুআবিয়া রা. কেবল শামের অধিবাসীদের থেকেই ৯০ হাজার সেনা একত্র করেছিলেন। এ সংখ্যা ছিল অনেক বিশাল। ইতিপূর্বে কখনো মুসলিমদের এত সৈন্য দেখা যায়নি। ইয়ারমুকের যুদ্ধে মুসলিমদের সংখ্যা ছিল ৩৬

২৫৩. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/২৮৪

হাজার আর কাদিসিয়ার যুদ্ধে ছিল ৩০ হাজার। কিন্তু সিফফিনের যুদ্ধে সেদিন দুই পক্ষে সর্বমোট ২ লক্ষ ১০ হাজার সৈনিক সমবেত হয়েছিল। যারা সকলেই ছিলেন মুসলিম।

সিফফিন অঞ্চলে পৌঁছে মুআবিয়া রা. একটি নদী দেখতে পান, যা থেকে পুরো সিফফিন অঞ্চলে পানির ব্যবস্থা হয়। তিনি নদীটির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেন এবং আলি রা.-এর বাহিনীর কাছে পানি সরবরাহের পথ বন্ধ করে দেন। অনেক দিন পানি বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে পিপাসায় আলি রা.-এর বাহিনী মৃত্যুর উপক্রম হয়ে যায়। উভয় পক্ষই পানির জন্য লড়াই করতে থাকে। এ দিনের শেষভাগে আলি রা. সাসা ইবনে সুহান রহ.-কে মুআবিয়া রা.-এর কাছে প্রেরণ করে জানান যে, আমরা আপনাদের কাছে এসেছিলাম সত্যকে প্রমাণিত করার জন্য, লড়াইয়ের জন্য নয়। এরপর আপনি আপনার অগ্রবর্তী দলকে প্রেরণ করেছেন। তারাই আগে আমাদের সঙ্গে লড়াই শুরু করেছে। আর এখন আপনারা আমাদের পানিবঞ্চিত করছেন!

মুআবিয়া রা. এ নিয়ে নেতৃস্থানীয়দের সঙ্গে পরামর্শ করেন। তখন আমর ইবনুল আস রা. বলেন, তাদের জন্য পানি সরবরাহের পথ উন্মুক্ত করে দিন। আমরা পানি পান করব আর তারা পিপাসিত থাকবে, তা কখনোই ইনসাফ হতে পারে না।

তখন মুআবিয়া রা.-এর অপর এক পরামর্শক ওয়ালিদ বলেন, তাদেরকে পিপাসার যাতনা ভোগ করতে দিন, যেমনইভাবে আমিরুল মুমিনিন উসমান রা.-কে পিপাসার যাতনা দেওয়া হয়েছিল।

এই ছিল আরেক মত। তবে যারা উসমান রা.-কে অবরোধ করেছিল এবং পানি বন্ধ করে দিয়েছিল তারা ছিল ফিতনাবাজগোষ্ঠী। মুআবিয়া রা.-এর বাহিনীর বক্তব্য ছিল, 'আলি রা.-এর বাহিনী উসমান রা.-এর খুনিদের আশ্রয় দিয়েছে। তাই উসমান রা.-কে পিপাসার যে যন্ত্রণা তারা দিয়েছে, সেই যন্ত্রণা তারাও ভোগ করুক।'

তখন আবদুল্লাহ ইবনে সাদ ইবনে আবু সারহ রা. বলেন, রাত পর্যন্ত তাদের পানি বন্ধ রাখুন। হয়তো তারা নিজ নিজ দেশে ফিরে যাবে।

উভয় পক্ষের পরামর্শ এবং আলোচনার পর লড়াই ব্যতিরেকেই উভয় পক্ষ সমানভাবে পানি পান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[২৫৪]

---

২৫৪. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/২৮৫

সুবহানাল্লাহ! অতঃপর তাদের প্রতিদিনের লড়াইয়ের দৃশ্য ছিল এমন, যখন লড়াই চলত তারা লড়াই করতেন। অতঃপর লড়াই থেমে গেলে সবাই একই সঙ্গে পানি পান করতেন। কেউ কাউকে আঘাত করতেন না। এরপর উভয় পক্ষই রণাঙ্গন থেকে তাদের শহিদদের জানাজা পড়তেন এবং দাফন সম্পন্ন করতেন। এই ছিল প্রতিদিনের দৃশ্য।

তৃতীয় দিন আলি রা. পুনরায় মুআবিয়া রা.-এর কাছে আরেকটি দল পাঠান। এ দলে ছিলেন বশির ইবনে আমর আনসারি রা., সাইদ ইবনে কায়স রহ. ও সুবাইস ইবনে রিবয়ি।[২৫৫] তাদের তিনি বলেন, তোমরা এই ব্যক্তির (মুআবিয়া রা.-এর) কাছে যাও এবং তাকে আনুগত্য ও মুসলিম ঐক্যের দিকে আহ্বান করো। আর তিনি যা বলেন তা মনোযোগ দিয়ে শোনো।

মুআবিয়া রা.-এর কাছে গিয়ে প্রথমে বশির ইবনে আমর আনসারি রা. আলোচনা শুরু করেন। তিনি বলেন, মুআবিয়া, নিশ্চয় দুনিয়া আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যাবে। আর আপনি হবেন আখেরাতের নিশ্চিত যাত্রী। তখন আল্লাহ তাআলা আপনার আমলের হিসাব গ্রহণ করবেন এবং আপনার কৃতকর্মের প্রতিদান দান করবেন। আমি আপনাকে শপথ করে বলছি, আপনি এই মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবেন না এবং নিজেদের মধ্যে রক্তপাত করবেন না।

তখন মুআবিয়া রা. বললেন, আপনার নেতাকে (আলি রা.-কে) এই উপদেশ কেন দিলেন না?

বশির ইবনে আমর রা. বললেন, নিশ্চয় তিনি তার মর্যাদা, ধার্মিকতা, দ্বীনের ক্ষেত্রে অগ্রগামিতা এবং রাসুল ﷺ-এর নৈকট্যের কারণে খলিফা হওয়ার অধিক উপযুক্ত। তিনি আপনাকে বাইআত গ্রহণের প্রতি আহ্বান করছেন। এটিই আপনার পার্থিব জীবনের জন্য অধিক নিরাপদ ও আখেরাতের জন্য অধিক কল্যাণকর।

মুআবিয়া রা. বলেন, উসমান রা.-এর রক্তের প্রতি এভাবেই অবহেলা করা হবে? আল্লাহর শপথ! আমি তা কিছুতেই হতে দেবো না।[২৫৬]

---

২৫৫. **সুবাইস ইবনে রিবয়ি :** তার নাম সাবাস ইবনে রিবয়ি, সুবাইস ইবনে রিবয়ি নয়। ইজলি রহ. বলেন, সে উসমান রা.-এর হত্যায় সহযোগিতা করে। সূত্র : *আমিরুল মুমিনিন আলি ইবনে আবু তালিব রা.*, ড. আলি সাল্লাবি, (উইকিপিডিয়া)-সম্পাদক

২৫৬. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/২৮৫

উভয় পক্ষের দাবি ছিল স্পষ্ট। কেউই নিজেদের চিন্তায় কোনো ভুল দেখতে পাচ্ছিলেন না। তাই শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকেই নিজেদের মতের পক্ষে লড়াই চালিয়ে যান।

সমঝোতার চেষ্টা ব্যর্থ হলে পুনরায় উভয় পক্ষে লড়াই শুরু হয়। প্রতিদিনই উভয় পক্ষ থেকে একদল একদল করে অপর পক্ষের সঙ্গে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতো। দ্বিতীয়দিন সেই দুটি দল লড়াই থেকে বিরত থাকত। পরদিন তারা আবার নতুন করে লড়াইয়ের মাঠে নেমে যেত। ৩৬ হিজরির পুরো জিলহজ মাসজুড়ে এভাবেই লড়াই চলছিল। সে বছর আলি রা. হজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-কে। তিনি তার দায়িত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করে হজ শেষে আলি রা.-এর বাহিনীতে এসে যোগদান করেন।

মহররম মাসে এসে উভয় পক্ষই সন্ধির চেষ্টা করে। কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। আলি রা. এবার মুআবিয়া রা.-এর কাছে প্রেরণ করেন সাহাবি আদি ইবনে হাতেম তায়ি রা.-কে। তার সঙ্গে পাঠান ইয়াজিদ ইবনে কায়স[২৫৭] ও সুবাইস ইবনে রিবয়িকে। আদি ইবনে হাতেম রা. আল্লাহ তাআলার প্রশংসাস্তুতি পাঠ করে বলেন, মুআবিয়া, আমরা আপনাকে এমন একটি বিষয়ের দিকে আহ্বান করতে এসেছি, যার মাধ্যমে আমাদের ঐক্য সৃষ্টি হবে। আমাদের সাম্রাজ্য শক্তিশালী হবে ও রক্তপাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করা যাবে। নিরাপত্তার পথ সুগম হবে ও মুসলিমদের পারস্পরিক সম্পর্ক মধুর হবে। নিশ্চয় আপনার চাচাতো ভাই আলি রা. হলেন মুসলিম উম্মাহর নেতা, যিনি ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী। ইসলামে রয়েছে তার উত্তম অবদান ও সকলেই তার পাশে সমবেত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নিজেদের চিন্তার মাধ্যমে সঠিক পথ দেখিয়েছেন। এখন আপনি ও আপনার অনুগতরাই শুধু বাইআত গ্রহণ করেননি।

এরপর তিনি মুআবিয়া রা.-কে উদ্দেশ করে কিছু কঠিন এবং শক্ত বাক্য উচ্চারণ করেন। বলেন, মুআবিয়া, আপনি বিরত থাকুন, আপনার যেন জঙ্গে জামালের মতো পরিণতি না হয়।

তখন মুআবিয়া রা. বলেন, মনে হচ্ছে আপনি হুমকি প্রদানের জন্য এসেছেন। মীমাংসার উদ্দেশ্যে আসেননি। হায়! আল্লাহর শপথ! আদি, নিশ্চয় আমি হচ্ছি হারবের সন্তান। যুদ্ধে আমি ভীত-সন্ত্রস্ত নই।

---

২৫৭. **ইয়াজিদ ইবনে কায়স :** সে ছিল উসমান রা.-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের একজন। *আল-ফিতনা ওয়া ওয়াকআতুল জামাল*, সাইফ ইবনে উমর তামিমি-(শামেলা) পৃ. ৪৫; -সম্পাদক

তখন সুবাইস ইবনে রিবয়ি বলেন, মুআবিয়া, আল্লাহকে ভয় করুন। আলি রা.-এর বিরোধিতা করবেন না। আল্লাহর শপথ! আমরা আলি রা.-এর চেয়ে অধিক খোদাভীরু, পুণ্যবান, দুনিয়াবিমুখ ও উত্তম চরিত্রবান আর কাউকে দেখিনি।

তখন মুআবিয়া রা. আল্লাহ তাআলার প্রশংসাস্তুতি পাঠ করে বলেন, আপনারা আমাকে মুসলিমদের দলের সঙ্গে থাকার ও আনুগত্যের দিকে আহ্বান করেছেন। মুসলিমদের দল তো আমাদের সঙ্গেও রয়েছে। এবার আসি আনুগত্যের কথায়। উসমান রা.-এর হত্যাকাণ্ডে যে ব্যক্তি সাহায্য করেছে, কীভাবে আমরা তার আনুগত্য করতে পারি? তিনি (আলি রা.) দাবি করেছেন যে, তিনি উসমান রা.-কে হত্যা করেননি। আমরা তার এ কথাকে মিথ্যা বলি না এবং তার ওপর কোনো অপবাদও আরোপ করি না। কিন্তু তিনি উসমান রা.-এর খুনিদের আশ্রয় দিয়েছেন। অতঃপর তাদেরকে আমাদের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য পাঠিয়েছেন। এরপরও আমরা আপনাদের আনুগত্য এবং ঐক্যের আহ্বানে সাড়া দেবো, তা কীভাবে চিন্তা করলেন?

সুবাইস ইবনে রিবয়ি বলেন, হে মুআবিয়া, যদি আপনার জন্য সম্ভব হয় তাহলে কি আপনি উসমান রা.-এর বিনিময়ে আম্মার ইবনে ইয়াসির রা.-কে হত্যা করতে পারবেন?

তিনি বললেন, আমার পক্ষে যদি তা সম্ভব হয় তবে আমি উসমান রা.-কেন, উসমান রা.-এর গোলামের বিনিময়েও তাকে হত্যা করব।[২৫৮]

মুআবিয়া রা. এ কথা সাম্প্রদায়িকতা অথবা উসমান রা.-এর প্রতি ভালোবাসার কারণে গোঁড়ামি করে বলেননি। বরং তিনি মনে করতেন যে, আল্লাহ তাআলার বিধান বাস্তবায়নে কোনো বিলম্ব করা যাবে না। নিহত ব্যক্তি যেই হোক না-কেন, যত ছোটই হোক না-কেন। এমনইভাবে হত্যাকারী অথবা সহযোগী যত বড় ব্যক্তিই হোক না-কেন, এ ক্ষেত্রে কোনো বিলম্বের অবকাশ নেই।

এরপর মুআবিয়া রা. আলি রা.-এর কাছে একটি প্রতিনিধিদল পাঠান। এই প্রতিনিধিদলের মধ্যে ছিলেন শুরাহবিল ইবনে আমর রহ. এবং হাবিব ইবনে মাসলামা রা. প্রমুখ।

পুরো জিলহজ ও মহররম মাসে সন্ধি সম্পন্ন হয়নি। মহররম মাসের শেষ দিন আলি রা. তার ঘোষক ইয়াজিদ ইবনে হারিসকে তলব করেন এবং তাকে

---

২৫৮. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭/২৮৭; তারিখ ইবনে খালদুন, ২/৬১৮

শামবাসীদের কাছে গিয়ে এই মর্মে ঘোষণা দিতে নির্দেশ প্রদান করেন যে, আমিরুল মুমিনিন আপনাদের বলছেন, আমি আপনাদের সুযোগ দিয়েছি, যেন আপনারা সত্যের দিকে ফিরে আসেন এবং আপনাদের সামনে প্রমাণও পেশ করেছি। কিন্তু আপনারা এতে সাড়া দেননি। আমি আপনাদের সকলের প্রতিই এই আহ্বান রেখেছিলাম। জেনে রাখুন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা খেয়ানতকারীদের ভালোবাসেন না।[২৫৯]

এ কথার মাধ্যমে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আলি রা. আরেকবার লড়াই শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে এবারের লড়াই হবে পূর্বের চেয়ে তীব্র ও ভয়াবহ। আলি রা. তার বাহিনীর সামনে দাঁড়িয়ে জ্বালাময়ী বক্তব্য প্রদান করে লোকদের জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর প্রতি উৎসাহিত করেন। এরপর তাদের বলেন, কোনো আহত ব্যক্তির ওপর আক্রমণ করবে না। পলায়নপর কারও পিছু নেবে না। কোনো মহিলার যেন পর্দা নষ্ট না হয়। তাদের যেন লাঞ্ছিত করা না হয়—যদিও সে নেতৃস্থানীয় ও নেককার ব্যক্তিদের গালি দিয়ে থাকে।

মুআবিয়া রা. ও তার বাহিনীর সামনে দাঁড়িয়ে অগ্নিঝরা বক্তব্য দিয়ে তাদেরকে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর প্রতি উৎসাহিত করেন। তিনি বলেন,

﴿ٱسْتَعِينُوا۟ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓا۟ ۖ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۖ وَٱلْعَٰقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾

> তোমরা আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য চাও এবং ধৈর্যধারণ করো। নিশ্চয় জমিন আল্লাহর, তিনি বান্দাদের মধ্যে যাকে চান এর উত্তরাধিকারী করেন। আর শুভ পরিণাম তাদের জন্যই যারা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে। [সুরা আরাফ : ১২৮]

সফর মাসের প্রথম দিন উভয় পক্ষ পুনরায় মুখোমুখি হয় এবং দুপক্ষ থেকেই একটি করে দল লড়াইয়ের মাঠে পাঠানো হয়।

প্রথম দিনেই আলি রা. তার বাহিনী থেকে বেশ বড় একটি দল পাঠান। যার নেতৃত্বে ছিল আশতার নাখায়ি। তারা গিয়ে অপর পক্ষের অনুরূপ একটি দলের সঙ্গে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়।[২৬০]

---

২৫৯. *তারিখুত তবারি*, ৫/১০; *আল-কামিল ফিত তারিখ*, ২/৬৪৫; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/২৮৯

২৬০. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/২৮৬

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, এই আশতার নাখায়ি ছিল ফিতনাবাজদের অন্যতম মূলহোতা। কিন্তু সে ছিল খুবই সাহসী, প্রভাবশালী ও নিজ গোত্রের কাছে খুবই মান্যগণ্য একজন ব্যক্তি। তার সঙ্গে যারা বেরিয়েছিল তাদের সকলের ওপরেই ছিল তার প্রভাব। তাই আশতার নাখায়ির সাহসিকতা, সমরদক্ষতা ও গোত্রীয় প্রভাবের কারণে আলি রা. ফিতনা দ্রুত নির্মূল করার লক্ষ্যে তার সহযোগিতা নেন। ফিতনার ঘটনার পূর্বে আশতার নাখায়ি ছিল খুবই পরহেজগার একজন ব্যক্তি। কিন্তু নেতৃত্বের লোভ তাকে এই পর্যায়ে টেনে এনেছে।

যুদ্ধক্ষেত্রে উসমান রা.-এর হত্যাকারীদের কাছে সাহায্য চাওয়ার ব্যাপারে ইসলামের বক্তব্য

আলি রা. চিন্তা করেছিলেন, সকল মুসলিমের কল্যাণের জন্যই আমিরুল মুমিনিন এবং মুসলিম উম্মাহর বিরোধিতাকারী এই দলের সঙ্গে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়া প্রয়োজন। তাই তিনি ফিতনাবাজদের সংখ্যাধিক্য এবং শক্তিমত্তার দিকে লক্ষ্য করে তাদের থেকে সহযোগিতা নেওয়াকে মুসলিম উম্মাহর জন্য কল্যাণকর মনে করেন।

রাসুল ﷺ-এর যুদ্ধগুলোর দিকে যদি তাকাই তবে দেখব যে, তিনি সকল মুনাফেকদের নাম ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে জানতেন। আর মুনাফেকরা ছিল কাফেরদের চেয়েও অধিক বিপজ্জনক।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا﴾

> নিশ্চয় মুনাফেকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে উপনীত হবে এবং আপনি তাদের কোনো সাহায্যকারী পাবেন না। [সুরা নিসা : ১৪৫]

তা সত্ত্বেও তারা রাসুল ﷺ-এর সঙ্গে যুদ্ধে অংশ নিয়েছে এবং এতে কেউই আপত্তি করেননি।

উহুদের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর এক-তৃতীয়াংশই ছিল মুনাফেক। যাদের নেতৃত্বে ছিল মুনাফেক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল। রাসুল ﷺ তাদের নিষেধ করেননি। কারণ, তাদের নিষেধ করলে মদিনায় যে ফিতনা সৃষ্টি হতো তা হতো উহুদপ্রান্তরে কুরাইশ কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করার চেয়েও বিপজ্জনক।

ফকিহগণ এ ব্যাপারে একমত যে, যুদ্ধের ময়দানে ফাসেক মুসলিমদের থেকে সহযোগিতা নেওয়া যাবে। কিন্তু কাফেরদের কাছে সাহায্য চাওয়া যাবে কি না এ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম মালেক রহ. ও ইমাম আহমাদ রহ.-এর মতে যুদ্ধে কাফেরদের কাছে সাহায্য চাওয়া বৈধ হবে না। ইমাম আবু হানিফা রহ. তা নিঃশর্তভাবে বৈধ মনে করেন। ইমাম শাফেয়ি রহ. বৈধতার জন্য কিছু শর্তারোপ করেছেন।[২৬১] উসমান রা.-এর হত্যায় যারা জড়িত ছিল নিশ্চিতভাবে তাদের কেউ কাফের বলেননি। এদিকে আবদুল্লাহ ইবনে সাবা বাহ্যিকভাবে ইসলাম প্রকাশ করে ভেতরে কুফরি বিশ্বাস লালন করত। এটিই হচ্ছে নেফাক।

যারা উসমান রা.-কে অবরোধ করেছিল তাদেরকে দুই দলে ভাগ করা হয়। একদল মনে করত যে, তারা সৎ কাজের আদেশ দিচ্ছে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করছে। এজন্যই তারা উসমান রা.-কে অপসারণ করতে গিয়েছিল। এমনইভাবে মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর রা. উসমান রা.-কে বলেছিলেন, আমরা ওই ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হতে চাই না, যারা বলে,

﴿رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَعۡنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا۠﴾

> হে প্রভু, আমরা আমাদের নেতা এবং বয়োজ্যেষ্ঠদের অনুসরণ করেছি।তারাই আমাদের পথভ্রষ্ট করেছে। [সুরা আহযাব : ৬৭]

তাই মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর রা. প্রথম দিকে সম্পূর্ণরূপে এ কথা বিশ্বাস করতেন যে, উসমান রা.-কে অপসারণ অথবা হত্যা করার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নৈকট্যলাভ হবে। এ দলের অনেকেই ফিতনার মূলহোতাদের কথায় প্রবঞ্চনার শিকার হয়েছিল।

দ্বিতীয় দলের লোকেরা বাহ্যিকভাবে ইসলাম প্রকাশ করলেও তাদের ভেতরে ছিল কুফরি, ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ ও ষড়যন্ত্র। মূলত তারা ছিল মুনাফেক।

***

---

২৬১. *আল-মাউসুয়াতুল ফিকহিয়্যা আল-কুয়েতিয়্যা*, ৪/১৮, ৮/১৫০

রণাঙ্গনের চিত্র

আমরা আবার ফিরে আসি সিফফিনের রণাঙ্গনে। সফর মাসের প্রথম দিন আলি রা. আশতার নাখায়িকে একটি বড় দলের সেনাপতি বানিয়ে পাঠিয়ে দিলেন রণাঙ্গনে। মুআবিয়া রা.-ও হাবিব ইবনে মাসলামা রা.-এর নেতৃত্বে তার বাহিনীর বড় একটি দল পাঠিয়ে দিলেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দুই পক্ষের মধ্যে তীব্র লড়াই হলো। উভয় পক্ষ থেকেই অনেকে শহিদ হলেন। কিন্তু বিজয়ী হয়নি কেউই। উভয় পক্ষের মধ্যে লড়াই হয় সমান সমান।

পরদিন বৃহস্পতিবার। সফর মাসের দ্বিতীয় দিন। আলি রা. সেনাপতি নিযুক্ত করলেন হাশেম ইবনে উতবা ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা.-কে। রোম এবং পারস্য বিজয়ী মুজাহিদগণের তালিকায় যার নাম জ্বলজ্বল করছে। আর মুআবিয়া রা. সেনাপতি নিযুক্ত করলেন আবুল আওয়ার সুলামি রা.-কে। এ দিনও উভয় পক্ষে তীব্র লড়াই হয়। শহিদের তালিকায় যোগ হয় আরও কিছু নাম। তবে ফলাফল দাঁড়ায় পূর্বের মতোই, সমান সমান।[২৬২]

তৃতীয় দিন। ইরাকের বাহিনী থেকে বের হন আম্মার ইবনে ইয়াসির রা.। তিনি ছিলেন ৯০-উর্ধ্ব বৃদ্ধ। অপর পক্ষ থেকে আসেন আরেক বিশিষ্ট সাহাবি আমর ইবনুল আস রা.। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত লড়াই হয় তাদের মধ্যে। কিন্তু এ দিনও ফলাফল সমান সমান। বিজয়ী হয়নি কোনো পক্ষই।[২৬৩]

চতুর্থ দিন আলি রা.-এর পক্ষ থেকে বের হন তার পুত্র মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়্যা রহ.। অপর পক্ষে ছিলেন উবাইদুল্লাহ ইবনে উমর রা.। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে তুমুল লড়াই। শহিদের কাতারে চলে যান উভয় পক্ষের আরও কিছু মুসলিম। এ দিনও কোনো পক্ষ বিজয়ী হয়নি।[২৬৪]

পঞ্চম দিন আলি রা.-এর পক্ষ থেকে বের হন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.। অপর পক্ষ থেকে বের হন উসমান রা.-এর খেলাফতকালে আজারবাইজান এবং পারস্যের বিরাট অংশ বিজেতা ওয়ালিদ ইবনে উকবা রা.। ২৫ বছর

---

২৬২. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/২৯০

২৬৩. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/২৯০

২৬৪. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/২৯০

বয়সেই উসমান রা. তাকে গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর ময়দানে তার ছিল বিরাট অবদান। সারা দিন লড়াইয়ের পর কোনো পক্ষ বিজয়ী হওয়া ব্যতিরেকেই সবাই সন্ধ্যায় নিজ নিজ ঘাঁটিতে ফিরে আসেন।[২৬৫]

ষষ্ঠ দিন আলি রা.-এর বাহিনী থেকে বের হন কায়স ইবনে সাদ রা.। মুআবিয়া রা.-এর পক্ষ থেকে বের হন ইবনে যুল-কালা হিময়ারি রহ.। তিনি ও তার পিতা উভয়েই ছিলেন মুআবিয়া রা.-এর বাহিনীর যোদ্ধা। তার পিতা এ যুদ্ধেই শাহাদাতবরণ করেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তুমুল লড়াই চলে। বাড়তে থাকে শহিদ এবং হতাহতের সংখ্যা। কিন্তু কোনো পক্ষই বিজয়ের দেখা পায় না।[২৬৬]

সপ্তম দিন আলি রা.-এর বাহিনী থেকে দ্বিতীয়বার বের হয় আশতার নাখায়ি। তার মোকাবিলায় পুনরায় আসেন হাবিব ইবনে মাসলামা রা.।[২৬৭]

এ দিন সন্ধ্যায় এসে স্পষ্ট হয় যে, যদি এভাবেই চলতে থাকে, বিজয় হওয়া ব্যতীত একদল অপর দলের সঙ্গে যদি এভাবে লড়াই করতেই থাকে, তাহলে মুসলিমদের পতন অনিবার্য। তখন এই ফিতনাকে নির্মূল করার উদ্দেশ্য কিছুতেই পূর্ণ হবে না। এমন ছোট ছোট দল পাঠানোর মাধ্যমে আলি রা.-এর উদ্দেশ্য ছিল, যেন প্রধান দুই বাহিনী মুখোমুখি হওয়ার বিপদ থেকে বাঁচা যায় এবং রক্তপাত কম হয়। তিনি বাহিনী থেকে একটি করে দল পাঠাতেন যেন তারা অপর পক্ষকে পরাজিত করে এবং পরাজিত পক্ষ আমিরুল মুমিনিনের বিরোধিতা থেকে ফিরে আসে। এমনইভাবে মুআবিয়া রা. তার পুরো বাহিনী না পাঠিয়ে একটি দল পাঠাতেন, যেন মুসলিমদের রক্তপাত থেকে বেঁচে থাকা যায়।

অতঃপর আলি রা. সিদ্ধান্ত নেন, এবার তিনি তার পুরো বাহিনী নিয়ে শামের বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করবেন। এমনইভাবে মুআবিয়া রা.-ও অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সে রাতে উভয় বাহিনীই কুরআন তেলাওয়াত এবং নামাজ আদায়ে মগ্ন হয়। আল্লাহ তাআলার কাছে অপর পক্ষের বিরুদ্ধে জয়লাভের

---

২৬৫. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/২৯১

২৬৬. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/২৯১

২৬৭. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/২৯১

প্রার্থনা করতে থাকে। উভয় বাহিনীর ঘাঁটিতেই ভাসতে থাকে কুরআন তেলাওয়াতের গুনগুন আওয়াজ।

মুআবিয়া রা.-এর বাহিনী গ্রহণ করে মৃত্যুর শপথ। কারণ, নিজেদের ইজতেহাদ অনুযায়ী সত্যের পক্ষে থাকার ব্যাপারে তাদের মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। তারা আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাতবরণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। যদিও তারা জানেন যে, যাদের সঙ্গে তারা লড়াই করছেন তাদের মধ্যে আছেন আলি রা., সালমান ফারসি রা. ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর মতো অনেক বড় বড় সাহাবি। তবে তাদের সঙ্গেও ছিলেন মুআবিয়া রা., আমর ইবনুল আস রা. ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা.-এর মতো বিশিষ্ট সাহাবিগণ। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. ছিলেন প্রজ্ঞাবান এবং ফকিহ সাহাবিগণের একজন। তিনি আলি রা. অথবা মুআবিয়া রা. কারও পক্ষেই যুদ্ধ করতে আগ্রহী ছিলেন না। তবে তার এ যুদ্ধে আসার কারণ হচ্ছে, রাসুল ﷺ তাকে তার পিতার অবাধ্য হতে নিষেধ করেছেন। তার পিতা আমর ইবনুল আস রা. তাকে যুদ্ধে শরিক হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই তিনি যুদ্ধে এসেছেন। কিন্তু তিনি প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে নামেননি এবং কোনো মুসলিমের বিরুদ্ধে তরবারি উত্তোলন করেননি।

অষ্টম দিন আলি রা. নিজেই বের হন তার সম্পূর্ণ বাহিনী নিয়ে। এমনইভাবে মুআবিয়া রা.-ও বের হন তার সম্পূর্ণ বাহিনী নিয়ে। উভয় পক্ষের মুসলিমরা অবতীর্ণ হয় ইতিহাসের বিধ্বংসী এক লড়াইয়ে। এরাই সেই বীরের দল, যারা নাস্তানাবুদ করেছে রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যকে। নিয়তির নির্মম পরিহাসে আজ তারা নিজেদের মধ্যেই লড়াইয়ে মত্ত। উভয় পক্ষই অটল হয়ে যুদ্ধ করে। কেউ পিছপা হয়নি। সকাল থেকে এশা পর্যন্ত চলে এদিনের লড়াই। অনেক শহিদ এবং আহতের রক্তনদী প্রবাহিত হওয়ার পর উভয় পক্ষ যুদ্ধ থামিয়ে দেয়।

নবম দিন ফজরের নামাজ শেষে আলি রা. নবোদ্যমে রণাঙ্গনের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েন। এ দিন আলি রা.-এর বাহিনীর মাইমানা তথা ডান ভাগের নেতৃত্বে ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে বুদাইল রা.। মাইসারা তথা বাম ভাগের নেতৃত্বে ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.। আবদুল্লাহ ইবনে বুদাইল রা. মুআবিয়া রা.-এর বাহিনীর বাম ভাগের ওপর আক্রমণ করেন। যার নেতৃত্বে ছিলেন হাবিব ইবনে মাসলামা রা.। আবদুল্লাহ ইবনে বুদাইল রা. তাদেরকে

মুআবিয়া রা.-এর বাহিনীর মূল অংশে যেতে বাধ্য করেন। তখন আলি রা.-এর বাহিনী কিছু ক্ষেত্রে বিজয় অর্জন শুরু করে। মুআবিয়া রা. তা লক্ষ করে এই ফাটল বন্ধে উদ্যোগী হন। তার বাহিনী সফলভাবে তা বন্ধ করতে সক্ষম হয়। আবদুল্লাহ ইবনে বুদাইল রা.-কে বাহিনীর বাম ভাগ থেকে প্রতিহত করে দেন।

এ দিন নিহত হন বিপুলসংখ্যক লোক। আলি রা.-এর বাহিনী বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে শামের সৈন্যরা আলি রা. পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তিনি নিজে সেদিন বীরত্বের সঙ্গে তুমুল লড়াই করেন। কোনো কোনো বর্ণনা মতে, এ দিন আলি রা. একাই অপর পক্ষের ৫০০ যোদ্ধাকে হত্যা করেছিলেন।[২৬৮] এ সংখ্যা হয়তো অতিরঞ্জন হতে পারে। বিশেষ করে ফিতনার ঘটনাসমূহ নিয়ে অনেক মিথ্যা এবং বানোয়াট বর্ণনা রয়েছে। যেগুলোয় বর্ণনাকারীরা নিজেদের মন্দ ধারণা এবং অসৎ উদ্দেশ্যের কারণে সাহাবিগণের ওপর অপবাদ আরোপ করতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। তারা মুআবিয়া রা. ও আমর ইবনুল আস রা.-এর ওপর অপবাদ আরোপ করে বলে, তাদের মধ্যে নেতৃত্ব ও রাজত্বের লোভ ছিল। নিজেদের কূটচালের মাধ্যমে তারা লোকদের ধোঁকা দিয়েছেন এবং আলি রা. ও আম্মার ইবনে ইয়াসির রা.-এর বাহিনীর ওপর হামলা করেছেন।

আলি রা. ও তার বাহিনীর তাকওয়া প্রমাণ করার জন্য আরও অনেক ভ্রান্ত বর্ণনার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে, যেন এগুলোর মাধ্যমে মুআবিয়া রা. ও তার বাহিনীকে দোষী সাব্যস্ত করা যায়। এগুলোর সবই শিয়াদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বর্ণনা। যার কোনো ভিত্তি নেই। এসব বর্ণনার মূল সূত্র হচ্ছে আবু মিখনাফ লুত ইবনে ইয়াহইয়া নামক কুখ্যাত জাল হাদিস রচয়িতা। ইবনে হাজার আসকালানি রহ. তার সম্পর্কে বলেন, সে একজন মনগড়া হাদিস বর্ণনাকারী। তার ওপর নির্ভর করা যাবে না।

ইমাম দারাকুতনি রহ. তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

ইয়াহইয়া ইবনে মাইন রহ. বলেন, সে নির্ভরযোগ্য নয়। তিনি আরেকবার তার সম্পর্কে বলেন, কিছুই নয় অর্থাৎ বর্ণনাকারী হিসাবে তার কোনো নির্ভরযোগ্যতা নেই।

---

২৬৮. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/২৯২

ইবনে আদি রহ. তার সম্পর্কে বলেন, সে ছিল চরমপন্থী শিয়া।

মুআবিয়া রা.-এর বাহিনীর এই আক্রমণের পর আলি রা.-এর বাহিনীতে ভাঙন শুরু হয়ে যায়। তখন আলি রা. আশতার নাখায়িকে নির্দেশ দেন বাহিনীর ডান ভাগের হাল ধরতে। সে তার বীরত্ব ও প্রভাবের মাধ্যমে ভালোভাবেই এই দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়। এখানে তার বীরত্ব ও শক্তিমত্তা প্রকাশ পায়। পিছিয়ে যাওয়ার পর সে পুনরায় আলি রা.-এর বাহিনীর ডান ভাগের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়।[২৬৯]

এ সময় আবদুল্লাহ ইবনে বুদাইল রা. শাহাদাতবরণ করেন। যদি আলি রা. তার বাহিনীর ডান ভাগের ভার আশতার নাখায়ির হাতে না দিতেন, তবে পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যেতেন।

আম্মার ইবনে ইয়াসির রা.-এর শাহাদাতবরণ

এ দিন এশার নিকটবর্তী সময়ে এসে শাহাদাতবরণ করেন বিশিষ্ট সাহাবি আম্মার ইবনে ইয়াসির রা.। তিনি ছিলেন আলি রা.-এর বাহিনীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। তার সঙ্গে একই সময়ে শহিদ হন হাশেম ইবনে উতবা ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা.।

আবু আবদুর রহমান সুলামি রহ. বলেন, সেদিন আম্মার রা.-কে দেখেছি যখনই তিনি সিফফিন প্রান্তরের কোনো উপত্যকা অতিক্রম করছেন, তার সঙ্গে থাকা সাহাবিগণ তাকে অনুসরণ করছেন। দেখেছি তিনি আলি রা.-এর বাহিনীর পতাকাধারী হাশেম ইবনে উতবা রা.-এর কাছে গমন করেন এবং তাকে বলেন, হে হাশেম, এগিয়ে এসো। তরবারির ছায়াতলেই আছে জান্নাত। আর মৃত্যু আমাদের দাঁতের প্রান্তে এসে উপনীত হয়েছে। জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে গিয়েছে। ডাগর ডাগর চোখের হুরেরা সজ্জিত হয়েছে। আজ আমি সাক্ষাৎ করব প্রিয় মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর দলের সঙ্গে।

এরপর তিনি এবং হাশেম রা. উভয়েই তরবারি উত্তোলন করে একযোগে হামলা করেন। অতঃপর উভয়েই পান করেন শাহাদাতের সুধা।[২৭০]

তাদের মৃত্যুতে উভয় পক্ষেই বিরাট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং উভয় পক্ষই প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। তবে আলি রা.-এর বাহিনীর উৎসাহ এবং উদ্দীপনা

---

২৬৯. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/২৯

২৭০. *তারিখুত তবারি*, ৫/৪১; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/২৯৯

আগের চেয়ে বেড়ে যায়। কারণ, এখন তারা পূর্ণ নিশ্চিত হয়ে গিয়েছেন যে, তারাই সত্যের ওপর আছেন। কারণ, রাসুল ﷺ বলেছিলেন, 'আম্মারের জন্য দুঃখ হয়, তাকে হত্যা করবে বিদ্রোহী দল।'

ফলে তারা নিশ্চিত হয়ে যান যে, তারাই সুস্পষ্ট সত্যের ওপর আছেন এবং তারাই বিজয়ী দল।

এদিকে অপর পক্ষের সৈন্যরা ভীত হয়ে পড়ে। কারণ, তারা বিদ্রোহী প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে। তখন মুআবিয়া রা.-এর বাহিনীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ আমর ইবনুল আস রা., আবুল আওয়ার সুলামি রা., আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. ও মুআবিয়া রা. বিষয়টি নিয়ে পরামর্শে বসেন।

আম্মার ইবনে ইয়াসির রা. ও বিদ্রোহী দল

আম্মার ইবনে ইয়াসির রা. নিহত হওয়ার পর উভয় পক্ষেই বিরাট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং ব্যথার ঝড় ওঠে। আলি রা.-এর বাহিনী আম্মার রা.-কে অত্যন্ত সম্মান এবং শ্রদ্ধা করত। তিনি ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ একজন সাহাবি। তার বয়স ছিল তখন ৯০-এরও বেশি। ইসলামের প্রথমদিকেই তিনি ঈমানের পরশ লাভ করেছিলেন। তিনি ইসলামের সূচনালগ্নের সঙ্গী ছিলেন। তিনি ও তার পরিবার আল্লাহ তাআলার পথে অনেক কষ্টের শিকার হয়েছেন। ইসলামে রয়েছে তার বিশেষ অবস্থান ও মর্যাদা। আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেছেন, তিনজন ব্যক্তির জন্য জান্নাত উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। (তারা হলো) আলি, আম্মার এবং সালমান। হাকেম রহ. বলেন, এই হাদিসটির সনদ (সূত্র) সহিহ। তবে ইমাম বুখারি রহ. ও মুসলিম রহ. হাদিসটি উল্লেখ করেননি।[২৭১]

তাই আলি রা.-এর বাহিনীর জন্য আম্মার ইবনে ইয়াসির রা.-এর শাহাদাত ছিল খুবই পীড়াদায়ক। কিন্তু মুআবিয়া রা.-এর বাহিনীর জন্য তা ছিল আরও কঠিন ব্যাপার। কারণ, রাসুল ﷺ বলেছেন যে, আম্মার রা.-কে বিদ্রোহী দল হত্যা করবে। আম্মার রা. তাদের হাতেই নিহত হলেন। এতে প্রমাণিত হয়, তারাই সেই বিদ্রোহী দল এবং তারা সত্যের ওপর নেই।

আলি রা.-এর বাহিনীর সদস্য আবু আবদুর রহমান সুলামি রহ. আম্মার রা.-এর হত্যার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। তিনি সে রাতে মুআবিয়া রা.-এর বাহিনীর

---

২৭১. *আল-মুসতাদরাক লিল হাকিম*, ৪৬৬৬

ঘাঁটিতে প্রবেশ করেন এবং শামের বাহিনীর চার নেতার কথোপকথন শুনতে পান। তারা হলেন, মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রা., আমর ইবনুল আস রা., তার পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. ও আবুল আওয়ার সুলামি রা.।

তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাজ্ঞ সাহাবি, সাহাবিগণের মধ্যে যিনি ছিলেন অত্যন্ত মর্যাদাবান এবং আবদুল্লাহ নামবিশিষ্ট চার ফকিহ সাহাবির একজন আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. বলেন, বাবা, আপনারা আজ এই ব্যক্তিকে হত্যা করলেন, অথচ রাসুল ﷺ তার ব্যাপারে কী ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন তা কি জানেন?

তখন আমর ইবনুল আস রা. জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কী বলেছেন?

তিনি বললেন, যখন আমরা মসজিদ নির্মাণ করছিলাম তখন আম্মার রা. আমাদের সঙ্গেই ছিলেন। সবাই একটি করে ইট ও পাথর নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু আম্মার রা. নিচ্ছিলেন দুটি করে। তখন রাসুল ﷺ এসে তার চেহারা থেকে ধুলো মুছে দেন এবং বলেন, সুমাইয়ার পুত্র, তোমার জন্য দুঃখ হয়, তোমাকে হত্যা করবে বিদ্রোহী দল।

আমর ইবনুল আস রা. তার পুত্রের কাছ থেকে এ কথা শুনে চলে যান মুআবিয়া রা.-এর কাছে। গিয়ে বলেন, হে মুআবিয়া, আবদুল্লাহ কী বলেছে তা কি আপনি শুনেছেন?

মুআবিয়া রা. বলেন, কী বলেছে?

এরপর আমর ইবনুল আস রা. তাকে হাদিসটি শুনান।

তখন মুআবিয়া রা. বলেন, নিশ্চয় আপনি একজন আনাড়ি বৃদ্ধ। আমরা কি আম্মার রা.-কে হত্যা করেছি? তাকে যারা এখানে নিয়ে এসেছে তারাই হত্যা করেছে।

এতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মুআবিয়া রা. সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত ছিলেন যে, তিনি কোনো বিদ্রোহী নন। তিনি লড়াই করছেন আল্লাহ তাআলার একটি বিধান প্রতিষ্ঠা করার জন্য, যে বিধান বাস্তবায়নে আলি রা. বিলম্ব করছেন। উসমান রা.-এর খুনিদের শাস্তির ব্যবস্থা তিনি করেননি। তিনি ইজতেহাদ করার পরই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু আলি রা. ইজতেহাদ করেছিলেন সাম্রাজ্য স্থিতিশীল হওয়া পর্যন্ত তিনি উসমান রা.-এর হত্যার বিচার বিলম্বিত করবেন।

আর এটিই সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল। তাদের প্রত্যেকেই সওয়াব পাবেন। যার ইজতেহাদ সঠিক, তিনি পাবেন দুটি সওয়াব। আর যার ইজতেহাদ ভুল, তিনি পাবেন একটি সওয়াব।

মুআবিয়া রা.-এর দৃষ্টিতে বিদ্রোহী দল ছিল যারা আম্মার রা.-কে নিয়ে এসেছে তারাই। তাদের কারণেই তিনি শহিদ হয়েছেন। আর বিশেষ কথা হচ্ছে, মুআবিয়া রা. তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বের হননি, বরং তারাই যুদ্ধ করার জন্য এসেছেন।

লোকেরা মুআবিয়া রা.-এর এ কথা শুনে গুঞ্জন শুরু করে দেয়। আবু আবদুর রহমান সুলামি রহ. বলেন, আমি জানি না, তারা বেশি আশ্চর্যান্বিত হয়েছে নাকি তিনি নিজেই।[২৭২]

ফিতনা এবং শিয়াদের ইতিহাসে ব্যুৎপত্তি অর্জনকারী আলেম মুহিব্বুদ্দিন খতিব রহ. *আল-আওয়াসিম মিনাল কাওয়াসিম* গ্রন্থের টীকায় বলেন, 'আম্মার ইবনে ইয়াসির রা.-কে হত্যাকারী বিদ্রোহী দলই মূলত উসমান রা.-এর হত্যাকারী। কারণ, জঙ্গে জামালের পূর্বে, জঙ্গে জামালে, সিফফিনের যুদ্ধে ও এর পরবর্তী সময়ে মুসলিমদের যত রক্ত ঝরেছে এগুলোর দায়ভার তাদের ওপরেই বর্তাবে। ফিতনাবাজদের কারণে মুসলিম উম্মাহর ওপর যে বিপর্যয় ও দুর্যোগ এসেছে এর পাপের বোঝা তাদের কাঁধেই দেওয়া হবে।[২৭৩]

আম্মার ইবনে ইয়াসির রা. যেদিন নিহত হন সেদিনও লড়াই থামেনি; বরং রাতেও লড়াই চলেছে। রাত থেকে নিয়ে পরদিন জোহর পর্যন্ত এ লড়াই চলতে থাকে। মুসলিমরা মাগরিব, এশা ও ফজরের নামাজ ঘোড়া অথবা উটের ওপর বসে কিংবা হেঁটে হেঁটে ইশারার মাধ্যমে আদায় করে। এই রাতকে লাইলাতুল হারির নামে অভিহিত করা হয়। এর আগে কাদিসিয়ার যুদ্ধের শেষ রাতটিকেও এ নাম দেওয়া হয়েছিল, যে যুদ্ধে মুসলিমরা পারসিকদের সঙ্গে লড়াই করেছিল। কিন্তু দুই লড়াইয়ের মধ্যে কত পার্থক্য! একটিতে মুসলিমরা লড়াই করেছিল আল্লাহ তাআলার শত্রুর বিরুদ্ধে ও আল্লাহ তাআলার দ্বীনের জন্য পারস্য জয় করতে। আর এ যুদ্ধে মুসলিমরা পরস্পর শত্রু হয়ে যুদ্ধ করছে।

---

২৭২. *তারিখুত তবারি*, ৫/৪১; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/২৯৯

২৭৩. *আত-তালিক আলাল আওয়াসিম মিনাল কাওয়াসিম*, পৃ. ১৭০

সারারাত ভয়ানক যুদ্ধ চলতে থাকে। বিজয়ের পাল্লা ক্রমেই ঝুঁকতে থাকে আলি রা.-এর বাহিনীর দিকে। আর মুআবিয়া রা.-এর বাহিনীর আকাশে জমতে থাকে পরাজয়ের কালো মেঘ। আলি রা.-এর বাহিনীর জন্য বিজয় ছিল অত্যাসন্ন।

কুরআন উত্তোলনের কৌশল

মুআবিয়া রা.-এর বাহিনী যখন পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে, তখন আমর ইবনুল আস রা. মুআবিয়া রা.-কে এমন একটি পরামর্শ দেন, যার মাধ্যমে শামের বাহিনীকে সুনিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে উদ্ধার করা সম্ভব। তখন পর্যন্তও তারা নিশ্চিতভাবেই বিশ্বাস করতেন যে, তারা সত্যের ওপর আছেন, সত্যের পথেই লড়াই করছেন এবং যারা উসমান রা.-এর খুনিদের আশ্রয় দিয়েছে তাদের সঙ্গে লড়াই অব্যাহত রাখা আবশ্যক।

আমর ইবনুল আস রা. মুআবিয়া রা.-কে বললেন, আমি এমন একটি বিষয় ভেবেছি, এই মুহূর্তে যার মাধ্যমে আমরা সবচেয়ে বেশি ঐক্যবদ্ধ হতে পারি এবং তাদের মধ্যে বিভেদ বেড়ে যেতে পারে। আমার পরামর্শ হচ্ছে, আমরা এখন কুরআন উত্তোলন করে তাদেরকে আমাদের দিকে আহ্বান করব। যদি তারা সকলেই সাড়া দেয় তাহলে লড়াই থেমে যাবে। আর যদি তারা মতানৈক্য করে; কেউ বলে সাড়া দেবে, আর কেউ বলে সাড়া দেবে না, তবে তারা ব্যর্থ হবে এবং তাদের শক্তি খর্ব হবে।

এই পরামর্শে মুআবিয়া রা. খুবই মুগ্ধ হন এবং তার বাহিনীর কিছু লোকদের ডেকে কুরআন উত্তোলন করার নির্দেশ দেন। তখন তারা কুরআন উত্তোলন করে বলে, হে ইরাকবাসী, তোমাদের ও আমাদের মধ্যে কুরআনকে ফয়সালাকারী হিসাবে তুলে ধরছি। অনেক মানুষ ইতিমধ্যে নিহত হয়ে গিয়েছে। তাহলে কারা সীমান্ত রক্ষা করবে? মুশরিক ও কাফেরদের সঙ্গে কারা লড়াই করবে?

এ কথা শুনে আলি রা.-এর বাহিনী বিভক্ত হয়ে যায়। কেউ বলে, আমরা আল্লাহ তাআলার কুরআনকেই ফয়সালাকারী হিসাবে মেনে নেবো।

অপর লোকেরা বলে, আমরাই সত্যের ওপর আছি। তাই লড়াই চালিয়ে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়।[২৭৪]

---

২৭৪. *আল-কামিল ফিত তারিখ*, ২/৬৬৮; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/৩০২

এই ঘটনার ব্যাপারে শিয়াদের অনেক ভ্রান্ত এবং মিথ্যা বর্ণনা রয়েছে। যেগুলোতে চিত্রায়ন করা হয়েছে যে, আলি রা. শামের বাহিনীকে তিরস্কার ও গালমন্দ করে তাদের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন।

বানোয়াট ও মিথ্যা বর্ণনা রচয়িতা শিয়া মতাবলম্বী আবু মিখনাফ লুত ইবনে ইয়াহইয়ার একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়, আলি রা. সেদিন বলেছিলেন, আল্লাহর বান্দারা, তোমরা সত্যের ওপর এবং তোমাদের শত্রুদের সঙ্গে লড়াই করার ওপর সুদৃঢ় থাকো। নিশ্চয় মুআবিয়া, আমর ইবনুল আস, ইবনে আবু মুইত, হাবিব ইবনে মাসলামা, ইবনে আবু সারহ ও যাহহাক প্রমুখ ব্যক্তি দ্বীন এবং কুরআনের ধারক নয়। তোমাদের চেয়ে আমি তাদের বেশি চিনি। সেই শিশুকাল থেকে আমি তাদের সঙ্গে মিশেছি, প্রাপ্তবয়সেও তাদের সঙ্গে মিশেছি। তারা শিশুকালেও মন্দ ছিল এবং প্রাপ্তবয়সেও মন্দ ছিল। তোমরা যদি লড়াই না করো তবে তোমাদের জন্য দুর্ভোগ। তারা কুরআন তেলাওয়াত করে ঠিকই, কিন্তু এর মর্ম বোঝে না। তারা আমাদের ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই চক্রান্ত করে কুরআন উত্তোলন করেছে।

এমনটি কখনোই ঘটেনি। আলি রা. কখনোই এমন কথা বলেননি। মিথ্যাবাদী শিয়া আবু মিখনাফ লুত ইবনে ইয়াহইয়া এই মিথ্যা বর্ণনা রচনা করেছে।

আলি রা. ছিলেন কুরআনকে ফয়সালাকারী হিসাবে মেনে নেওয়ার পক্ষে। শামের বাহিনীর এই প্রস্তাবে তিনি সম্মত হন এবং এ বিষয় নিয়ে কাকে মুআবিয়া রা.-এর কাছে পাঠাবেন তা ভাবতে থাকেন।

***

সিফফিনের যুদ্ধ প্রসঙ্গে কিছু কথা

সিফফিনের যুদ্ধ শুরু হয় ৩৬ হিজরির জিলহজ মাসের শুরুতে। আর তা স্থায়ী হয় ৩৭ হিজরির ১০ সফর পর্যন্ত। এ হিসাবে যুদ্ধ মোট ৭০ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। মহররম মাসে উভয় পক্ষের সম্মতিতে যুদ্ধবিরতি দেওয়া হয়েছিল। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, এ যুদ্ধ ১১০ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়। আবার কোনো কোনো বর্ণনার ভাষ্য হচ্ছে, এ যুদ্ধ সাত মাস অথবা তারও অধিক সময় স্থায়িত্ব লাভ করেছিল। তবে শেষ নয়দিন হয়েছিল তুমুল লড়াই। এর মধ্যে সর্বশেষ তিন দিন ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ। বিশেষ করে আম্মার ইবনে ইয়াসির রা.-এর শাহাদাত এবং লাইলাতুল হারিরের (হারির নামে যে রাতের নামকরণ করা হয়েছিল) পর যুদ্ধ প্রলয়ংকরী রূপ ধারণ করেছিল।

দীর্ঘদিন চলতে থাকা এই মর্মান্তিক লড়াইয়ের পর শহিদ ও হতাহতের সংখ্যা কত দাঁড়িয়েছিল?

আলি রা.-এর বাহিনী থেকে শহিদ হন ২৫ হাজার। মুআবিয়া রা.-এর বাহিনী থেকে শহিদ হন ৪৫ হাজার! অর্থাৎ পুরো বাহিনীর প্রায় অর্ধেক। উভয় পক্ষ মিলে নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় মোট ৭০ হাজারে। ইসলামের শুরু থেকে সে সময় পর্যন্ত কখনোই এত বিশালসংখ্যক মুসলিম একসঙ্গে নিহত হয়নি। এর আগে কোনো যুদ্ধে মুসলিম সেনাবাহিনীর মোট সংখ্যাই তো ৭০ হাজার হয়নি। কিন্তু আজ নিহতের তালিকাই ৭০ হাজার! যুদ্ধে শরিক হওয়া কেউই মুসলিমদের এমন অপূরণীয় ক্ষতির কথা কল্পনাও করতে পারেননি। আলি রা. এবং মুআবিয়া রা. উভয় পক্ষই চরম ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল। তবুও যুদ্ধের চাকা থেমে থাকে না। সকলের জন্যই এই অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ বের করা দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায়।

রাসুল ﷺ মুসলিমদের দুই বিরাট দলের মধ্যে সংঘটিত এ যুদ্ধের কথা আগেই জানিয়ে গিয়েছিলেন। ইমাম বুখারি রহ. নিজ সূত্রে আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণনা করেন, রাসুল ﷺ বলেছেন, কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না দুই দলের মধ্যে লড়াই হবে এবং তাদের মধ্যে সংঘটিত না হবে বিরাট

যুদ্ধ; কিন্তু তাদের দাবি হবে এক।[২৭৫] অর্থাৎ, উভয় পক্ষই যুদ্ধের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করবে এবং আল্লাহর পথেই যুদ্ধ করবে। প্রত্যেকেই নিজস্ব চিন্তার মাধ্যমে ইজতেহাদ করবে। অধিকাংশ ফকিহ ও মুহাদ্দিসগণের মত হচ্ছে, এই হাদিসের দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে সিফফিনের প্রান্তরে সংঘটিত এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ।

সহিহ মুসলিমে আবু সাইদ খুদরি রা.-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রাসুল ﷺ বলেন, মুসলিমদের বিচ্ছেদের সময় এক বিদ্রোহী দলের আবির্ভাব হবে, যাদেরকে সত্যের অধিক নিকটবর্তী দল হত্যা করবে।[২৭৬]

এখানে বিদ্রোহী দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যাদেরকে আলি রা. ও তার বাহিনী হত্যা করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, তারাই সত্যের ওপর ছিলেন।

ইমাম মুসলিম রহ. তার নিজ সূত্রে আমের ইবনে সাদ রা.-এর পিতা সাদ রা. থেকে বর্ণনা করেন, একদিন রাসুল ﷺ মদিনার উঁচু প্রান্ত থেকে এসে বনু উমাইয়ার মসজিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি সেই মসজিদে প্রবেশ করে দুই রাকাত নামাজ আদায় করেন। আমরাও তার সঙ্গে নামাজ আদায় করি। অতঃপর তিনি দীর্ঘক্ষণ আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করে আমাদের অভিমুখী হয়ে বলেন, আমি আমার প্রভুর কাছে তিনটি বিষয় প্রার্থনা করেছি। তন্মধ্যে দুটি দান করেছেন এবং একটি দান করেননি। আমি প্রার্থনা করেছি, তিনি যেন আমার উম্মতকে দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে ধ্বংস না করেন। তিনি আমাকে তা দান করলেন। তাঁর কাছে প্রার্থনা করেছি, তিনি যেন আমার উম্মতকে প্লাবনের মাধ্যমে ধ্বংস না করেন। তিনি আমাকে তা-ও দান করলেন। আমি তাঁর কাছে এই প্রার্থনাও করেছি যে, আমার উম্মত যেন একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়ে। তিনি আমাকে তা দান করেননি।[২৭৭]

সহিহ বুখারিতে নিজ সূত্রে জাবের রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলো,

২৭৫. *সহিহ বুখারি*, ৩৬০৯; *সহিহ মুসলিম*, ১৫৭
২৭৬. *সহিহ মুসলিম*, ১০৬৪; *সুনানু আবি দাউদ*, ৪৬৬৭
২৭৭. *সহিহ মুসলিম*, ২৮৯০; *আল-মুসনাদ লিল ইমাম আহমাদ*, ১৫১৬

﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ﴾

বলুন, তিনি তোমাদের ওপর ঊর্ধ্ব থেকে শাস্তি বর্ষণে সক্ষম।

[সুরা আনআম : ৬৫]

তখন রাসুল ﷺ বললেন, আমি আপনার কাছে আশ্রয় কামনা করছি।

এরপর অবতীর্ণ হলো,

﴿أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ﴾

তিনি তোমাদের পদতল থেকেও শাস্তি প্রদানে সক্ষম।

[সুরা আনআম : ৬৫[

রাসুল ﷺ বললেন, আমি আপনার কাছে আশ্রয় কামনা করছি।

এরপর অবতীর্ণ হলো,

﴿أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ﴾

অথবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে একদলকে অপর দলের শক্তির স্বাদ গ্রহণ করাতে সক্ষম। [সুরা আনফাল : ৬৫][২৭৮]

রাসুল ﷺ তখন বললেন, এটি তুলনামূলক লঘু অথবা সহজ।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ○ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

যদি মুমিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের ওপর বাড়াবাড়ি করে, তবে যে দল বাড়াবাড়ি করবে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে

---

২৭৮. *সহিহ বুখারি*, ৪৬২৮; *আস-সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ি*, ১১১০০

আসে। যদি ফিরে আসে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়ানুগ পন্থায় মীমাংসা করে দাও এবং ইনসাফ করো। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদের পছন্দ করেন। নিশ্চয় মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। অতএব, তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করো এবং আল্লাহকে ভয় করো, যেন তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও।

[সুরা হুজুরাত : ৯-১০]

এ আয়াত থেকে আমরা কয়েকটি নির্দেশনা লাভ করি। যথা,

মুমিনদের দুই দলের মধ্যে লড়াই একটি সম্ভাব্য বিষয়। যেমনটি আয়াতেই উল্লেখ করা হয়েছে। যদি লড়াই বেধে যায়, তখন প্রথম সমাধান হচ্ছে মীমাংসা করে দেওয়া। আল্লাহ বলেন, 'তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও'। আর যখন দুই দলের মধ্যে একদল অপর দলের ওপর বাড়াবাড়ি করে, তখন নির্দেশনা হচ্ছে, 'যারা বাড়াবাড়ি করবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো'। তাই সে সময় সকল মুসলিম মিলে নেতার অবাধ্য এই দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। এরপরের নির্দেশনা হচ্ছে '(যুদ্ধ করো) যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি ফিরে আসে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়ানুগ পন্থায় মীমাংসা করে দাও এবং ইনসাফ করো। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন।' এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন, 'নিশ্চয় মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই।' লক্ষ করুন, লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়া এবং বিদ্রোহী আখ্যা দেওয়ার পরও আল্লাহ তাআলা তাদের থেকে ঈমান ও ভ্রাতৃত্বের গুণ দূর করে দেননি।

এই যুদ্ধে উভয় পক্ষই মনে করত যে, অপর পক্ষ হচ্ছে বিদ্রোহী, সত্যের বিরোধী ও সীমালঙ্ঘনকারী। তাই সত্যের দিকে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে তাদের সঙ্গে লড়াই করা বৈধ। তাদের প্রত্যেকেই এ ব্যাপারে ইজতেহাদ করেছে।

কোনো কোনো সাহাবি ইজতেহাদ করে দেখেছেন যে, আলি রা. সত্যের পক্ষে আছেন। তা সত্ত্বেও তারা লড়াইয়ে অবতীর্ণ হননি। কোনো কোনো সাহাবি নিশ্চিত হতে পারেননি যে, কোন দল সত্যের পক্ষে রয়েছে; ফলে তারাও লড়াই থেকে বিরত থেকেছেন। কেউ কেউ ইজতেহাদ করে দেখেছেন যে, আলি রা. সত্যের পক্ষে আছেন, ফলে তারা তার পক্ষে লড়াইয়ে নেমে গিয়েছেন। আর কেউ কেউ ইজতেহাদ করে দেখেছেন,

মুআবিয়া রা. সত্যের পক্ষে আছেন, ফলে তারা লড়াই করেছেন মুআবিয়া রা.-এর পক্ষ হয়ে।

সুতরাং বিষয়টি ছিল খুবই জটিল এবং এতে ইজতেহাদের বিরাট ভূমিকা ছিল। যারা এই ফিতনা থেকে দূরে ছিলেন এবং কোনো পক্ষের হয়েই লড়াই করেননি, তাদের মধ্যে ছিলেন বিশিষ্ট অনেক সাহাবি। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. ছিলেন তাদের অন্যতম। তিনি এসব ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কিন্তু কোনো পক্ষের সঙ্গেই যুদ্ধে নামেননি। এমনইভাবে সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা., উসামা ইবনে যায়দ রা., মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা রা. ও ইমরান ইবনে হুসাইন রা. প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবিগণ যুদ্ধ থেকে বিরত ছিলেন এবং তারা এই দুই পক্ষের কাছে অস্ত্র বিক্রি করতেও নিষেধ করেছেন।

এ ঘটনার দীর্ঘকাল পরে যে-সকল আলেম ও ফকিহ এসেছেন এবং এ বিষয়গুলো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন তারাও দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। তাদের কাছে কোনোভাবেই বিষয়টি পুরোপুরি স্পষ্ট হয়নি।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. মনে করতেন, এ যুদ্ধে আলি রা. সত্যের পক্ষে ছিলেন। তবে তিনি এও বলেছেন যে, মুআবিয়া রা. প্রথমে যুদ্ধ করেননি। তিনি মনেপ্রাণে চেয়েছিলেন, যেন কোনো যুদ্ধ না ঘটে। আলি রা. যদি তার বাহিনী নিয়ে কুফা থেকে সিফফিন অভিমুখী না হতেন, তবে এ যুদ্ধ সংঘটিত হতো না।[২৭৯]

এদিকে চার মাজহাবের ইমামগণ মনে করতেন, আলি রা.-এর ইজতেহাদ ছিল সঠিক। তাই তিনি দুটি সওয়াব পাবেন। আর মুআবিয়া রা.-এর ইজতেহাদ ছিল ভুল। তাই তিনি একটি সওয়াব পাবেন। তার কোনো পাপ হবে না। আলি রা.-কে সত্যের পক্ষে মনে করার সঙ্গে সঙ্গে ইমাম আহমাদ রহ. আরও সংযুক্ত করেন, এই লড়াইটি ছিল ফিতনামূলক লড়াই। যদি এই লড়াইটি সংঘটিত না হতো, তবে সেটাই হতো সবচেয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত। এই সময়ে লড়াই করা ওয়াজিব অথবা মুস্তাহাব কিছুই ছিল না।

ইমাম আহমাদ রহ., শাফেয়ি রহ. ও আবু হানিফা রহ.-এর অনেক অনুসারী মনে করেন যে, উভয় পক্ষই তাদের ইজতেহাদে সঠিক ছিলেন। আল্লাহ তাআলা যা ফয়সালা করেন তা অবশ্যম্ভাবী।

---

২৭৯. *মিনহাজুস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যা*, ৪/৪৪৭

তবে আলি রা. উসমান রা.-এর খুনিদের শাস্তিবিধানের আগে তার পক্ষে সকল মুসলিমের বাইআত গ্রহণের যে ইজতেহাদ করেছিলেন, এই ইজতেহাদ সঠিক হওয়ার ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই।

এসব বিষয় পর্যবেক্ষণ করে আমরা বলতে পারি যে, সে সময় কোন দলটি যে বিদ্রোহী ছিল তা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবিগণের কাছে পুরোপুরি স্পষ্ট ছিল না। তাদের কেউই নিশ্চিতভাবে জানতেন না যে, কারা পূর্ণ সত্যের ওপর রয়েছে।

বর্তমান সময়ে এসে আমরা মনে করি যে, আলি রা. সত্যের পক্ষে ছিলেন। মুআবিয়া রা.-এর বিরুদ্ধে ইসলামি সাম্রাজ্যের অধিকাংশ লোকই তার সঙ্গে ছিল। কিন্তু আমাদেরকে মুআবিয়া রা., আমর ইবনুল আস রা. ও তাদের বাহিনীর বিশিষ্ট সাহাবি ও তাবেয়িগণের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিও লক্ষ রাখতে হবে। তারা সকলেই ছিলেন উসমান রা.-এর সামসময়িক। অন্য সকল মুসলিমের মতো তারাও উসমান রা.-এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে ছিলেন অবগত। জানতেন যে, তিনি হলেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ১০জন সাহাবির একজন।

রাসুল ﷺ তার কাছে নিজের দুই মেয়েকে একের পর এক বিয়ে দিয়েছেন। তাই মুআবিয়া রা. ও তার সমর্থক সাহাবি এবং তাবেয়িগণের পক্ষে লোকদের হাতে এই বয়োজ্যেষ্ঠ মহান শ্রদ্ধাভাজন সাহাবির এমন নৃশংস মৃত্যু মেনে নেওয়া ছিল খুবই কষ্টকর। তাও আবার তিনি নিহত হয়েছেন এমন লোকদের হাতে, যারা আল্লাহ তাআলার হকের (অধিকারের) কোনো তোয়াক্কা করে না, ফিতনার আগুন প্রজ্বলিত করতে চায় এবং ইসলামি সাম্রাজ্যের স্তম্ভকে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে চায়।

এমন গুরুতর অপরাধে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তারা দেখছিলেন যে, ওই সকল খুনি আলি রা.-এর পক্ষ হয়ে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এসেছে। এতে তারা খুবই মর্মাহত হন, তাদের হৃদয়ে সৃষ্টি হয় বেদনার ক্ষত। যদিও তাদের কর্তব্য ছিল প্রথমে নিজেদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে আমিরুল মুমিনিনের আনুগত্য প্রকাশ করে তার হাতে বাইআত গ্রহণ করা, যেন ফিতনার আগুন নিভে যায়। অতঃপর যখন খলিফার ক্ষমতা নিষ্কণ্টক হবে, সাম্রাজ্যের পরিস্থিতি শান্ত হবে এবং ওই সকল খুনি, বিদ্রোহী ও তাদের বিশাল সমর্থকগোষ্ঠীকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা লাভ হবে তখন তাদের শাস্তি বিধানের দাবি জানানো।

পাশাপাশি মুআবিয়া রা. ও তার সঙ্গীদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাদের কাছে এর গুরুত্বের দিকটিও বিবেচনা করা উচিত। যদিও আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, কোনো মুসলিমের দায়িত্ব হলো, ক্ষতি ও উপকারের মধ্যে তুলনা করা। যদি সে দুটি ক্ষতি দেখতে পায় এবং এ থেকে যেকোনো একটিকে বেছে নিতে হয়: তবে তার উচিত অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিটি বেছে নেওয়া। এ অবস্থায় অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতি ছিল সাম্রাজ্যের পরিস্থিতি শান্ত হওয়া ও ক্ষমতা নিষ্কণ্টক হওয়া পর্যন্ত উসমান রা.-এর খুনিদের শাস্তি বিধানে বিলম্ব করা।

এখানে এ কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, নিশ্চয় সাহাবিগণ তাড়াহুড়া করে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন না। নিজেদের সিদ্ধান্ত প্রকাশের আগে তারা অনেক চিন্তাভাবনা ও শলাপরামর্শ করে নিতেন। আমরা যদি আমাদের বাস্তবতার দিকে তাকাই তবে দেখব যে, কোনোরূপ জানাশোনা ছাড়াই আমরা অনেক বিষয়ে রায় দিয়ে দিই। এমনকি কখনো কখনো আমাদের ভুল জানাশোনার ওপর ভিত্তি করে একটি বিষয়কে ভুল বা সঠিক, ভালো কিংবা মন্দ বলে দিই। বিশেষত সাহাবিগণের এই ফিতনার ব্যাপারে এমনটি বেশি ঘটে, যে ব্যাপারে ছড়িয়ে আছে শিয়াদের প্রচুর ভ্রান্ত ও মনগড়া বর্ণনা। আরও রয়েছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবিদদের কর্তৃক ছড়ানো অবান্তর বর্ণনা। আমরা এগুলোকেই প্রমাণিত সত্য মেনে নিয়ে অধ্যয়ন করি। অথচ প্রকৃতপক্ষে এগুলো সম্পূর্ণ বানোয়াট ও মিথ্যা।

উমর ইবনুল খাত্তাব রা. তার শাসনামলের কিছু লোকের ব্যাপারে আশ্চর্য হতেন এবং তাদের উদ্দেশে বলতেন, আল্লাহর শপথ! তোমরা এমন বিষয়ে নিজেদের মত প্রকাশ করছ, যার সমাধানের জন্য আমরা বদরি সাহাবিগণকে একত্র করতাম।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এ ঘটনার সঙ্গে সূক্ষ্ম একটি বিষয় সংযুক্ত করেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা যা ফয়সালা করেন তা অবশ্যম্ভাবী। এই ফিতনা সংঘটিত হয়েছে। তবে কেউই জানে না, এর পেছনে কী কল্যাণ নিহিত রয়েছে? এখানে ফিকহ সংশ্লিষ্ট এমন কিছু বিষয় রয়েছে , যদি এই ফিতনা না হতো তবে আমরা তা কখনোই জানতে পারতাম না।

দীর্ঘদিন ধরে আলেমগণের কাছে এগুলো প্রশ্ন হয়েই ছিল। কিন্তু এই ঘটনার পরবর্তী সময়ে সাহাবিগণের আচরণ ও অবস্থান থেকে প্রশ্নগুলোর সমাধান

আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়। যেমন, যদি এ ফিতনা সংঘটিত না হতো, তবে আমরা বাগি (বিদ্রোহী) আর মুহারিবের (ডাকাতের) পার্থক্য বুঝতাম না। রাসুল ﷺ-এর নবুয়ত লাভের পর থেকে এই প্রথম কোনো দলের ওপর বাগি (বিদ্রোহী) শব্দটি প্রয়োগ করা হয়।

এমনইভাবে বাগিদের (বিদ্রোহীদের) কী হুকুম তা-ও কেউ জানত না। আলি রা.-এর বাহিনীতে তাৎক্ষণিকভাবেই এমনটি ঘটেছিল। তারা কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন তা নিয়ে দ্বিধায় পড়ে যান। তখন আলি রা. এবং তার উপদেষ্টা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর মতো বিশিষ্ট সাহাবিগণ তাদের কাছে বিদ্রোহীদের হুকুম স্পষ্ট করেন।

আমরা এখন বাগি (বিদ্রোহী) ও মুহারিবের (ডাকাতের) মধ্যকার পার্থক্য তুলে ধরব। কারণ, বাগি (বিদ্রোহী) শব্দটি মুহারিব (ডাকাতের) শব্দের তুলনায় লঘু ও হালকা। কারণ, মুহারিবরা (ডাকাতরা) হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের শত্রু। অচিরেই আমরা তাদের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করব। ইনশাআল্লাহ।

বিদ্রোহী কারা?

কোনো দলকে বিদ্রোহী সাব্যস্ত করতে হলে তাদের মধ্যে কিছু শর্ত পাওয়া যেতে হবে। যেমন,

এক. বিদ্রোহীরা এমন ন্যায়পরায়ণ ইমাম তথা নেতার বিরোধিতা করে, মুমিনদের যাবতীয় বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণকারী হিসাবে যার আনুগত্য আল্লাহ তাআলা আবশ্যক করেছেন; আর এই বিরোধিতা কোনো গুনাহের কাজের ক্ষেত্রে হয় না। অর্থাৎ যে শাসক ন্যায়পরায়ণ হয়ে থাকে এবং এমন কাজের নির্দেশ দেয় যা গুনাহ নয়, তার বিরোধিতা করলে বিদ্রোহী হওয়ার একটি শর্ত পাওয়া যাবে। তবে যদি শাসক অত্যাচারী হয় এবং গুনাহের কাজের আদেশ করে তবে তার বিরোধীদের বিদ্রোহী বলা যাবে না।

ফিতনার ঘটনার সময় মুআবিয়া রা. নিজে ইজতেহাদের মাধ্যমে মনে করতেন, আলি রা. তাদেরকে এমন কাজের আদেশ দিয়েছেন যাতে গুনাহ রয়েছে। তাই গুনাহের কাজে তার আনুগত্য করা আবশ্যক নয়। তা হচ্ছে, উসমান রা.-এর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে বিলম্ব করা। মুআবিয়া রা.-এর মত ছিল অবিলম্বে খুনিদের হত্যা করা। কারণ, তিনিই ছিলেন উসমান রা.-এর উত্তরসূরি ও তার চাচাতো ভাই। তিনি কিসাস গ্রহণ করবেন ও খুনিদের ক্ষমা

করবেন না। তাই তিনি মনে করতেন যে, আলি রা. আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত একটি হদ প্রয়োগে অবহেলা করছেন। তাই তার আনুগত্য স্বীকার করা যাবে না।

দুই. বিরোধিতা হবে এমন দলের পক্ষ থেকে, যাদের শক্তি ও প্রতিপত্তি রয়েছে। যাদের প্রতিরোধ করার জন্য শাসকের প্রয়োজন শক্তি, রসদ ও সম্পদের। কোনো নিরস্ত্র ছোট দল যারা রাষ্ট্র প্রধানের কোনো বিষয়ে আপত্তি জানাতে বের হয়েছে, তাদের বিদ্রোহী গণ্য করা হবে না।

তিন. শাসকের বিরোধিতার পক্ষে তাদের থাকতে হবে সঠিক ব্যাখ্যা এবং স্পষ্ট ও গ্রহণযোগ্য দলিল-প্রমাণ। তবে শাসকের দলিল-প্রমাণ হবে তাদের চেয়েও শক্তিশালী। যদি কোনো গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা ছাড়াই নেতৃত্ব অথবা দুনিয়ার লোভে শাসকের বিরোধিতা করে, যাদের উদ্দেশ্য শুধুই ক্ষমতা লাভ করা, তাদেরকে বাগি (বিদ্রোহী) নয়; বরং মুহারিব (ডাকাত) হিসাবে গণ্য করা হবে।

চার. তাদের এমন আমির থাকতে হবে, যার পূর্ণ আনুগত্য তারা করে।

কোনো দলকে বিদ্রোহী আখ্যায়িত করতে হলে তাদের মধ্যে এই চারটি শর্ত বিদ্যমান থাকা আবশ্যক।

আমিরুল মুমিনিন আলি রা. পুরোপুরি নিশ্চিত ছিলেন যে, মুআবিয়া রা. ও তার সঙ্গীরা হচ্ছে বিদ্রোহী, যাদের সঙ্গে লড়াই করা আবশ্যক। ইতিমধ্যে যে চারটি শর্ত আমরা উল্লেখ করলাম, তাদের মধ্যে তা পুরোপুরি বিদ্যমান আছে।

শরিয়তের বিধান অনুযায়ী দুনিয়াতে বিদ্রোহীদের বিধান মুহারিবদের বিধানের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিষয়টি আল্লাহ তাআলার ফয়সালার ওপর ন্যস্ত। তবে এতটুকু স্পষ্ট হওয়া জরুরি যে, যারা নিজেদেরকে সত্যের পক্ষে এবং আল্লাহ তাআলার হদ প্রতিষ্ঠাকারী মনে করে বিরোধিতা করে, তাদের বিধান দুনিয়ার লোভে নেতৃত্ব ও প্রভাব-প্রতিপত্তির আশায় বিদ্রোহকারী তথা মুহারিবদের বিধানের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

ইসলামে বিদ্রোহীদের বিধান

বিদ্রোহীদের মধ্যে যারা যুদ্ধ থেকে পলায়ন করে, তাদের হত্যা করা যাবে না। কেননা, তারা মুমিন। আল্লাহ তাআলা বিদ্রোহীদের আলোচনা করতে গিয়ে তাদের থেকে ঈমানের গুণ দূর করে দেননি; বরং তিনি বলেন, 'যখন মুমিনদের দুই পক্ষ পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হয়'। [সুরা হুজুরাত : ৯]

তাদের মধ্যে যারা আহত হয় তাদেরও হত্যা করা যাবে না। বরং তাদের ছেড়ে দিতে হবে অথবা চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

তাদের মধ্যে যারা বন্দি হয়েছে তাদেরও হত্যা করা যাবে না। তবে মুহারিব (ডাকাত) অথবা কাফের বন্দিদের হত্যা করা বৈধ।

মুহারিব এবং কাফের বন্দিদের ফয়সালার ব্যাপারটি মুসলিমদের ইমাম তথা নেতার ওপর ন্যস্ত। চাইলে তিনি মুক্তিপণ ছাড়া অথবা কোনো সম্পদের বিনিময়ে কিংবা নিজেদের বন্দির বিনিময়ে তাদেরকে ছেড়ে দিতে পারেন। চাইলে মুসলিমদের শিক্ষা প্রদানের শর্তেও ছেড়ে দিতে পারেন, যেমনটি বদর যুদ্ধে রাসুল ﷺ করেছিলেন। আবার চাইলে তাদের হত্যাও করতে পারেন।

যদি মুসলিমরা শক্তিশালী হয় এবং শত্রুবাহিনীর ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকে, তবে রাষ্ট্রপ্রধান কোনো মুক্তিপণ ছাড়াই বন্দিদের মুক্ত করে দিতে পারেন। রাসুল ﷺ এমনটি করেছিলেন মক্কাবাসীর সঙ্গে; ইসলামের প্রতি তাদের হৃদয়কে আকৃষ্ট করার জন্য ও তাদের ইসলাম গ্রহণে আশাবাদী হয়ে।

উভয় পক্ষের মধ্যে বন্দি বিনিময় অথবা সম্পদের বিনিময়ে তাদের মুক্ত করে দেওয়ারও সুযোগ রয়েছে। যদি বিরোধী পক্ষের কাছে এমন কোনো জ্ঞান থাকে, যা মুসলিম পক্ষের নেই; তাহলে মুসলিমদের সেই জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার শর্তেও বন্দিদের মুক্ত করা যেতে পারে।

তবে যদি বিরোধী পক্ষের তুলনায় মুসলিম বাহিনী দুর্বল হয় অর্থাৎ তাদের জনবল ও অস্ত্রবল মুসলিমদের তুলনায় বেশি থাকে, তাহলে তাদের মনে ভীতি সৃষ্টি করার জন্য বন্দিদের হত্যা করা হবে। কারণ মুসলিমদের কাছে ওই সকল বন্দির সুরক্ষা, ভরণপোষণ ও তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা না থাকায় তাদের হত্যা করাই বাঞ্ছনীয়।

উদাহরণত, আমরা যদি উল্লাইসের যুদ্ধের দিকে তাকাই তবে দেখব যে, সে যুদ্ধে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা.-এর নেতৃত্বাধীন মুসলিম বাহিনীতে ছিল মাত্র ১৮ হাজার সৈন্য। আর বিপরীত বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল ১ লক্ষ। তাদের মধ্যে ৭০ হাজার সৈন্যকেই খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা. বন্দি করে ফেলেন। এখন এই ৭০ হাজার সৈন্যের সুরক্ষা কে দেবে? পুরো মুসলিম বাহিনী মিলেও তাদের সুরক্ষা দিতে পারবে না অথবা তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। উলটো তারা মুসলিমদের জন্য বিপদ হয়ে দাঁড়াবে। এবং তাদের হত্যা করা ব্যতীত বিজয় নিশ্চিত করাও সম্ভব ছিল না।

মুসলিম সেনাবাহিনীর সংখ্যা স্বল্পতা এবং এর বিপরীতে পারসিকদের অসংখ্য সৈন্য থাকা সত্ত্বেও ফিরাদের যুদ্ধে পারসিকদের ১ লক্ষ সৈন্য নিহত হয়েছে, উল্লাইসের যুদ্ধে নিহত হয়েছে ৭০ হাজার, আনবারের যুদ্ধে ১০ হাজারের অধিক, আইনুত তামার যুদ্ধে ৩০ হাজার, দুমাতুল জান্দাল যুদ্ধে ৫০ হাজার এবং বুয়াইবের যুদ্ধেও নিহত হয়েছিল ৫০ হাজার পারসিক সৈন্য।

পারসিকদের ছিল অসংখ্য ও অগণিত সৈন্য। এক বাহিনী নিহত হলে মুহূর্তের মধ্যেই আরেক বাহিনী এসে হাজির হতো। তখন পারস্য ও রোম ছিল বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী বাহিনী। পারস্য সাম্রাজ্যের সীমানা ছিল ইরাকের পশ্চিমাঞ্চল থেকে নিয়ে চীনের পূর্বাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। আয়তনের দিক দিয়ে যা ছিল খুবই বিশাল। ফলে তাদের কাছে ছিল এক বিশাল সামরিক বাহিনী। তাই বন্দিদের হেফাজতে রাখা ছিল খুবই কঠিন এবং তাদের পক্ষ থেকে ছিল সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। তাই উমর ইবনুল খাত্তাব রা. তাদের হত্যার নির্দেশ প্রদান করেন। যেন পারসিকদের শক্তিমত্তাও হ্রাস পায় এবং তাদের সুরক্ষা দিতে মুসলিমদের যে শক্তি ব্যয় হতো, তাও সঞ্চয় হয়। তাই মুসলিমদের কল্যাণের প্রতি লক্ষ করে শাসকের জন্য বন্দি মুহারিবদের (ডাকাতদেরকে) হত্যা করা বৈধ। এটা হত্যার প্রতি লিপ্সা অথবা আকর্ষণের কারণে নয়; বরং সমস্ত মুসলিমের কল্যাণের লক্ষ্যেই তাদেরকে হত্যা করা হবে।

তবে বিদ্রোহী বন্দিদের হত্যা করা বৈধ হবে না এবং তাদের সম্পদকে গনিমত তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসাবেও গণ্য করা যাবে না। জঙ্গে জামালের পর আলি রা.-এর বাহিনীর মুসলিমরা আয়েশা রা.-এর বাহিনীর অনেক সম্পদ দখল করে নেয়। তখন আলি রা. সেগুলো বসরার মসজিদে নিয়ে

রাখার আদেশ দেন এবং বলেন, যদি কেউ তার সম্পদ চিনতে পারে, তবে সে যেন তা এসে নিয়ে যায়।

এসব সম্পদকে গনিমত গণ্য করা যাবে না। কেননা উভয় পক্ষই মুসলিম। তখন সেনাবাহিনীর মধ্যে কেউ কেউ বলে, যদি আমাদের জন্য তাদের সম্পদ বৈধ না হয়ে থাকে, তাহলে তাদের হত্যা করা কীভাবে বৈধ হবে?

ফিতনাবাজদের লাগাতার পীড়াপীড়ির কারণে অবশেষে আলি রা. বলতে বাধ্য হন, তবে চলো, গনিমতের সম্পদ বণ্টন করি। এখন বলো, আয়েশা রা. কার ভাগে যাবে? এ কথায় তারা হতভম্ব হয়ে যায় এবং সেখান থেকে প্রস্থান করে।[২৮০]

যুদ্ধের মধ্যে বিদ্রোহীরা প্রাণ অথবা সম্পদের ক্ষতি করে থাকলে এর ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে না। তাদের নিহত মুমিন ব্যক্তিদের গোসল দেওয়া হবে, কাফন পরানো হবে এবং জানাজার নামাজ আদায় করে দাফন সম্পন্ন করা হবে। বিদ্রোহী দল এবং সঠিক পথের অনুসারী দলের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য এটিই। সঠিক পথের অনুসারী দলের ব্যক্তিরা শহিদ হিসাবে গণ্য হবে। তাদের গোসল দেওয়া হবে না, কাফন পরানো হবে না এবং জানাজার নামাজও আদায় করা হবে না।[২৮১]

এসব বিধিবিধান ফিতনার ঘটনার পরেই জানা যায়।

আর যারা কোনো গ্রহণযোগ্য সঠিক ব্যাখ্যা ছাড়াই ন্যায়পরায়ণ শাসকের বিরোধিতা করে, ওই সকল মুহারিব (ডাকাত) সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার এই কথাটিই যথেষ্ট।

﴿إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبۡلِ أَن تَقۡدِرُواْ عَلَيۡهِمۡۖ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ﴾

---

২৮০. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/২৭৩

২৮১. হানাফি মাজহাব মতে শহিদের জানাজা পড়া হবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক সাহাবি শহিদ হওয়ার পর তার জানাজা পড়েছিলেন। *সুনানুন নাসায়ি*, ১৯৫৩ (শামেলা)-সম্পাদক

> যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং জমিনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে অথবা তাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে দেওয়া হবে অথবা তাদের নির্বাসিত করা হবে। এটি হলো তাদের জন্য পার্থিব লাঞ্ছনা আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি। তবে সেই সকল লোক ব্যতিক্রম, যারা তোমাদের আয়ত্তে আসার আগেই তওবা করে। এরূপ ক্ষেত্রে জেনে রাখো আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [সুরা মায়িদা : ৩৩-৩৪]

সুতরাং মুসলিম বাহিনীর আয়ত্তাধীন হওয়ার পূর্বে যদি তওবা না করে তবে ওই সকল মুহারিবকে (ডাকাতকে) শাসকের চারটি শাস্তি প্রদানের সুযোগ রয়েছে। শাস্তিগুলো হলো—

এক. সরাসরি হত্যা।

দুই. শূলে চড়ানো।

তিন. তাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে দেওয়া।

চার. তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করে দেওয়া।

এটি ছিল খুবই কঠোর শাস্তির বিধান। কারণ, ওই সকল মুহারিব (ডাকাত) মূলত আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করেছে।

আলি রা. মুআবিয়া রা.-কে মুহারিব (ডাকাত) মনে করতেন না; বরং তাকে বিদ্রোহী মনে করতেন। সিফফিনের যুদ্ধের সময় রাত নামার সঙ্গে সঙ্গেই উভয় পক্ষ অপর পক্ষের সামরিক ঘাঁটিতে প্রবেশ করে কোনোরূপ সংঘাত ছাড়াই তাদের আহত এবং নিহত ব্যক্তিদের নিয়ে আসতেন। মুআবিয়া রা. ও তার বাহিনী তাদের নিহত ব্যক্তিদের জানাজার নামাজ পড়তেন না। নিজেদের ইজতেহাদ অনুযায়ী তাদের শহিদ বলেই গণ্য করতেন। কারণ, তারা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করতেন যে, তারা সত্যের ওপর আছেন এবং আলি রা.-এর দলই হচ্ছে বিদ্রোহী।

সাহল ইবনে হুনাইফ রা.-এর বক্তব্য

সিফফিনের সেই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। ৭০ হাজার মুসলিমের রক্তের বিনিময়ে যে মর্মান্তিক যুদ্ধের মূল্য চুকাতে হয়েছিল। যে যুদ্ধে মুসলিমগণ নিহত হয়েছিল অপর মুসলিম ভাইদের হাতে। সে যুদ্ধ থেমে যাওয়ার পর বিশিষ্ট সাহাবি সাহল ইবনে হুনাইফ রা. দেখতে পেলেন, কিছু লোকের মনে এ লড়াই নিয়ে দ্বিধা ও সন্দেহ রয়েছে। কিছু লোক আলি রা.-এর সঙ্গে থাকা এবং তার খেলাফতের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তার বাইআত ও আনুগত্য স্বীকার করা সত্ত্বেও অপর মুসলিম ভাইদের হত্যার কারণে তারা দ্বিধায় ভুগছে। মুআবিয়া রা.-এর বাহিনীতেও ছিল একই অবস্থা। তখন সাহল ইবনে হুনাইফ রা. তাদের উদ্দেশে কিছু কথা বলেন। যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং মুসলিমদের উচিত এ কথার মাধ্যমে কেয়ামত পর্যন্ত উপকৃত হওয়া। তিনি বলেন, হে লোকসকল, আপনারা দ্বীনের ব্যাপারে নিজেদের মতকে প্রশ্নবিদ্ধ মনে করুন।

তিনি দেখছিলেন যে, কিছু লোক শরিয়তের বিরোধী মত পোষণ করেও এটিকে সঠিক বলে মনে করছে। শরিয়তবোদ্ধাগণ তাদেরকে সঠিক মত বোঝানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু তারা সহজে তা মেনে নিচ্ছে না অথবা একেবারেই মেনে নিচ্ছে না। তাই তিনি বলেন, আবু জান্দালের দিন (হুদাইবিয়ার সন্ধির দিন) যখন রাসুল ﷺ মক্কার কাফেরদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করছিলেন, আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। এই চুক্তির একটি শর্ত ছিল এই যে, কুরাইশ অথবা তার মিত্র গোত্রসমূহ থেকে যারা মুসলিম হয়ে মদিনায় যাবে, মুসলিমরা তাদেরকে তাদের গোত্রে ফিরিয়ে দেবে। আর মুসলিম থেকে মুরতাদ হয়ে কুরাইশদের কাছে গেলে তারা তাদেরকে নিজ গোত্রে ফিরিয়ে দেবে না; বরং নিজেরাই রেখে দেবে।

কিন্তু এ শর্তটি ছিল বৈষম্যমূলক। কারণ, মুসলিমগণ নিজেদের ধর্মের ক্ষেত্রে এ হীনতা কীভাবে মেনে নেবেন, যেমন উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বলেছিলেন। তাদের অনেকেই বিশ্বাস করতেন যে, এই শর্ত মেনে না নেওয়াটাই সঠিক। কিন্তু রাসুল ﷺ ছিলেন এই শর্ত মেনে নেওয়ার ব্যাপারে অটল। নিশ্চয় এটি আল্লাহ তাআলারই নির্দেশ ছিল। এই অন্যায় শর্তে অসন্তুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও মুসলিমরা রাসুল ﷺ-এর অনুসরণে তা মেনে নিতে বাধ্য হন। তবে পরের দিনটি ছিল মুসলিমদের জন্য খুবই কঠিন। এ দিনটিকেই সাহল ইবনে হুনাইফ রা. 'আবু জান্দালের দিন' নামে অভিহিত করেন। মুসলিমদের মধ্যে

সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন হয়ে যায়। মুশরিকদের পক্ষ থেকে এ চুক্তি সম্পন্ন করেন সুহাইল ইবনে আমর, যিনি পরবর্তী সময়ে মুসলিম হয়েছিলেন। তখন মুশরিকদের মধ্য থেকে আবু জান্দাল নামক এক ব্যক্তি এসে ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করে।[২৮২] আবু জান্দাল ছিলেন সুহাইল ইবনে আমরের পুত্র। তখন সুহাইল ইবনে আমর বলেন, এর মাধ্যমেই আমরা চুক্তির অনুসরণ শুরু করতে পারি। আবু জান্দালকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিন। তখন রাসুল ﷺ আবু জান্দালের ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিয়ে কাফেরদের কাছে তাকে ফিরিয়ে দেন। তখন আবু জান্দাল রা. বলেন, হে আল্লাহর রাসুল, তারা আমাকে আমার ধর্মকর্ম নিয়ে বিপদে ফেলবে জেনেও আপনি আমাকে তাদের হাতে ছেড়ে দিচ্ছেন?![২৮৩]

সকল সাহাবিগণের পক্ষে এ বিষয়টি মেনে নেওয়া ছিল খুবই কঠিন। এমনকি উমর ইবনুল খাত্তাব রা. তার তরবারিটি আবু জান্দাল রা.-এর হাতে তুলে দেন এবং বলেন, আপনিও একজন পুরুষ এবং সে-ও একজন পুরুষ।[২৮৪]

এই বলে তিনি আবু জান্দাল রা.-কে নিজের পিতাকে হত্যা করার ব্যাপারে উদ্‌বুদ্ধ করেছিলেন।

এতৎসত্ত্বেও ওই সব শর্ত ও আবু জান্দাল রা.-এর এই ঘটনা ছিল মুসলিমদের জন্য এক মহাবিজয়ের উপক্রমণিকা। হুদাইবিয়ার সন্ধির এক বছর পরেই বিশালসংখ্যক লোক ইসলামের সুশীতল ছায়ায় প্রবেশ করে। ইতিপূর্বে মুসলিমদের সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয় কজন, কিন্তু সেদিনের পর তাদের সংখ্যা বেড়ে যায় বহুগুণ।

তাই সাহল ইবনে হুনাইফ রা. বলেন, হে লোকসকল, আপনারা দ্বীনের ব্যাপারে নিজেদের মতকে প্রশ্নবিদ্ধ মনে করুন। আবু জান্দালকে ফিরিয়ে দেওয়ার দিন আমি উপস্থিত ছিলাম। আমার যদি ক্ষমতা থাকত, তাহলে রাসুল ﷺ-কে এ কাজ থেকে ফিরিয়ে দিতাম। আল্লাহর শপথ! ইসলাম গ্রহণের পর আমরা যতবার কোনো কারণে যুদ্ধ করেছি ততবারই এর সমাধান খুঁজে পেয়েছি। তবে বর্তমান এ বিষয়ে কোনো সমাধান খুঁজে পাচ্ছি

---

২৮২. আবু জান্দাল রা. এ সন্ধিচুক্তির আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১/১৯২ (শামেলা)-সম্পাদক

২৮৩. *আল-মুসনাদ লিল ইমাম আহমাদ*, ১৮৯১০; *আস-সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি*, ১৮৮৩১

২৮৪. *ফাতহুল বারি*, ৫/৩৪৯

না। একদিক রক্ষা করতে গেলে অন্যদিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কীভাবে এর সমাধান করব তা আমাদের জানা নেই।[২৮৫]

সাহল ইবনে হুনাইফ রা. এই ইতিহাস তুলে ধরে জানাচ্ছেন যে, তারা ইসলাম গ্রহণের পর থেকে যতবারই অস্ত্রধারণ করেছেন ততবারই আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য সত্যকে উন্মোচিত করে দিয়েছেন। তবে ফিতনার বিষয়টিতে এসে তার ব্যত্যয় ঘটে। এখানে তাদের কাছে সত্য স্পষ্টভাবে উন্মোচিত হয়নি। ফলে প্রত্যেকেই নিজস্ব পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী ইজতেহাদ করেন। ফলে সংঘটিত হয় সেই ফিতনা, যার মধ্যে ঘুমন্ত ব্যক্তিরা জাগ্রত ব্যক্তিদের চেয়ে উত্তম; জাগ্রত ব্যক্তিরা উত্তম দণ্ডায়মান ব্যক্তিদের থেকে; আর দণ্ডায়মান ব্যক্তিরা দৌড়ে চলা ব্যক্তিদের থেকে উত্তম। যেমনটি রাসুল ﷺ-এর হাদিস থেকে জানা যায়, যা *সহিহ মুসলিমে* আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে।[২৮৬]

আম্মার ইবনে ইয়াসির রা.-কে সিফফিনের যুদ্ধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, এটি কি রাসুল ﷺ-এর কোনো ভবিষ্যদ্‌বাণী নাকি আপনাদের নিজস্ব ইজতেহাদ?

তিনি বলেন, রাসুল ﷺ আমাদের শুধু এটির কথাই বলে গিয়েছেন। এ বলে তিনি কুরআনের দিকে ইশারা করেছেন।

সুতরাং পুরো বিষয়টিই ছিল ইজতেহাদের ওপর নির্ভরশীল। সকল সাহাবির মধ্য থেকে কারও কারও ইজতেহাদ ছিল সঠিক। ফলে তারা দুটি সওয়াব পাবেন। যেমন আলি রা. ও তার অনুসারীগণ। আর কারও ইজতেহাদ ছিল ভুল। যেমন, মুআবিয়া রা. ও তার অনুসারীগণ। তারা সকলেই ছিলেন রাসুল ﷺ-এর প্রিয় সাহাবি। যাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়েই রাসুল ﷺ ইহজগৎ ত্যাগ করেন।

সালিশ নির্ধারণ ও ফলাফল

ইতিপূর্বে জেনেছি যে, সিফফিনের যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে, সারা রাত তুমুল লড়াই চলতে থাকে। বিজয়ের পাল্লা ক্রমেই ঝুঁকতে থাকে আলি রা.-এর

---

২৮৫. *সহিহ বুখারি*, ৪১৮৯; *আল-মুসনাদ লিল ইমাম আহমাদ*, ১৫৯৭৪

২৮৬. *সহিহ মুসলিম*, ২৮৮৬; *আস-সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি*, ১৬৮৭৮

বাহিনীর দিকে। আর মুআবিয়া রা.-এর বাহিনীর আকাশে জমতে থাকে পরাজয়ের কালো মেঘ। আলি রা.-এর বাহিনীর জন্য বিজয় ছিল অত্যাসন্ন।

এমন সময় আমর ইবনুল আস রা. মুআবিয়া রা.-কে এমন একটি পরামর্শ দেন, যার মাধ্যমে শামের বাহিনীকে সুনিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে উদ্ধার করা যাবে। এ সময় পর্যন্তও তারা নিশ্চিতভাবেই বিশ্বাস করতেন যে, তারা সত্যের ওপর আছেন এবং সত্যের পথেই লড়াই করছেন। আর যারা উসমান রা.-এর খুনিদের আশ্রয় দিয়েছে তাদের সঙ্গে লড়াই অব্যাহত রাখা আবশ্যক।

আমর ইবনুল আস রা. মুআবিয়া রা.-কে বলেন, আমি এমন একটি বিষয় ভেবেছি, এই মুহূর্তে যার মাধ্যমে আমরা সবচেয়ে বেশি ঐক্যবদ্ধ হতে পারি এবং তাদের মধ্যে বিভেদ বেড়ে যেতে পারে। আমার পরামর্শ হচ্ছে, আমরা এখন কুরআন উত্তোলন করে তাদেরকে এর দিকে আহ্বান করব। যদি তারা সকলেই সাড়া দেয় তাহলে লড়াই থেমে যাবে। আর যদি তারা মতানৈক্য করে, কেউ বলে, আমরা তাদের ডাকে সাড়া দেবো; কেউ বলে, সাড়া দেবো না, তবে তারা ব্যর্থ হবে এবং তাদের শক্তি খর্ব হবে।

এই পরামর্শে মুআবিয়া রা. খুবই মুগ্ধ হন এবং তার বাহিনীর কিছু লোকদের ডেকে কুরআন উত্তোলনের নির্দেশ দেন। তখন তারা কুরআন উত্তোলন করে বলে, হে ইরাকবাসী, তোমাদের ও আমাদের মধ্যে কুরআনকে ফয়সালাকারী হিসাবে তুলে ধরছি। অনেক মানুষ ইতিমধ্যে নিহত হয়ে গিয়েছে। তাহলে কারা সীমান্ত রক্ষা করবে? মুশরিক ও কাফেরদের সঙ্গে কারা লড়াই করবে?[২৮৭]

আলি রা.-এর বাহিনী যখন এ কথা শোনে তখন আলি রা.-সহ অধিকাংশ লোকই কুরআনকে ফয়সালাকারী হিসাবে মেনে নিতে সম্মত হন। তবে অল্প কিছু লোক এতে আপত্তি করেন। কিন্তু এ সময় তারা কোনো প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনি। আর উভয় পক্ষের অধিকাংশই এ সিদ্ধান্তে ঐকমত্য পোষণ করে।

উভয় পক্ষই এই গুরুদায়িত্ব সম্পন্ন করার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তির অনুসন্ধান শুরু করে দেয়। মুআবিয়া রা.-এর বাহিনীতে এ নিয়ে কোনো মতানৈক্য ছিল না। তারা সর্বসম্মতিক্রমে আমর ইবনুল আস রা.-কে এ কাজের জন্য

---

২৮৭. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/৩০২

নির্বাচিত করে। এসব পরিস্থিতিতে তিনিই মুআবিয়া রা.-এর প্রধান উজিরের ভূমিকা পালন করেছিলেন। তখন তার বয়স ছিল ৮৭ বছর। সাহাবিগণের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। তিনি তার মেধা ও দূরদর্শিতার জন্য প্রসিদ্ধ হলেও তাকওয়া এবং খোদাভীরুতায়ও ছিলেন অনন্য। তিনি বারবার নিজেকে বিবেকের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে নিজেই নিজের হিসাব গ্রহণ করতেন। স্বার্থান্বেষী মহল তার এই অনন্য গুণটিকে গোপন করে এবং তাকে একজন কুচক্রী ও ধোঁকাবাজ ব্যক্তি হিসাবে উপস্থিত করে। রাসুল ﷺ তার ব্যাপারে যে মন্তব্য করেছেন তাই তার গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্বের জন্য যথেষ্ট। তিনি বলেছিলেন, লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করেছে, আর আমর ইবনুল আস ঈমান এনেছে।[২৮৮]

আরেক সহিহ হাদিসে বর্ণিত আছে, আমর ইবনুল আস হচ্ছে কুরাইশের সৎ লোকদের অন্তর্ভুক্ত। আলবানি রহ. হাদিসটিকে সহিহ আখ্যা দিয়েছেন।[২৮৯]

এদিকে আলি রা.-এর বাহিনীতে যখন এ কাজের জন্য আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর ব্যাপারে প্রস্তাব দেওয়া হয়, তখন সবাই তা প্রত্যাখ্যান করে। তারা এ কাজের জন্য আবু মুসা আশআরি রা.-কে পাঠানোর দাবি করে। কারণ, আলি রা.-এর ইজতেহাদের ব্যাপারে নিশ্চিত থাকা সত্ত্বেও তিনি শুরুতে যুদ্ধে শরিক হননি।[২৯০] তিনি কুফার বিচারক ছিলেন এবং লড়াই থেকে আলাদা ছিলেন। আলি রা. তাকে তার সঙ্গে বের হতে বাধ্য করেননি।

আর আবু মুসা আশআরি রা. ছিলেন একজন খোদাভীরু, বিজ্ঞ ও ফকিহ। রাসুল ﷺ তাকে মুআজ ইবনে জাবাল রা.-এর সঙ্গে ইয়ামেনের লোকদের দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর খুবই আস্থাভাজন। তিনি তাকে বসরার গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। এটি ছিল বিরাট এক দায়িত্ব। কারণ, বসরা থেকেই দক্ষিণ এবং মধ্য পারস্যে মুসলিমদের বিজয় অভিযানসমূহ পরিচালনা করা হতো। দীর্ঘ সময় ধরে তিনি এই গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ছিলেন

---

২৮৮. *সুনানুত তিরমিজি*, ৩৮৪৪; *আল-মুসনাদ লিল ইমাম আহমাদ*, ১৭৪১২

২৮৯. *সুনানুত তিরমিজি*, ৩৮৪৫; *মুসনাদু আবি ইয়ালা*, ৬৪৫; *আল-মুজামুল কাবির লিত তবারানি*, ২০৮; *আল-আহাদিসুল মুখতারা লিল মাকদিসি*, ৮৪৪

২৯০. *তারিখুত তবারি*, ৫/৫৭১; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/৩০৬

তুসতারের (শুশতারের)[২৯১] বিখ্যাত যুদ্ধের সেনাপতি, যে তুসতার (শুশতার) শহরকে লাগাতার দেড় বছর অবরোধ করে রাখা হয়েছিল। তিনি ছিলেন একাধারে একজন ফকিহ, আলেম ও অভিজ্ঞ বিচারক। তবে বিভিন্ন গ্রন্থে তার যে সরলতা ও অদূরদর্শিতার কথা প্রচার করা হয়েছে এগুলো উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এগুলো প্রচার করা হয়েছে সিফফিনের যুদ্ধে কুরআনকে ফয়সালাকারী হিসাবে মেনে নেওয়ার বিষয়ে তাদের মিথ্যা ও বানোয়াট কথাগুলো প্রমাণিত করার জন্য। তিনি তাদের এসব মিথ্যা বর্ণনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

এমনইভাবে উসমান ইবনে আফফান রা. ও আলি রা.-এর খেলাফতকালেও তিনি দীর্ঘ সময়ব্যাপী কুফার গভর্নর ছিলেন।

তিনি যে পল্লিতে পৃথকভাবে অবস্থান করছিলেন লোকেরা সেখানে গিয়ে তাকে বলেন, সবাই সন্ধি করতে সম্মত হয়েছে।

আবু মুসা আশআরি রা. বললেন, আলহামদুলিল্লাহ।

লোকেরা বলল, আপনাকে মীমাংসাকারী নির্বাচিত করা হয়েছে।

তখন তিনি বলে ওঠেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।[২৯২]

কারণ, এমন তুমুল লড়াইয়ের পর বিবদমান দুই পক্ষের মধ্যে মীমাংসা করা খুবই কঠিন ও কষ্টসাধ্য বিষয়। অতঃপর তিনি তাদের সঙ্গে যেতে সম্মত হন, যেন এই জটিল বিষয়ের সমাধান করা যায়।

আবু মুসা আশআরি রা. এবং আমর ইবনুল আস রা. সিফফিনে একে অপরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। অতঃপর উভয়েই কীভাবে মুসলিমদের ভাগ্যাকাশে নেমে আসা এই চরম সংকট থেকে উত্তরণ লাভ করা যায়, তা নিয়ে ভাবতে থাকেন। অতঃপর প্রাথমিক পর্যায়ে চুক্তিনামা লিখতে সম্মত হন, যাতে মীমাংসার শর্তসমূহ লিপিবদ্ধ থাকবে। তবে এটিই চূড়ান্ত চুক্তিনামা নয়।

তখন আবু মুসা রা. লিপিবদ্ধ করাতে শুরু করেন এবং আমর ইবনুল আস রা. শুনতে থাকেন—

---

২৯১. তুসতার (শুশতার) : ইরানের খুজেস্তান জেলায় অবস্থিত একটি শহর।-সম্পাদক

২৯২. *তারিখুত তবারি*, ৫/৫২; *আল-কামিল ফিত তারিখ*, ২/৬৭০; *তারিখু ইবনি খালদুন*, ২/৬৩৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম,

আমিরুল মুমিনিন আলি ইবনে আবু তালেব রা. এই মর্মে সন্ধি করছেন।

আমর ইবনুল আস রা. তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, তার নাম ও পিতার নাম পর্যন্তই লিখুন। তিনি আপনাদের আমির, আমাদের নন।

আহনাফ ইবনে কায়স রা. বলেন, আমরা আমিরুল মুমিনিনই লিখব।

তখন তারা আলি রা.-এর কাছে গিয়ে এ কথা বলেন। আলি রা. আমিরুল মুমিনিন শব্দটি মুছে দিয়ে শুধু আলি ইবনে আবু তালেব লিখতে বলেন।

আমর ইবনুল আস রা. তার ইজতেহাদের মাধ্যমে নিশ্চিত ছিলেন যে, আলি রা. মুমিনদের আমির নন। নয়তো তিনি এই লড়াইয়ে কখনোই অবতীর্ণ হতেন না। এটি ছিল আলি রা.-এর আনুগত্যের স্পষ্ট বিরোধিতা। এ ছাড়া তারা তার হাতে বাইআতও গ্রহণ করেননি। এমনইভাবে শামের কোনো অধিবাসীই আলি রা.-এর বাইআত গ্রহণ করেনি। তাদের ইজতেহাদ অনুযায়ী আলি রা. আমিরুল মুমিনিন ছিলেন না।

আলি রা. নিজের উদার মনোভাবের ফলে ঐক্যের লক্ষ্যে এই প্রস্তাব গ্রহণ করে নেন।

অতঃপর লেখা হয়, আলি ইবনে আবু তালেব এবং মুআবিয়া এই এ মর্মে চুক্তি করছেন যে, আমরা সকলেই আল্লাহ তাআলার বিধান ও কুরআনের সামনে আত্মসমর্পন করব এবং আল্লাহ তাআলা যা প্রচলিত করেছেন তাই প্রচলন করব, আর তিনি যা রোধ করেছেন তা রোধ করব। উভয় সালিশ কুরআনে যে সমাধান পাবেন সে অনুযায়ীই আমল করবেন। আর যে সমাধান কুরআনে পাবে না, তার জন্য রাসুল ﷺ-এর সুন্নাহর মুখাপেক্ষী হবেন।[২৯৩]

অতঃপর উভয় সালিশ পৃথক হয়ে তাদের বাহিনীর কাছে ফিরে যান এবং তাদের কাছ থেকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন যে, তাদের দুজনকেই নিজেদের ও পরিবারের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে, তারা যা সিদ্ধান্ত নেন তাতে সকলকেই সহযোগিতা করতে হবে এবং এই চুক্তিনামায় যা লিখিত আছে, সকলকেই তা অনুসরণ করতে হবে।

সকলেই তাদেরকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। অতঃপর তারা উভয়ে পুনরায় বসেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এ বছরের রমজান মাসে

২৯৩. *আল-কামিল ফিত তারিখ*, ২/৬৭১; *তারিখু ইবনি খালদুন*, ২/৬৩৩

তারা এ বিষয়ে ফয়সালা করার জন্য বসবেন। তখন চলছিল ৩৭ হিজরির সফর মাস। তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যেন এ সময়ের মধ্যে উভয় পক্ষের মন শান্ত হয় এবং যে ফয়সালা দেওয়া হবে প্রত্যেকেই তা সানন্দে মেনে নেয়।

উভয় পক্ষ থেকে ১০জন এ মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা., হাবিব ইবনে মাসলামা রা., আবদুর রহমান ইবনে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা. ও আবুল আওয়ার সুলামি রা. ছিলেন অন্যতম।[২৯৪]

আলি রা.-এর বাহিনী থেকে আশআস ইবনে কায়স রহ. ও আহনাফ ইবনে কায়স রা.-ও বের হন। এবং আশআস ইবনে কায়স রহ. উভয় পক্ষের সামনে চুক্তিনামা পাঠ করেন। সকলেই তাতে ঐকমত্য পোষণ করেন এবং নিজেদের শহিদ ও নিহত ব্যক্তিদের দাফন কাজ শুরু করেন।[২৯৫]

ইমাম যুহরি রহ. উল্লেখ করেন, নিহত এবং শহিদের সংখ্যা এতই অধিক ছিল যে, এক কবরে ৫০জন করে দাফন করা হয়।[২৯৬]

অতঃপর আলি রা. তার বাহিনী নিয়ে কুফার দিকে রওনা হয়ে যান। শামের কিছু লোক তার কাছে বন্দি ছিল। তিনি তাদের মুক্ত করে দেন। এমনইভাবে মুআবিয়া রা.-এর কাছেও ইরাকের কিছু বন্দি ছিল। তিনিও তাদের মুক্ত করে দেন। এরপর প্রত্যেকেই নিজ নিজ দেশে ফিরে যান।

ধর্মীয় বিষয়ে কোনো ব্যক্তিকে সালিশ নির্ধারণ

আশআস ইবনে কায়স রহ. যখন আলি রা.-এর বাহিনীর কাছে চুক্তিনামা পাঠ করতে যান, তখন তিনি বনু তামিম গোত্রের একদলের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন। চুক্তিনামা পাঠ করার পর বনু তামিমের শাখাগোত্র রবিয়া থেকে উরওয়া ইবনে জারির নামক এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়ায় এবং আশআস ইবনে কায়স রহ.-কে বলে, আপনারা আল্লাহ তাআলার দ্বীনের ক্ষেত্রে মানুষকে ফয়সালাকারী নির্ধারণ করছেন![২৯৭]

---

২৯৪. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/৩০৭
২৯৫. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/৩০৭
২৯৬. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/৩০৭
২৯৭. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/৩০৮

এই লোক মনে করত যে, এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার বিধান পুরোপুরি স্পষ্ট ও মুআবিয়া রা.-এর বাহিনীর সঙ্গে শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাওয়া আবশ্যক। তাই সে এমন স্পষ্ট বিষয়ে আমর ইবনুল আস রা. ও আবু মুসা আশআরি রা.-কে ফয়সালাকারী নির্ধারণ করাকে অপছন্দ করে। অতঃপর সে তার তরবারি দিয়ে আশআস ইবনে কায়স রহ.-এর বাহনজন্তুর পেছনে আঘাত করে। এতে আশআস রা. খুবই ক্ষিপ্ত হন। আহনাফ ইবনে কায়স রা. ও অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এসে বিষয়টি মীমাংসা না করলে তখনই আলি রা.-এর বাহিনীর মধ্যে ফাটল সৃষ্টি হয়ে যেত।

অতঃপর পরিস্থিতি শান্ত হয়ে যায়। কিন্তু আলি রা.-এর বাহিনীর একটি দল উরওয়া ইবনে জারিরের এ কথা গ্রহণ করে। এটিকে ঠিক মনে করে তারা এ নিয়ে আলাপ-আলোচনা শুরু করে দেয়। যারা এ বিষয়টি নিয়ে অত্যাধিক চর্চা করে তাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন কুরআনের হাফেজ, অত্যন্ত আল্লাহওয়ালা এবং খোদাভীরু, যাদের রাত কাটে আল্লাহ তাআলার ইবাদতে। তারা এই কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নেন এবং বলেন, আপনারা আল্লাহ তাআলার দ্বীনের ক্ষেত্রে মানুষকে সালিশ নির্ধারণ করছেন!

সালিশ নির্ধারণের বিষয়ে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে বলেন, ফয়সালা একমাত্র আল্লাহ তাআলার।'

আলি রা.-এর কাফেলার যাত্রা থেমে থাকেনি। অবশেষে তারা কুফায় পৌঁছে যান। সেখানে গিয়ে জনৈক ব্যক্তিকে বলতে শোনেন, এখান থেকে গিয়েছিল আলি রা., কিন্তু ফিরে এসেছে অন্য কেউ। এ কথার দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল সালিশ নির্ধারণের বিষয়ে আলি রা.-কে তিরস্কার করা।

তখন আলি রা. বলেন, এসব লোক থেকে যাদের আমরা ছেড়ে এসেছি তারাই উত্তম।[২৯৮]

কথা সত্য মতলব খারাপ

আলি রা. কুফায় পৌঁছার পর এমন লোকের সংখ্যা ১২ হাজারে পৌঁছে যায়। যাদের স্লোগান ছিল, আমরা আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে মানুষের ফয়সালা মানি না। ফয়সালা দেওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহর। ফলে আলি রা.-এর জন্য বিষয়টি খুব জটিল হয়ে দাঁড়ায়। এই ১২ হাজার লোকের মধ্যে ৮ হাজারই

২৯৮. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/৩০৯

ছিলেন কুরআনের হাফেজ। তারা ছিলেন আলি রা.-এর বাহিনীর একটি অংশ। তাদের বলা হতো কুররা (কারিগণ)। কারণ, তারা অধিক পরিমাণে কুরআন তেলাওয়াত করত। অধিক পরিমাণে নামাজ আদায় ও রোজা রাখা ছিল তাদের নিত্যকার অভ্যাস। দ্বীনের ক্ষেত্রে মানুষের ফয়সালা মেনে নেওয়া যাবে না, এমন স্লোগানদাতাদের অধিকাংশ ছিল হারুরা[২৯৯] নামক এলাকার অধিবাসী। ইতিহাসের পাতায় এরাই খারেজি নামে পরিচিত। কারণ, তারা আমিরুল মুমিনিন আলি রা.-এর আনুগত্য থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। রাসুল ﷺ আগেই এই দলের সংবাদ দিয়েছিলেন। এটি রাসুল ﷺ-এর নবুয়তের অন্যতম দলিল।

ইমাম মুসলিম রহ. নিজ সনদে (সূত্রে) আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে বর্ণনা করেন, রাসুল ﷺ বলেছেন, যখন মুসলিমদের মধ্যে কলহ ও মতভেদ সৃষ্টি হবে তখন একদল লোক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং এ দুই দলের মধ্যে যারা সত্যের অধিক নিকটবর্তী তারা সেই বিচ্ছিন্ন দলকে হত্যা করবে।[৩০০]

সহিহ বুখারি-তে আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল ﷺ বলেছেন, পূর্বদিক থেকে এমন কিছু লোকের প্রকাশ ঘটবে, যারা কুরআন পাঠ করবে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালি অতিক্রম করবে না। তির যেভাবে শিকার থেকে বেরিয়ে যায়, তেমনইভাবে তারা দ্বীন থেকে বেরিয়ে যাবে। অতঃপর তারা আর ফিরে আসবে না, যে পর্যন্ত তির ধনুকের ছিলায় ফিরে না আসে। জিজ্ঞাসা করা হলো, তাদের চিহ্ন কী? তিনি বললেন, তাদের চিহ্ন হচ্ছে মাথা মুণ্ডানো।[৩০১]

সহিহ বুখারি ও *সহিহ মুসলিম* উভয় গ্রন্থেই বর্ণিত আছে, আলি রা. বলেছেন, আমি যখন তোমাদের কাছে রাসুল ﷺ-এর কোনো হাদিস বর্ণনা করি, আল্লাহর শপথ! তখন তার ওপর মিথ্যা কথা আরোপ করার চেয়ে আকাশ থেকে নিচে পড়ে যাওয়া আমার কাছে শ্রেয়। কিন্তু আমি যদি আমার ও তোমাদের মধ্যকার কোনো বিষয় সম্পর্কে কিছু বলি, তাহলে মনে রাখতে হবে যে, আমি তখন ইজতেহাদ করে বলি। আমি রাসুল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, শেষ যুগে এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে যারা হবে অল্পবয়স্ক

---

২৯৯. **হারুরা :** কুফার নিকটবর্তী একটি এলাকা।-সম্পাদক

৩০০. *সহিহ মুসলিম*, ১০৬৪; *সুনানু আবি দাউদ*, ৪৬৬৭

৩০১. *সহিহ বুখারি*, ৭৫৬২; *আল-মুসনাদ লিল ইমাম আহমাদ*, ১১৬১৪

যুবক ও নির্বোধ। তারা সৃষ্টির সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতম কথা[৩০২] থেকে পাঠ করবে। কিন্তু তাদের ঈমান কণ্ঠনালি অতিক্রম করবে না। তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে, যেমনইভাবে তির শিকার থেকে বেরিয়ে যায়। তোমরা তাদের যেখানেই পাবে সেখানেই হত্যা করবে। নিশ্চয় তাদের হত্যা করলে হত্যাকারীর জন্য কেয়ামতের দিন উত্তম প্রতিদান রয়েছে।[৩০৩]

তাদের ব্যাপারে আরও অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

আলি রা. তাদের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য বের হন। উত্তম পন্থায় তাদের কথার জবাব দেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি তাদের কাছে গিয়ে বলেন, আমাদের ওপর তোমাদের কী আপত্তি?

তারা বলল, আল্লাহ আপনাকে যে নাম দিয়েছেন আপনি তা থেকে সরে গিয়েছেন। (অর্থাৎ, তারা 'আমিরুল মুমিনিন' উপাধিটি উদ্দেশ্য করেছে।) আপনি দ্বীনের ব্যাপারে মানুষের ফয়সালা মেনে নিয়েছেন। অথচ, ফয়সালা একমাত্র আল্লাহ তাআলার।

প্রথমেই বলে রাখি, আমিরুল মুমিনিন আল্লাহ তাআলার দেওয়া নাম নয়। প্রথম উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-কে এই উপাধি দেওয়া হয়েছিল। তাদের প্রথম আপত্তি হচ্ছে, আলি রা. চুক্তিনামায় তার 'আমিরুল মুমিনিন' উপাধিটি মুছে দিতে কেন সম্মত হলেন? দ্বিতীয় আপত্তি হচ্ছে, তিনি দ্বীনের ক্ষেত্রে মানুষের ফয়সালা কেন মেনে নিলেন? লড়াই অব্যাহত রাখাই ছিল আবশ্যক। কারণ, এটিই ছিল আল্লাহ তাআলার নির্দেশ। মীমাংসাকারী দুই ব্যক্তির সিদ্ধান্তের ওপর ভিত্তি করে লড়াই থামিয়ে দেওয়া কিছুতেই ঠিক হয়নি।

তখন আলি রা. বললেন, যারা কুরআন ধারণ করেছে তারাই যেন আমার কাছে আসে।

তখন ৮ হাজার লোক তার কাছে আসে। আলি রা. কুরআনের একটি কপি নিয়ে তা ঝাঁকি দিতে থাকেন। তারা বলে, আপনি এ কী করছেন?

আলি রা. বলেন, আমি কুরআনকে জিজ্ঞাসা করছি।

তারা বলে, এত শুধু কিছু পাতার ওপর কালির সমাহার।

---

৩০২. এ কথা দ্বারা কুরআন বা হাদিসকে বুঝানো হয়েছে।-সম্পাদক

৩০৩. *সহিহ বুখারি*, ৩৬১১; *সহিহ মুসলিম*, ১০৬৬

আলি রা. তার এ কাজের মাধ্যমে বুঝাতে চাচ্ছিলেন যে, কুরআন কোনো বিষয়ে নিজ থেকে সিদ্ধান্ত দিতে পারবে না এবং তা বাস্তবায়ন করতে পারবে না। যারা কুরআন পাঠ করেছেন এবং ভালোভাবে আয়ত্ত করেছেন, তারাই কুরআনের বিধান অনুযায়ী মত ও সিদ্ধান্ত প্রকাশ করবেন।

আলি রা. তাদেরকে বলেন, আল্লাহ তাআলা কুরআনে স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারে বলেন,

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾

> তোমরা যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহ সৃষ্টির আশঙ্কা করো, তবে পুরুষের পরিবার থেকে একজন সালিশ ও নারীর পরিবার থেকে একজন সালিশ পাঠিয়ে দেবে। তারা দুজন যদি মীমাংসা করতে যায় তবে আল্লাহ উভয়ের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সর্বজ্ঞ ও সবকিছু সম্পর্কে অবহিত। [সুরা নিসা : ৩৫]

আলি রা. তাদের বলেন, সুতরাং রাসুল ﷺ-এর উম্মতের এ বিষয়টি স্বামী-স্ত্রীর বিষয় থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি আরও বলেন, আমি 'আমিরুল মুমিনিন' উপাধি মুছে শুধু আলি ইবনে আবু তালেব লেখায় তোমরা আমাকে তিরস্কার করছ, অথচ কুরাইশের সঙ্গে সন্ধির সময় আমরা রাসুল ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। কুরাইশের পক্ষ থেকে সুহাইল ইবনে আমর আসলেন সন্ধি করার জন্য। রাসুল ﷺ বললেন, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম (শুরু করছি পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ তাআলার নামে) লেখো।

তখন সুহাইল বললেন, রহমান কী তা আমরা জানি না। বরং লিখুন 'বিসমিকা আল্লাহুম্মা (হে আল্লাহ, আপনার নামে শুরু করছি), যেমনটি পূর্বে লিখতেন।

মুসলিমগণ বললেন, আল্লাহর শপথ! আমরা 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম'-ই লিখব।

রাসুল ﷺ বললেন, 'বিসমিকা আল্লাহুম্মা' লেখো।

এরপর রাসুল ﷺ বললেন, লেখো এটা সন্ধিচুক্তি, যা আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদ করেছেন।

তখন সুহাইল আবার বললেন, আল্লাহর শপথ! আমরা যদি আপনাকে আল্লাহর রাসুল হিসাবে মানতাম, তবে কখনোই আপনাকে বায়তুল্লায় প্রবেশে বাধা দিতাম না, আপনার সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতাম না। বরং লিখুন, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ।

তখন রাসুল ﷺ বললেন, আল্লাহর শপথ! আপনারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করলেও আমি আল্লাহ তাআলার রাসুল। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ-ই লেখো।[৩০৪]

রাসুল ﷺ তখন সন্ধি পূর্ণ হওয়াকেই অধিক উপযোগী ভেবেছিলেন। এই শর্ত ব্যতীত যদি সন্ধি না হয়, তবে এই শর্ত পালনে কোনো সমস্যা নেই। আলি ইবনে আবু তালেব রা. এখানে রাসুল ﷺ-এরই অনুসরণ করেছেন।

এরপর আলি রা. বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾

> নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ তাআলা ও আখেরাত দিবসের প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহ তাআলাকে বেশি বেশি স্মরণ করে, তাদের জন্য আল্লাহর রাসুলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। [সুরা আহযাব : ২১]

এ কথা শুনেও তাদের মধ্যে কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না। তারা নিজেদের আগের মতেই অটুট থাকল। আলি রা. তাদের কাছে পাঠান হাবরুল উম্মাহ অর্থাৎ উম্মাহর বিজ্ঞ ব্যক্তি খেতাবপ্রাপ্ত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-কে। রাসুল ﷺ তার জন্য দোয়া করেছিলেন, হে আল্লাহ, আপনি তাকে গভীর জ্ঞান দান করুন।

উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বিভিন্ন জটিল বিষয়ে তার সঙ্গে পরামর্শ করতেন। তিনি তাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য এলেন। তখন তার পরনে ছিল একটি নতুন পোশাক। তা দেখে তারা বলে উঠল, আপনি এমন নতুন ও উন্নত পোশাক পরিধান করেছেন!

---

৩০৪. *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, ২৯/১৪৩; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/৩১১

তিনি তাদের বললেন,

﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِيٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَالطَّيِّبَٰتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾

বলুন, আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের যে সৌন্দর্য দিয়েছেন ও যে উত্তম রিজিক দিয়েছেন তা কে হারাম করেছে? [সুরা আরাফ : ৩২]

তখন তাদের মধ্যে ইবনে কাওয়া নামক এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে যায়। সে ছিল একজন বাগ্মী ও সুভাষী আলোচক। সে বলে, ওহে কুরআনের রক্ষকগণ, এই হচ্ছে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস। আপনাদের কেউ যদি তাকে চিনতে না পারেন, তবে আমি তাকে ভালো করেই চিনি। তিনি ওই ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত, যারা কিছু না জেনেই আল্লাহ তাআলার কুরআন নিয়ে তর্কে লিপ্ত হয়। তাদের ব্যাপারেই কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ﴾

বরং তারা হচ্ছে ঝগড়াটে সম্প্রদায়। [সুরা যুখরুফ : ৫৮]

তাই আপনারা তাকে তার সঙ্গীর কাছে পাঠিয়ে দিন। আল্লাহ তাআলার কুরআন নিয়ে তার সঙ্গে কোনো আলোচনা করবেন না।

তখন তাদের মধ্যে কিছু লোক বলল, আল্লাহর শপথ! অবশ্যই আমরা তার সঙ্গে কথা বলব। যদি তিনি সত্য বলেন এবং আমরা তা বুঝতে পারি, তবে তার অনুসরণ করব। আর যদি মিথ্যা বলেন, তবে তা প্রত্যাখ্যান করব।[৩০৫]

অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. সেখানে তিন দিন অবস্থান করেন এবং তাদের সঙ্গে আলোচনা-পর্যালোচনা করেন। দীর্ঘ আলোচনা ও পর্যালোচনার পর তারা জানায়, আলি রা.-এর ব্যাপারে তাদের তিনটি আপত্তি রয়েছে।

এক. তিনি তার 'আমিরুল মুমিনিন' উপাধি মুছতে সম্মত হয়েছেন।

দুই. তিনি আল্লাহ তাআলার কুরআনের ব্যাপারে সালিশ নির্ধারণ করেছেন।

তিন. জঙ্গে জামালে মানুষ হত্যা বৈধ জ্ঞান করার পরও তিনি বন্দি ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টনে অস্বীকার করেছেন।

---

৩০৫. তারিখু মাদিনাতি দিমাশক, ২৭/১ [illegible] য়ান নিহায়া, ৭/৩১১

প্রথম আপত্তির জবাবে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. ও আলি রা.-এর উত্তর ছিল এক। তাদের দ্বিতীয় আপত্তির জবাব দেন কুরআনের দুটি আয়াত দিয়ে। বলেন, এর জবাব কুরআনেই আছে।

তারা বলে, কোথায়?

তিনি বলেন, প্রথম আয়াত যা আলি রা. উল্লেখ করেছেন।

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾

তোমরা যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহ সৃষ্টির আশঙ্কা করো, তবে পুরুষের পরিবার থেকে একজন সালিশ ও নারীর পরিবার থেকে একজন সালিশ পাঠিয়ে দেবে। তারা দুজন যদি মীমাংসা করতে যায় তবে আল্লাহ উভয়ের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সর্বজ্ঞ ও সবকিছু সম্পর্কে অবহিত। [সুরা নিসা : ৩৫]

দ্বিতীয় আয়াত হচ্ছে,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۗ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ﴾

হে মুমিনগণ, তোমরা যখন ইহরাম অবস্থায় থাকো তখন কোনো শিকারকে হত্যা করো না। তোমাদের মধ্যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে তা হত্যা করলে তার বিনিময় দেওয়া ওয়াজিব,(যার নিয়ম এই যে,) সে যে প্রাণী হত্যা করেছে তার সমতুল্য গৃহপালিত কোনো জন্তুকে—যার ফয়সালা করবে তোমাদের মধ্যে দুজন ন্যায়বান লোক—কাবায় পৌঁছানো হবে কুরবানিরূপে। অথবা (তার মূল্য পরিমাণ) কাফফারা আদায় করা হবে মিসকিনদের খাবার খাওয়ানোর দ্বারা অথবা তার সমসংখ্যক রোজা রাখতে হবে, যেন সে ব্যক্তি তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করে। পূর্বে যা-কিছু হয়েছে আল্লাহ তা ক্ষমা করে দিয়েছেন।

যে ব্যক্তি পুনরায় তা করবে আল্লাহ তাকে শাস্তি দেবেন। আল্লাহ ক্ষমতাবান, শাস্তিদাতা। [সুরা মায়িদা : ৯৫]

আল্লাহ তাআলা কুরবানির পশুকে ইহরাম অবস্থায় শিকার হত্যার বিনিময় হিসাবে নির্ধারণ করেননি; বরং তিনি এ বিষয়টি ছেড়ে দিয়েছেন ন্যায়পরায়ণ মুসলিম ব্যক্তিদের ওপর। তারাই ইহরাম অবস্থায় শিকার হত্যাকারীর ফয়সালা করবেন।

তৃতীয় আপত্তি অর্থাৎ জঙ্গে জামালে প্রাণ হত্যা বৈধ জ্ঞান করার পরও বন্দি ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের জবাবে তিনি তাদেরকে বললেন, বন্দিদের মধ্যে উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রা.-ও ছিলেন। এখন আপনারা যদি বলেন তিনি আপনাদের মা নন; তবে আপনারা কুফরি করলেন। যদি আপনাদের মাকে বন্দি করা বৈধ মনে করেন তবেও আপনারা কুফরি করলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এবং তাদের মধ্যে তিন দিনব্যাপী এই আলোচনার পর ৪ হাজার লোক নিজেদের মত থেকে ফিরে আসেন এবং ইবনে আব্বাস রা.-এর হাতে তওবা করেন। পূর্বোক্ত ইবনে কাওয়া নামক ব্যক্তি; যে তাদেরকে ইবনে আব্বাস রা. থেকে সতর্ক করছিল, সেও ফিরে এসে তওবা করে নেয়। আল্লাহ তাআলা তাকে সুপথ দান করেন। তওবাকারীগণ ইবনে আব্বাস রা.-এর সঙ্গে কুফায় ফিরে এসে আলি রা.-এর দলভুক্ত হয়ে যান।[৩০৬]

বাকি যারা নিজেদের মতের ওপর অটল থাকে, তাদের কুফায় আসা-যাওয়া চলতে থাকে। আলি রা. বিভিন্ন প্রতিনিধি পাঠিয়ে তাদের বোঝানোর চেষ্টা অব্যাহত রাখেন, কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। এদিকে চূড়ান্ত ফয়সালার বৈঠকের সময় ঘনিয়ে আসতে থাকে। এবার তারা আলি রা.-এর সঙ্গে অপ্রীতিকর ও অশোভনীয় আচরণ শুরু করে। তর্কবিতর্কের শিষ্টাচার বর্জন করে তারা এবার অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করে। আলি রা. ধৈর্যধারণ করতে থাকেন এবং উত্তমপন্থায় তাদের জবাব দিতে থাকেন, যেন কোনো ফিতনা সৃষ্টি না হয়। পরিস্থিতি ধীরে ধীরে অবনতির দিকে এগুতে থাকে। এমনকি একদিন আলি রা. খুতবা দিচ্ছিলেন, তখন তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি

৩০৬. *তারিখুল ইসলাম*, ৩/১৭৫; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/৩১১

বলে ওঠে, হে আলি, আপনি আল্লাহর দ্বীনের মধ্যে মানুষকে শরিক করেছেন। অথচ ফয়সালা দেওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তাআলার।

চারদিক থেকে স্লোগান ওঠে, ফায়সালা দেওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তাআলার।

তখন আলি রা.-এর মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয় একটি ঐতিহাসিক বাক্য। তিনি বলেন, এই কথাটি সত্য, কিন্তু মতলব খারাপ।

তিনি আরও বলেন, আমার ওপর আপনাদের অধিকার হচ্ছে, যতক্ষণ আপনাদের হাত আমার সঙ্গে আছে আমি আপনাদের গনিমত থেকে বঞ্চিত করব না। আর আপনারা যতক্ষণ লড়াই শুরু না করবেন, আমি আপনাদের ওপর আক্রমণ করব না।[৩০৭]

এবার তারা আলি রা.-কে কাফের সাব্যস্ত করতে শুরু করে। তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি চূড়ান্ত স্পর্ধা দেখিয়ে বলে ওঠে, হে আলি, আপনি যদি শিরক করেন তবে আপনার আমল ধ্বংস হয়ে যাবে এবং আপনি হবেন ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।

তারা আবু মুসা আশআরি রা. ও আমর ইবনুল আস রা.-কে সালিশ হিসাবে নির্ধারণের ব্যাপারটিকে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে শিরক হিসাবে বিবেচনা করে নেয়।

তখন আলি রা. কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন,

﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ﴾

> অতএব, আপনি ধৈর্যধারণ করুন। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রুতি সত্য। যারা অবিশ্বাসী তারা যেন আপনাকে বিচলিত করতে না পারে।
> [সুরা রুম : ৬০]

এরপর তারা সম্পূর্ণরূপে কুফা ত্যাগ করে চলে যায়। নাহরাওয়ান[৩০৮] নামক স্থানে আশ্রয় নেয় এবং সেখানেই অবস্থান করে। এরপর তারা আর কুফায় প্রবেশ করেনি। আলি রা. যখন দেখলেন, তাদের বিষয়টি ক্রমেই গুরুতর হতে শুরু করেছে এবং মুসলিমদের জন্য বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন

---

৩০৭. *তারিখুত তবারি*, ৫/৭৪; *তারিখু ইবনি খালদুন*, ২/৬৩৭

৩০৮. নাহরাওয়ান : ইরাকের একটি এলাকা।-সম্পাদক

তিনি তাদের কাছে দূত পাঠিয়ে বলেন, আমাদের মধ্যে ও অন্যদের মধ্যে কী ঘটেছে, তা তো আপনারা দেখেছেন। তাই আপনারা যেখানে চান সেখানেই শান্তভাবে অবস্থান করুন, যেন মুহাম্মাদ ﷺ-এর উম্মত ঐক্যবদ্ধ হতে পারে। আপনাদের আর আমাদের মধ্যে এ চুক্তি রইল যে, আপনারা কোনো রক্তপাত করবেন না। ডাকাতি করবেন না এবং ইহুদি বা খ্রিষ্টান কোনো জিম্মিকে জুলুম করবেন না। যদি আপনারা এমনটি করেন তাহলে আমরা আপনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা বিশ্বাসঘাতকদের ভালোবাসেন না।[৩০৯]

খারেজিরা কুফা থেকে দূরবর্তী নাহরাওয়ানে অবস্থান করে। এ সময়জুড়ে শামের বাহিনী কোনো বিরোধ ছাড়াই মুআবিয়া রা.-এর পাশে থাকে।

দেখতে দেখতে ৩৭ হিজরির রমজান মাস চলে আসে। তখন আলি রা. ৪০০ সৈন্যের এক বাহিনী পাঠান দুমাতুল জান্দালের উদ্দেশে। সঙ্গে ছিলেন আবু মুসা আশআরি রা. ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.। ইবনে আব্বাস রা.-কে বানানো হয়েছিল তাদের নামাজের ইমাম।

মুআবিয়া রা.-ও দুমাতুল জান্দালের উদ্দেশে পাঠান ৪০০ সৈন্যের এক বাহিনী। সঙ্গে ছিলেন আমর ইবনুল আস রা., আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. ও মুগিরা ইবনে শুবা রা. প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবিগণ। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-ও ছিলেন তাদের সঙ্গে। তিনি মুআবিয়া রা.-এর পক্ষ হয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হননি। তিনি যুদ্ধ থেকে বিরত থাকেন। যদিও তিনি আলি রা.-কেই সত্যের পক্ষে মনে করতেন, তবে তখন তিনি শামে অবস্থান করছিলেন। তাই মুআবিয়া রা.-এর প্রেরিত বাহিনীর সঙ্গে তিনিও আসেন।[৩১০]

কুফা এবং শামের মাঝামাঝি অবস্থানে হওয়ার কারণে দুমাতুল জান্দালকে এই বৈঠকের জন্য নির্বাচন করা হয়েছিল। কুফা এবং শাম উভয় স্থান থেকেই এর দূরত্ব ছিল নয় মাইল করে।

খুব সম্ভব এই বৈঠকে সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা. অংশগ্রহণ করেননি।

---

৩০৯. *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, ২৯/১৪৩; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/৩১১

৩১০. *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, ২৩/৬৭

সালিশ নির্ধারণের অদৃশ্য রহস্য

সালিশ নির্ধারণের বিষয়টি নিয়ে শিয়াদের যে বানোয়াট ও মিথ্যা বর্ণনাগুলো ছড়িয়েছে, সেগুলোর কথা মনে হলে কপাল ঘর্মাক্ত হয়ে যায়। উমাইয়া খেলাফতের সমাপ্তির পর আব্বাসীয় খেলাফতকালে শিয়ারা যখন বেশ শক্তিশালী অবস্থানে ছিল, তখন সেসব বর্ণনাগুলো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। একমাত্র এ ধরনের বর্ণনাগুলোই বইপত্রে স্থান পায়। এমনকি বর্তমানেও বিষয়টি অনেকাংশে এমনই।

এ ব্যাপারে যেসব শিয়া-বর্ণনা রচিত হয়েছে তার অধিকাংশই ছিল আবু মিখনাফ লুত ইবনে ইয়াহইয়ার হাতে। যার ব্যাপারে ইমাম ইবনে হাজার আসকালানি রহ. বলেছেন, লুত ইবনে ইয়াহইয়া হচ্ছে 'তালিফ' অর্থাৎ একেবারে অগ্রহণযোগ্য বর্ণনাকারী, তার ওপর আস্থা রাখা যায় না।

দারাকুতনি রহ. বলেছেন, সে দুর্বল।

ইয়াহইয়া ইবনে মাইন রহ. বলেছেন, সে নির্ভরযোগ্য নয়। আরেকবার তিনি বলেছেন, সে কিছুই নয় অর্থাৎ বর্ণনাকারী হিসাবে তার কোনো নির্ভরযোগ্যতা নেই।

আর ইবনে আদি রহ. তাকে কট্টরপন্থী শিয়া আখ্যা দিয়েছেন।

আবু মিখনাফের বানোয়াট বর্ণনা

আবু মিখনাফের বর্ণনায় পাওয়া যায়, ফয়সালার দিন আমর ইবনুল আস রা. বললেন, এ বিষয়টি একমাত্র সেই ব্যক্তিই সমাধান করতে পারবে যার আক্কেল দাঁত আছে, যা দিয়ে সে খাবার খেতে পারে। ইবনে উমর রা. ছিলেন এ ব্যাপারে অমনোযোগী। ইবনে যুবায়ের রা. তাকে বললেন, মনোযোগী হোন এবং কিছু বলুন, যেন আপনি নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারেন। ইবনে উমর রা. বললেন, আল্লাহর শপথ! এজন্য আমি কখনোই কোনো ঘুষ দিতে রাজি নই (অর্থাৎ তিনি দায়িত্ব নিতে অস্বীকৃতি জানালেন)।

তখন আবু মুসা আশআরি রা. বলেন, আমর ইবনুল আস, আরবের লোকেরা তরবারি নিয়ে মুখোমুখি হওয়ার এবং তিরের আঘাতে বিদ্ধ হওয়ার পর আপনার কাঁধে এ দায়িত্ব এসেছে। তাই আপনি তাদেরকে পূর্বের মতো অথবা তার চেয়ে ভয়ানক ফিতনার মধ্যে ফেলে দেবেন না।

আবু মিখনাফ তার মিথ্যা রচনা পূর্ণ করে বলে, আমর ইবনুল আস রা. আবু মুসা আশআরি রা.-এর কাছে প্রস্তাব পেশ করেন, শুধু মুআবিয়া রা-কেই আমিরুল মুমিনিন নির্বাচিত করা হোক। আবু মুসা আশআরি রা. তা অস্বীকার করেন। এরপর প্রস্তাব পেশ করেন, তাহলে আমার পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আসকে খলিফা নির্বাচন করা হোক। তিনি তাও অস্বীকার করেন। এবার আবু মুসা রা. আমর ইবনুল আস রা.-এর কাছে আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে খলিফা নির্বাচন করার প্রস্তাব দেন। তখন আমর ইবনুল আস রা. তা অস্বীকার করেন। এরপর তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মুআবিয়া ও আলি উভয়কেই অপসারণ করা হবে এবং ব্যাপারটি লোকদের পরামর্শের ওপর ছেড়ে দেওয়া হবে। তারা সবাই মিলে তাদের পছন্দের ব্যক্তিকে নির্বাচন করে নেবে। তারা দুজন জনসম্মুখে আসেন। আমর ইবনুল আস রা. শ্রদ্ধা ও সম্মানবশত আবু মুসা আশআরি রা.-এর আগে যেতেন না। তাই তিনি তাকে বললেন, হে আবু মুসা, আপনি সবাইকে আমাদের মতের ব্যাপারে জানিয়ে দিন। আবু মুসা আশআরি রা. আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন ও দরুদ পাঠ করে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করে বলেন,

হে লোকসকল, আমরা মুসলিম উম্মাহর এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছি। অতঃপর আমি ও আমর যা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এই মুহূর্তে তাই সবচেয়ে উপযোগী ও কল্যাণকর। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আলি এবং মুআবিয়া উভয়কেই অপসারণ করা হবে এবং বিষয়টি লোকদের পরামর্শের ওপর ছেড়ে দেওয়া হবে। তারা সবাই মিলে তাদের পছন্দের ব্যক্তিকে খলিফা নিযুক্ত করে নেবে। অতএব আমি আলি এবং মুআবিয়াকে অপসারণ করলাম, এই বলে তিনি বসে পড়েন।

কোনো কোনো বর্ণনায় আরও মিথ্যা পাওয়া যায়। যেমন, আবু মুসা রা. বলেছেন, আমি তাকে সরিয়ে দিলাম, যেভাবে আমার আঙুল থেকে আংটি সরিয়ে দিই অথবা যেভাবে খাপ থেকে তরবারি সরিয়ে দিই সেভাবে।

এরপর আমর ইবনুল আস রা. আসেন। তিনি আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন ও দরুদ পাঠ করে বলেন,

আবু মুসা আশআরি রা. যা বলেছেন তা তো আপনারা শুনেছেন। তিনি তার সাথিকে (আলি রা.) অপসারণ করেছেন। আমিও তাকে অপসারণ করলাম এবং মুআবিয়াকে বহাল রাখলাম। কারণ, তিনিই উসমান রা.-এর উত্তরসূরি

ও তার রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণের দাবিদার। এই স্থানে তিনিই সবচেয়ে উপযুক্ত।

এ কথা শুনে আলি রা.-এর বাহিনী থেকে শুরাইহ ইবনে হানি নামক ব্যক্তি আমর ইবনুল আস রা.-এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং চাবুক দিয়ে আঘাত করতে থাকেন। তখন ইবনে আমর ইবনুল আস রা. সেই ব্যক্তিকে চাবুক মারা শুরু করেন। অতঃপর উভয় পক্ষের লোকেরাই নিজ নিজ দেশের উদ্দেশে রওনা হয়ে যায়।

আবু মিখনাফ আবু হিবাব আল-কালবি থেকে বর্ণনা করে, আলি রা.-এর কাছে এই সংবাদ পৌছলে তিনি দোয়ায়ে কুনুতের মধ্যে মুআবিয়া রা., আমর ইবনুল আস রা., আবদুর রহমান ইবনে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা., ওয়ালিদ ইবনে উকবা রা. আবুল আওয়ার সুলামি রা. ও যাহহাক ইবনে কায়স রা. প্রমুখকে অভিশাপ দিতে থাকেন। এদিকে মুআবিয়া রা.-এর কাছে এ সংবাদ পৌছলে তিনিও দোয়ায়ে কুনুতে আলি রা., হাসান রা., হুসাইন রা., আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. ও আশতার নাখায়ি প্রমুখকে অভিশাপ দিতে থাকেন।

আবু মিখনাফের এই বর্ণনার পুরোটাই বানোয়াট ও মিথ্যা। ইবনে কাসির রহ. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* গ্রন্থে বলেন, এই বর্ণনা সহিহ নয়।[৩১১]

তা ছাড়া এই বর্ণনাটি সূত্র ও যুক্তি উভয় দিক দিয়েই প্রশ্নবিদ্ধ।

প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার কারণ হলো, এর বর্ণনাকারী লুত ইবনে ইয়াহইয়া হচ্ছে শিয়া ও মিথ্যাবাদী। সে নিজে থেকে মনগড়া হাদিস রচনা করে সাহাবিগণের নামে চালিয়ে দিত। তাই তার সূত্রে যে হাদিস পাওয়া যাবে সেটাই অসত্য, বানোয়াট ও বাতিল।

এমনইভাবে বর্ণনাটি যুক্তিসংগত না হওয়ারও কয়েকটি কারণ রয়েছে। যেমন,

প্রথম কারণ : এই বর্ণনা অনুযায়ী সালিশ সাহাবিদ্বয় আলি রা. ও মুআবিয়া রা. উভয়কেই অপসারণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, মুআবিয়া রা.-কে কোন পদ থেকে অপসারণ করা হবে? তিনি তো নিজেকে খলিফা বা আমিরুল মুমিনিন বলে দাবি করেননি। তার এ লড়াই কোনো শাসক হিসাবে

---

৩১১. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/৩১৫

ছিল না। উভয় পক্ষের কেউই এ কথা বলেননি যে, এখন থেকে মুআবিয়া রা.-ই হলেন আমিরুল মুমিনিন।

দ্বিতীয় কারণ : মুসলিমগণ কখনোই এমন নির্বোধ অথবা অক্ষম ছিলেন না যে, তাদের সামনে শিশুদের মতো এমন খেলা হবে আর তারা কিছু বলবেন না। যেমনটি আমর ইবনুল আস রা.-এর প্রতি সম্পৃক্ত করা হয়েছে, অথচ যা থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত।

তৃতীয় কারণ : সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, দুই সালিশের মধ্যে যে আলোচনা হয়েছে, সেখানে অনেক বিশিষ্ট ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা., আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা., আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা., মুগিরা ইবনে শুবা রা., আহনাফ ইবনে কায়স রা. প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবিগণ। তাহলে মিথ্যাবাদীদের বর্ণনা অনুযায়ী আমর ইবনুল আস রা. যখন দাঁড়ালেন তখন তারা কোথায় ছিলেন?

দুই সালিশের প্রকৃত ঘটনা

অনেক পরামর্শ, আলোচনা ও মতানৈক্যের পর আবু মুসা আশআরি রা. আলি রা.-এর পক্ষকেই সমর্থন করেন। মুআবিয়া রা. ও তার সঙ্গীদের জন্য আলি রা.-এর বাইআত গ্রহণ করা ওয়াজিব বলে মত ব্যক্ত করেন। পরিস্থিতি যখন শান্ত হবে ও ক্ষমতা নিষ্কণ্টক হবে, তখন তিনি উসমান রা.-এর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। কিন্তু আমর ইবনুল আস রা. প্রথমে খুনিদের হত্যা অথবা তাদের হাতে সমর্পণ করার দাবি জানান, যেন তারা তাদের হত্যা করে উসমান রা.-এর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারেন। এরপর তারা বাইআত গ্রহণ করবেন। এ ব্যাপারে অনেক আলোচনা করেও যখন মীমাংসা হলো না, তখন তারা খেলাফতের বিষয়টি ছেড়ে দেন বেশ কিছু বিশিষ্ট সাহাবির ওপর। তাদের মধ্যে আলি রা.-ও ছিলেন। কারণ, তিনি ছিলেন প্রথমদিকে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে অন্যতম। মুআবিয়া রা. ও আমর ইবনুল আস রা.-কে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। কারণ, তারা প্রথমদিকের ইসলাম গ্রহণকারী ছিলেন না। বিশিষ্ট সাহাবিগণ প্রয়োজন বোধ করলে তাদের সহযোগিতা নেবেন। অন্যথায় সহযোগিতা নেবেন না।

সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, আগামী বছর দুমাতুল জান্দালে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। ওই সকল বিশিষ্ট সাহাবি এখান থেকে

গিয়ে এ ব্যাপারে চিন্তাভাবনা ও আলোচনা করবেন। এ ব্যাপারে সবচেয়ে উপযুক্ত কে হবেন তা বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত দেবেন। আলি রা.-ই যে এ ব্যাপারে সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি হবেন তারই ছিল জোর সম্ভাবনা। কারণ, এসব সাহাবি এর আগে আলি রা.-কেই নির্বাচিত করেছেন, তার ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে তাদের কোনো আপত্তি নেই। তবে আমর ইবনুল আস রা. মনে করতেন, আলি রা.-এর খেলাফত গ্রহণের পর যেসব ঘটনা ঘটেছে, তা দেখে হয়তো লোকদের মত পালটাতে পারে।

পুনরায় বৈঠকের সময় আসা পর্যন্ত আলি এবং মুআবিয়া রা. উভয়েই নিজ নিজ নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলসমূহ শাসন করবেন। নতুন খলিফা নির্বাচন করার পর সকলকেই তার অনুসরণ করতে হবে। চাই তিনি প্রথমে উসমান রা.-এর প্রতিশোধ নেন অথবা তা বিলম্বিত করেন।

এ কথা স্পষ্ট যে, বাহ্যিকভাবে এই সিদ্ধান্তটি আলি রা.-এর অনুকূলেই ছিল। এর বিশেষ কারণ হচ্ছে, মুআবিয়া রা. ও আমর ইবনুল আস রা. উভয়েই সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি থেকে সম্পূর্ণরূপে বাইরে থাকবেন এবং নতুন খলিফা নির্বাচনে তারা কোনো হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না।

মুসলিমরা এ বিষয়টি নিয়ে বিভক্ত থাকলেও বিশিষ্ট সাহাবিগণ কর্তৃক নতুন খলিফা নির্বাচনের সিদ্ধান্তে তারা সকলেই সন্তুষ্ট হন। আলি রা.-এর কাছে এই সংবাদ পৌঁছলে তিনি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। এমনইভাবে মুআবিয়া রা.-ও সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

কিন্তু শিয়াদের মিথ্যা বর্ণনার ভাষ্য হচ্ছে, এ সংবাদ শুনে আলি রা. ক্রুদ্ধ হয়ে পড়েন এবং মুআবিয়া রা. ও তার বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য সেনাবাহিনী প্রস্তুত করতে শুরু করেন। অথচ এমনটি আদৌ ঘটেনি।

***

আলি রা.-এর হত্যাকাণ্ড

সালিশ নির্ধারণের বিষয়টি সম্পন্ন হওয়ার পর খারেজিদের দৌরাত্ম্য আরও বেড়ে যায়। তারা দুজন লোক প্রেরণ করে আলি রা.-কে বলে, আলি, ফয়সালা দেওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তাআলার।

তিনি বলেন, অবশ্যই। ফয়সালা দেওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তাআলার।

আলি রা. আগেই বলেছিলেন, এই কথাটি সত্য। তবে তাদের মতলব খারাপ। খারেজিরা এর ভুল ব্যাখ্যা করে।

তখন খারেজিদের প্রেরিত দুই ব্যক্তি বলে, আপনি আপনার ভুলের জন্য তওবা করুন এবং আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে চলুন। আমরা তাদের সঙ্গে রবের সাক্ষাৎ পর্যন্ত লড়াই করে যাব।

আলি রা. বললেন, আমাদের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে চুক্তিসম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ﴾

> যখন তোমরা কোনো অঙ্গীকার করো, তখন আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করো। [সুরা নাহল : ৯১]

তাদের একজন বলল, আলি, আপনি যদি আল্লাহর কিতাবে মানুষের ফয়সালার বিষয়টি পরিত্যাগ না করেন, তাহলে অবশ্যই আমরা আপনার সঙ্গে লড়াই করব। এর মাধ্যমে আমরা আল্লাহ তাআলার দয়া ও সন্তুষ্টি কামনা করব।

আলি রা. বললেন, ধ্বংস হও, কতই-না দুরাচারী তুমি। এমনভাবে বলছ, যেন আমি তোমার সামনে নিহত হয়ে পড়ে থাকব আর তোমার ওপর সুশীতল বাতাস বয়ে যাবে!

লোকটি বলে, আমি চাই এমনটিই হোক।

আলি রা. বললেন, যদি তুমি সত্যবাদী হতে তাহলে দুনিয়া রেখে মৃত্যুর মধ্যেই সান্ত্বনা খুঁজতে, কিন্তু শয়তান তোমাদের গ্রাস করে নিয়েছে।

এ দুজন ফিরে গিয়ে লোকদের আলি রা.-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উদ্‌বুদ্ধ করতে শুরু করে।[৩১২]

তারা প্রকাশ্যে আলি রা., মুআবিয়া রা., আমর ইবনুল আস রা. ও আবু মুসা আশআরি রা. প্রমুখ সাহাবিকে কাফের সাব্যস্ত করে। এমনইভাবে যারা সালিশ নির্ধারণের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়েছে, তাদের সকলকেই কাফের সাব্যস্ত করে। আর যারা কুফরি করে তাদের হত্যা করা ওয়াজিব। কারণ, সেই ব্যক্তি এখন ধর্মত্যাগী হয়ে গিয়েছে। এভাবেই তারা সালিশ নির্ধারণে সম্মত সকলের হত্যাকে বৈধ মনে করে। তারা সকলে তাদের অন্যতম নেতা আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব রাসিবির বাড়িতে সমবেত হয়। ইবনে ওয়াহাব রাসিবি তাদের সামনে জ্বালাময়ী বক্তৃতা প্রদান করে। তাদেরকে দুনিয়া থেকে বিমুখ হয়ে আখেরাত ও জান্নাতমুখী হতে উৎসাহিত করে। সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করার প্রতি উৎসাহ দেয়। অতঃপর তাদের বলে, অতএব, চলুন এই অত্যাচারী জনপদ থেকে বেরিয়ে আমরা সামনের জনপদের দিকে এগিয়ে যাই।

খারেজিগোষ্ঠী ও নাহরাওয়ান যুদ্ধ

ওই সকল খারেজি নাহরাওয়ান নামক স্থানে সমবেত হয়। তাদের মতো অন্য যত দল রয়েছে, তাদের আহ্বান জানানো শুরু করে। বলে, এই সালিশ নির্ধারণের প্রতিবাদ জানাতে আমাদের বের হওয়া আবশ্যক।

অতঃপর তাদের আরেক নেতা দাঁড়িয়ে বলতে থাকে, ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার ভোগবিলাস খুবই অল্প। আমাদের বিচ্ছেদ অত্যাসন্ন। তাই দুনিয়ার চাকচিক্য ও সৌন্দর্য যেন আপনাদেরকে এখানে অবস্থানে উদ্‌বুদ্ধ না করে, সত্যের অন্বেষণ ও অন্যায়ের প্রতিবাদ থেকে যেন আপনাদেরকে পিছিয়ে না দেয়। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা খোদাভীরু ও সৎকর্মশীলদের সঙ্গে আছেন।[৩১৩]

এরপর যায়দ ইবনে হিসন তায়ি দাঁড়িয়ে তাদের সামনে কুরআনের অনেক আয়াত তেলাওয়াত করে। যেমন,

---

৩১২. *তারিখুত তবারি*, ৫/৭২; *আল-কামিল ফিত তারিখ*, ২/৬৮৫; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/৩১৫
৩১৩. *আল-কামিল ফিত তারিখ*, ২/৬৮৫; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/৩১৬

﴿يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌۢ بِمَا نَسُوا۟ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ﴾

হে দাউদ, আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি। অতএব, তুমি মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার করো এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। এ কারণে যে, তারা হিসাব দিবসকে ভুলে গিয়েছে। [সুরা সদ : ২৬]

এ আয়াতের দ্বারা সে আলি রা.-কে উদ্দেশ্য করে। সে আরও তেলাওয়াত করে,

﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ﴾

আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, সে অনুযায়ী যারা ফয়সালা করে না তারা কাফের। [সুরা মায়িদা : ৪৪][৩১৪]

অতএব, আলি রা. ও তার সঙ্গীরা কুফরি করেছে। মুআবিয়া রা. ও তার সঙ্গীরাও কুফরি করেছে। তারা নিজেদের মতলব অনুযায়ী আয়াতগুলোকে ব্যাখ্যা করতে থাকে। অতঃপর আরেক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে তাদের জিহাদের ব্যাপারে উৎসাহিত করতে থাকে। এই বক্তব্যে প্রভাবিত হয়ে আবদুল্লাহ ইবনে সাখবারাহ সুলামি নামক এক ব্যক্তি কান্না করে দেয়। সে লোকদেরকে তাদের দাবি অনুযায়ী ওই সকল কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বের হতে উদ্‌বুদ্ধ করে বলে, আপনারা বের হোন এবং তাদের চেহারা ও কপালে তরবারি দ্বারা আঘাত করুন। এতেই দয়াময় আল্লাহ তাআলার আনুগত্য হবে। যদি আপনারা বিজয়ী হন এবং আপনাদের ইচ্ছা অনুযায়ী আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করতে সক্ষম হন, তাহলে তিনি আপনাদেরকে তার অনুগত বান্দা ও যারা তাঁর বিধান অনুযায়ী আমল করে তাদের মতো সওয়াব প্রদান করবেন। আর যদি নিহত হন তাহলে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও তাঁর জান্নাত অভিমুখে যাত্রার চেয়ে উত্তম আর কী হতে পারে?

---

৩১৪. *আল-কামিল ফিত তারিখ*, ৬/৬৮৬; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/৩১৬

এভাবেই তারা লোকদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য উদ্‌বুদ্ধ করতে থাকে, তাদের দৃষ্টিতে যারা কাফের হয়ে গিয়েছে।[৩১৫]

ইবনে কাসির রহ. তাদের এই অবস্থানের ব্যাপারে বলেন, ওই সকল খারেজি ছিল সবচেয়ে অদ্ভুত ও আশ্চর্য প্রকৃতির। আল্লাহর প্রশংসা, তিনি নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী নানা প্রকারের জীব সৃষ্টি করেছেন।[৩১৬]

অনেক আলেমগণের ভাষ্যমতে, তারা হচ্ছে ওই সকল লোক, যাদের ব্যাপারে কুরআনের এই কথাকে প্রয়োগ করা যায়,

﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ○ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ○ أُولَٰٓئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِهٖ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا﴾

বলে দাও, আমি কি তোমাদেরকে বলে দেবো, কর্মে কারা সর্বাপেক্ষা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত? তারা সেই সব লোক, পার্থিব জীবনে যাদের সমস্ত দৌড়ঝাঁপ সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, অথচ তারা মনে করে তারা খুবই ভালো কাজ করছে। এরাই সেই সব লোক, যারা নিজ প্রতিপালকের আয়াতসমূহ ও তাঁর সামনে উপস্থিতির বিষয়টিকে অস্বীকার করে। ফলে তাদের যাবতীয় কর্ম নিষ্ফল হয়ে গিয়েছে। আমি কেয়ামতের দিন তাদের কোনো ওজন গণ্য করব না।

[সুরা কাহ্‌ফ : ১০৩-১০৫]

অতঃপর তারা বাহিনী প্রস্তুত করে কুফার উত্তর-পূর্বদিকে অবস্থিত মাদায়েনের উদ্দেশে বের হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তবে মাদায়েনের শক্তি ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কারণে সিদ্ধান্ত পালটে কুফার নিকটবর্তী অপর একটি স্থানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। অতঃপর তারা যাত্রা শুরু করে এবং পথিমধ্যে যেসব মুসলিমদের দেখতে পায় তাদের হত্যা করতে শুরু করে; এই যুক্তিতে যে, যারা সালিশ নির্ধারণে সন্তুষ্ট হয়েছে তারা কাফের ও মুরতাদ। ফলে

৩১৫. *আল-কামিল ফিত তারিখ*, ৬/৬৮৬
৩১৬. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/৩১৬

তাদেরকে হত্যা করা ওয়াজিব হয়ে গিয়েছে। এ সময় তারা খাব্বাব ইবনে আরাত রা.-এর পুত্র আবদুল্লাহ রা. ও তার গর্ভবতী স্ত্রীকে হত্যা করে।[৩১৭]

তাদের অত্যাচার ও দৌরাত্ম্য বেড়ে গেলে আলি রা. তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এক বিরাট বাহিনী নিয়ে তাদের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েন। বর্ণনাকারীগণের মধ্যে বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা নিয়ে মতভেদ থাকলেও খারেজিদের তুলনায় তারা যে অনেক বেশি ছিলেন এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

যুদ্ধ শুরুর আগে আলি রা. যুদ্ধের অনিষ্ট থেকে মুসলিমদের বাঁচানোর লক্ষ্যে খারেজিদের কাছে বার্তা প্রেরণ করে তাদেরকে আনুগত্যে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়ে বলেন, তোমরা আমিরের আনুগত্যের দিকে ফিরে এসো। তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন। যারা কোনো মুসলিমকে হত্যা করেছে তাদের তিনি হত্যার শাস্তি দেবেন আর যারা হত্যা করেনি তাদের ছেড়ে দেবেন।

তখন সকল খারেজি এক হয়ে জানায়, আমরা সবাই মিলে আপনার ভাইদের হত্যা করেছি। আমরা তাদের হত্যাকে বৈধ মনে করেছি এবং আপনাদের হত্যা করাকেও বৈধ মনে করি।

এবার আলি রা. নিজে গিয়ে তাদেরকে উপদেশ দিতে থাকেন। বলেন, তোমরা যে আনুগত্য থেকে বেরিয়ে গিয়েছ, সেদিকে ফিরে এসো। হারাম কাজে লিপ্ত হয়ো না। নিশ্চয় তোমাদের প্রবৃত্তি তোমাদের জন্য এমন বিষয় সাজিয়ে দিয়েছে, যার ভিত্তিতে তোমরা মুসলিমদের সঙ্গে লড়াই করতে উদ্যত হয়েছ। আল্লাহর শপথ! তোমরা যদি এমনটি মনে করে একটি মুরগিও হত্যা করো, তাও আল্লাহ তাআলার নিকট অনেক গুরুতর হিসাবে গণ্য হবে। তাহলে মুসলিমদের হত্যা করা কতটা গুরুতর হতে পারে তা ভেবে দেখো।

এ কথার বিপরীতে তাদের কাছে কোনো জবাব ছিল না। তারা নিজেদের মধ্যে বলতে থাকে, তাদের সঙ্গে (আলি রা. ও তার বাহিনীর সঙ্গে) কোনো কথা বলো না। আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুত হও। জান্নাতের দিকে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হও। এই ছিল তাদের স্লোগান।

---

৩১৭. *তারিখুল ইসলাম*,৩/১৭৪; *আল-কামিল ফিত তারিখ*, ২/৬৯১

এরপর আলি রা. তার বাহিনীকে বিন্যস্ত করেন। প্রসিদ্ধ সাহাবি আবু আইয়ুব আনসারি রা.-এর হাতে তুলে দেন নিরাপত্তা পতাকা এবং বলেন, যারা এই পতাকা তলে আশ্রয় গ্রহণ করবে তারা নিরাপদ। এর মাধ্যমে তার আশা ছিল, যেন নিহতের সংখ্যা কম হয়।[৩১৮]

পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, খারেজিদের সংখ্যা শুরুতে ছিল ১২ হাজার। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর সঙ্গে আলোচনার পর তাদের মধ্য থেকে ৪ হাজার লোক তওবা করে নেয় এবং আলি রা.-এর আনুগত্যে ফিরে আসে। এরপর আরও তর্কবিতর্ক এবং আলোচনার পর ফিরে আসে আরও ৪ হাজার। শুধু ৪ হাজার লোক নিজেদের মতের ওপর অটল থাকে।

উভয় বাহিনী লড়াইয়ের জন্য মুখোমুখি হয়ে যায়। লড়াই শুরু হবে হবে এমন সময়ে আলি রা. আবার তাদের কাছে এসে বলেন, এই দেখো আবু আইয়ুব আনসারি রা.-এর হাতে নিরাপত্তা পতাকা। যারা এর অভিমুখী হবে তারা নিরাপদ, যারা কুফায় ফিরে যাবে তারাও নিরাপদ এবং যারা মাদায়েনের দিকে যাবে তারাও নিরাপদ।[৩১৯]

তখন তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ চক্রান্ত ও যুদ্ধ কৌশল হিসাবে ফিরে যায়। যাতে পরবর্তী সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে পারে। আবার অনেকে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ফিরে যায়। তাদের মধ্যে যারা আবু আইয়ুব আনসারি রা.-এর পতাকা অভিমুখী হয় এবং যারা কুফা অথবা মাদায়েনের দিকে ফিরে যায় আলি রা.-এর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাদের ছেড়ে দেন। তখন তাদের দলে অবশিষ্ট থাকে মাত্র ১ হাজার লোক। যারা আলি রা. এবং তার বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য অটল থাকে। অধিকাংশ বর্ণনা অনুযায়ী সেদিন আলি রা.-এর বাহিনী সংখ্যায় ছিল ৬০ থেকে ৬৮ হাজার। আলি রা. তাদের হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন।

এখানে আমরা উল্লেখ করতে চাই যে, রাসুল ﷺ পূর্বেই এই অদ্ভুত দলটির আত্মপ্রকাশের ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন। ইমাম মুসলিম রহ. যায়দ ইবনে ওয়াহাব জুহানি রহ. (যে সৈন্যদল আলি রা.-এর সঙ্গে খারেজিদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছিল, তিনি তাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন) থেকে বর্ণনা করেন যে, আলি রা. বলেন, লোকসকল, আমি রাসুল ﷺ-কে বলতে শুনেছি,

---

৩১৮. *তারিখুত তবারি*, ৫/৮৫; *আল-কামিল ফিত তারিখ*, ২/৬৯৫; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/৩১৯

৩১৯. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/৩১৯; *তারিখু ইবনি খালদুন*, ২/৬৪০

আমার উম্মতের মধ্যে এমন একটি দলের আবির্ভাব ঘটবে, যারা কুরআন তেলাওয়াত করবে। তোমাদের তেলাওয়াত তাদের তেলাওয়াতের তুলনায় তুচ্ছ হবে। অনুরূপভাবে তাদের নামাজ ও রোজার তুলনায় তোমাদের নামাজ ও রোজা সামান্য বলে মনে হবে। কুরআন তেলাওয়াত করে তারা ধারণা করবে, এতে তাদের পুণ্য হচ্ছে। অথচ তা তাদের জন্য ক্ষতিরই কারণ হবে। তাদের নামাজ তাদের কণ্ঠনালি অতিক্রম করবে না।[৩২০] তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে, যেমনটি তির বেরিয়ে যায় শিকার থেকে। আর যে সৈন্যদল তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাবে, তারা যদি তাদের ব্যাপারে রাসুল ﷺ-এর কৃত ওয়াদা সম্পর্কে জানতে পারত, তাহলে তারা অন্য আমল বাদ দিয়ে এ কাজের (পুরস্কারের) ওপরই ভরসা করে বসে থাকত। সে দলের চিহ্ন হলো তাদের মধ্যে এমন এক লোক থাকবে যার হাতের অগ্রভাগ থাকবে না, কিন্তু বাহু থাকবে। বাহুর অগ্রভাগে স্ত্রীলোকের স্তনের বোঁটার ন্যায় একটি মাংসপিণ্ড থাকবে। এর ওপর থাকবে সাদা পশম।[৩২১]

সহিহ বুখারি এবং *মুসলিম* উভয় গ্রন্থেই বর্ণিত আছে, আলি রা. বলেছেন, আমি যখন তোমাদের কাছে রাসুল ﷺ-এর কোনো হাদিস বর্ণনা করি, আল্লাহর শপথ! তখন তাঁর ওপর মিথ্যা আরোপ করার চেয়ে আকাশ থেকে নিচে পড়ে যাওয়াটা আমার কাছে শ্রেয়। কিন্তু আমি যদি আমার ও তোমাদের মধ্যকার কোনো বিষয় সম্পর্কে কিছু বলি, তাহলে মনে রাখতে হবে যে, আমি তখন ইজতেহাদ করে বলি। আমি রাসুল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, শেষ যুগে এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে, যারা হবে অল্পবয়স্ক যুবক ও নির্বোধ। তারা সৃষ্টির সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতম কথা থেকে আবৃত্তি করবে। কিন্তু তাদের ঈমান কণ্ঠনালি অতিক্রম করবে না। তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে, যেমনইভাবে তির শিকার থেকে বেরিয়ে যায়। তোমরা তাদের যেখানেই পাবে সেখানেই হত্যা করবে। নিশ্চয় তাদের হত্যা করলে হত্যাকারীর জন্য কেয়ামতের দিন উত্তম প্রতিদান রয়েছে।[৩২২]

---

৩২০. অর্থাৎ তাদের দোয়া কবুল হবে না। *আল-মুফহিম লিমা আশকালা মিন তালখিসি মুসলিম*, ৩/১১৮ (শামেলা)-সম্পাদক

৩২১. *সহিহ মুসলিম*, ১০৬৬; *সুনানু আবি দাউদ*, ৪৭৬৮

৩২২. *সুনানু আবি দাউদ*, ৪৭৬৫; *আল-মুসনাদ লিল ইমাম আহমাদ*, ১৩৩৩৮

ইমাম আহমাদ রহ. তারিক ইবনে যিয়াদ রহ.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, আমরা আলি রা.-এর সঙ্গে খারেজিদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বের হলাম। অতঃপর আলি রা. তাদের হত্যা করলেন এবং বললেন, লক্ষ করো, নিশ্চয় রাসুল ﷺ বলেছেন, অচিরেই এমন একটি দলের আবির্ভাব হবে, যারা সত্য কথা বলবে। কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালি অতিক্রম করবে না। যেমনইভাবে তীর শিকার থেকে বেরিয়ে যায় তেমনইভাবে তারা সত্য থেকে বেরিয়ে যাবে। তাদের চিহ্ন হচ্ছে, তাদের মধ্যে কালো এক লোক থাকবে, যার হাত হবে অসম্পূর্ণ। আর তার হাতে থাকবে অনেকগুলো কালো পশম। যদি তাকে হত্যা করতে পারো, তবে তোমরা সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ হত্যা করলে।[৩২৩]

সুনানু আবি দাউদ গ্রন্থে আবু সাইদ খুদরি রা. ও আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেছেন, অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে মতানৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টি হবে। একদল লোক সুন্দর কথা বলবে, কিন্তু তাদের কাজ হবে মন্দ। তারা কুরআন তেলাওয়াত করবে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালি অতিক্রম করবে না। তারা দ্বীন থেকে বেরিয়ে যাবে, যেভাবে শিকার থেকে তির বেরিয়ে যায়। নিক্ষিপ্ত তির যেমন ছিলার দিক ফিরে আসে না, তেমনই তারাও আর দ্বীনে ফিরে আসবে না। তারা সৃষ্টিজীবের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট। তাদের যারা হত্যা করবে এবং যারা তাদের হাতে নিহত হবে তাদের জন্য সুসংবাদ। তারা আল্লাহ তাআলার কিতাবের (কুরআনের) দিকে আহ্বান করবে। অথচ তারা মোটেও আল্লাহর কিতাবের (কুরআনের) অনুসারী হবে না। যারা তাদের হত্যা করবে তারা তাদের তুলনায় আল্লাহ তাআলার অধিক নিকটবর্তী হবে।

সাহাবিগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, তাদের চিহ্ন কী?

তিনি বললেন, মাথা মুণ্ডানো।[৩২৪]

এমন অনেক হাদিস অনেক সাহাবি থেকে বর্ণিত হয়েছে। যেগুলো রাসুল ﷺ-এর নবুয়তের অকাট্যতা প্রমাণ করে।

ইমাম আহমাদ রহ. আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা রাসুল ﷺ-এর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। অতঃপর তিনি তাঁর কোনো

---

৩২৩. *আল-মুসনাদ লিল ইমাম আহমাদ*, ৮৪৮; *আস-সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ি*, ৮৫১৩

৩২৪. *সুনানু আবি দাউদ*, ৪৭৬৫; *আল-মুসনাদ লিল ইমাম আহমাদ*, ১৩৩৩৮

এক স্ত্রীর ঘর থেকে বেরিয়ে আমাদের কাছে আসেন। আবু সাইদ রা. বলেন, অতঃপর আমরা তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেলাম। এমন সময় তাঁর জুতা ছিঁড়ে গেলে আলি রা.-কে তা সেলাই করতে দিলেন। অতঃপর তিনি চলতে থাকেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে চলতে থাকি। এরপর তিনি আলি রা.-এর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে যান। আমরাও দাঁড়িয়ে যাই। তখন তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি আছে, যে কুরআনের ব্যাখ্যার ওপর ভিত্তি করে লড়াই করবে। যেমনইভাবে আমি লড়াই করেছি কুরআনে অবতীর্ণ বিধানের ওপর ভিত্তি করে। এ কথা শুনে আমরা কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকালাম। তখন আমাদের মধ্যে আবু বকর রা. ও উমর রা.-ও ছিলেন। তখন রাসুল ﷺ বললেন, না। বরং যে জুতা সেলাই করছে সে-ই হবে সেই ব্যক্তি।

আবু সাইদ খুদরি রা. বলেন, অতঃপর আমরা তাকে সুসংবাদ জানাতে এলাম। তখন মনে হলো তিনি আগেই শুনে ফেলেছেন। আলবানি রহ. হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।[৩২৫]

এসব হাদিসে তাদের জন্য জান্নাত ও মহান সওয়াবের সুসংবাদ রয়েছে, যারা খারেজিদের হত্যা করবে। আলি রা. তার বাহিনীকে লড়াইয়ে উদ্‌বুদ্ধ করে বক্তব্য প্রদান করেন। অতঃপর লড়াই শুরু হয়ে যায়। সেদিন তারা বিস্ময়করভাবে অটল থেকে লড়াই করে। তাদের মধ্য থেকে ৬০০জন নিহত হয় এবং ৪০০জন হয় আহত।

আবু আইয়ুব আনসারি রা. বলেন, আমি খারেজিদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে তির নিক্ষেপ করে পিঠে বিদ্ধ করে দিলাম। এরপর তার মৃত্যু হয়ে গিয়েছে ভেবে তার কাছে গিয়ে বললাম, হে আল্লাহর শত্রু, জাহান্নামের সুসংবাদ গ্রহণ করো।

লোকটি বলে উঠল, অচিরেই জানতে পারবে কারা আল্লাহ তাআলার কাছাকাছি থাকবে।[৩২৬]

সে তার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিজের মতের ওপর অটল ছিল।

---

৩২৫. *আল-মুসনাদ লিল ইমাম আহমাদ*, ১১৭৭৩; *মুসনাদু আবি ইয়ালা*, ১০৮৬

৩২৬. *তারিখুত তবারি*, ৫/৮১; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/৩২০; *আল-কামিল ফিত তারিখ*, ২/৬৯৫

যুদ্ধ শেষে আলি রা. খুব দ্রুত আহত ৪০০জনকে চিকিৎসার জন্য তার স্বজনদের হাতে তুলে দেন এবং তাদের সম্পদ ফিরিয়ে দেন। তাদের পুনরায় তওবা করার সুযোগ প্রদান করেন। এই যুদ্ধ নাহরাওয়ানের যুদ্ধ নামে পরিচিতি লাভ করে।

কিন্তু রাসুল ﷺ তাদের যে আলামতের কথা বলেছেন, অর্থাৎ তাদের মধ্যে স্তনের মতো বাহুধারী এক ব্যক্তি থাকবে, সেই ব্যক্তিকে খোঁজ করা তখনও বাকি ছিল। তখন আলি রা. তার বাহিনী থেকে কিছু লোককে পাঠান সেই ব্যক্তিকে খুঁজে বের করার জন্য। তারা না পেয়ে ফিরে আসে। তখন আলি রা. অত্যন্ত নিশ্চয়তার সঙ্গে বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি মিথ্যা বলিনি এবং আমাকে মিথ্যা বলা হয়নি। রাসুল ﷺ-এর ওপর মিথ্যারোপ করার চেয়ে আকাশ থেকে পড়ে যাওয়াই আমার জন্য অধিক শ্রেয়। তোমরা আবার গিয়ে খুঁজে দেখো। অচিরেই তাকে পেয়ে যাবে।'

তারা আবার ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। আলি রা. আগের কথার পুনরাবৃত্তি করেন এবং তৃতীয়বারের মতো তাদেরকে পাঠান। অতঃপর নদীর তিরে নিহতদের জটলায় তাকে খুঁজে পাওয়া যায়। তারা তাকে বের করে নিয়ে আসে। লোকটি ছিল কুচকুচে কালো। তার থেকে বেরোচ্ছিল দুর্গন্ধ। তার মধ্যে তারা রাসুল ﷺ-এর বলা আলামত খুঁজে পায়।

আলি রা. এ সংবাদ শুনে আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতায় সেজদায় লুটিয়ে পড়েন। তার সঙ্গে উপস্থিত সকলেই আল্লাহ তাআলার শুকরিয়াস্বরূপ দীর্ঘ সেজদা করেন।[৩২৭] কারণ, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ওই সকল খারেজিদের হত্যা করার তাওফিক দিয়েছেন।

বিশুদ্ধতম মতানুসারে, ৩৭ হিজরির শেষে এবং ৩৮ হিজরির শুরুরদিকে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

যে-সকল খারেজি যুদ্ধ থেকে ফিরে গিয়ে আবু আইয়ুব আনসারি রা.-এর পতাকাতলে আশ্রয় নিয়েছিল অথবা কুফা বা মাদায়েনে ফিরে গিয়েছিল, তাদের কেউই তাদের বাতিল মনে করে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকেনি। কেউ ফিরে গিয়েছিল ভয়ে। কেউ ফিরে গিয়েছিল মনে ক্ষোভ পুষে রেখে। আবার কেউ ফিরে গিয়েছিল উপযুক্ত সময়ে অপর একটি লড়াইয়ের চিন্তা মাথায়

---

৩২৭. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/৩২২

নিয়ে। ৩৮ হিজরির পুরো বছরজুড়ে তারা আলি রা.-এর বিরুদ্ধে একের পর এক বিদ্রোহ করতে থাকে। নাহরাওয়ানের যুদ্ধে খারেজিদের ৬০০জন নিহত এবং ৪০০জন আহত হওয়ার পর হারিস ইবনে রাশেদ নাজি নামক এক ব্যক্তি স্বগোত্রীয় কিছু লোকদের নিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসে। সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করে বলে, ফয়সালা দেওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহর। আলি রা. তাদের প্রতিরোধ করেন। তাদের মধ্যে অনেকেই নিহত হয়। এমনইভাবে আশহাব ইবনে বিশর বাজালি ও আরও অনেকেই বিদ্রোহ ঘোষণা করে। আলি রা. তাদেরও শক্ত হাতে প্রতিরোধ করেন।[৩২৮] খারেজিরা আলি রা.-এর বিরুদ্ধে কুফার পরিস্থিতি সর্বদাই অস্থির করে রাখে। এদিকে আলি রা.-এর বাহিনীতে যারা ছিল, তারাও ঠিকভাবে আলি রা.-এর আনুগত্য করত না। সর্বদাই তারা আলি রা.-এর অবাধ্যাচারণ করত এবং তার মতামতের ওপর আপত্তি করতে থাকত। অথচ তিনি তখন পৃথিবীর সর্বোত্তম মানুষ ছিলেন।

এদিকে শামের পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন। এখানকার সবাই মুআবিয়া রা.-কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মেনে চলত। তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার মতো কোনো পরিস্থিতি এখানে ছিল না।

আলি রা.-এর প্রতি এ ছিল আল্লাহ তাআলার কঠিন পরীক্ষা।

মিশরের পরিস্থিতি

মিশর ছিল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে। এ সময় আলি রা.-এর পক্ষ থেকে মিশরের গভর্নর ছিলেন মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর রা.। তবে তিনি মিশরের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। বিশেষ করে সিফফিনের যুদ্ধ এবং আলি রা.-এর বিরুদ্ধে খারেজিদের বিদ্রোহের পর মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর রা.-এর নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মুআবিয়া রা. ও আমর ইবনুল আস রা-এর সমর্থকদের শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। যাদের দাবি ছিল, প্রথমে উসমান রা.-এর খুনিদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে হবে, তারপর আলি রা.-এর হাতে বাইআত গ্রহণ করা হবে। মিশরে মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর রা.-এর নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হওয়ার কারণ ছিল দুটি।

৩২৮. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/৩৪৩; *আল-কামিল ফিত তারিখ*, ২/৭২২

এক. মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর রা. তখন ছিলেন অল্পবয়স্ক। মিশরের গভর্নর হিসাবে নিযুক্তির সময় তার বয়স ২৬-ও পার হয়নি।

দুই. মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর রা.-কে গভর্নর হিসাবে নিয়োগ প্রদানের বাইআত গ্রহণের পূর্বে উসমান রা.-এর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের পক্ষাবলম্বীদের মনে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। কারণ, উসমান ইবনে আফফান রা.-কে যারা অবরুদ্ধ করে রেখেছিল, তাদের মধ্যে তিনিও ছিলেন। অর্থাৎ তিনি ফিতনাবাজদের সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু আমরা উল্লেখ করেছি, তিনি তার এ কাজের জন্য অনুতপ্ত হয়েছেন এবং উসমান রা.-এর সামনেই তওবা করেছেন। যখন উসমান রা. তাকে তার পিতার কথা স্মরণ করিয়ে দেন, তখন তিনি কান্না শুরু করেন এবং নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হন। এরপর তিনি উসমান রা.-এর পক্ষ হয়ে ফিতনাবাজদের প্রতিরোধ করা শুরু করেন। কিন্তু তারা তাকে পরাজিত করে। অতঃপর উসমান রা.-এর ঘরে প্রবেশ করে তাকে হত্যা করে। উসমান রা.-এর স্ত্রী নায়েলা বিনতে ফারাফিসা রহ. এ কথার সাক্ষ্য দিয়েছেন।

তারা মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর রা.-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কথা ভাবতে থাকে। তাদের শক্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। অপরদিকে মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর রা.-এর নিয়ন্ত্রণ ক্রমেই দুর্বল হতে থাকে। মিশরে উসমান রা.-এর হত্যার প্রতিশোধের দাবিদাররা নিজেদের নাম দিয়েছিল উসমানি। তাদের নেতৃত্বে ছিলেন মুআবিয়া ইবনে হুদাইজ সাকুনি রা.। যিনি ছিলেন উসমান রা.-এর মৃত্যুর পূর্বে তার সাহায্যে প্রেরিত বাহিনীর অগ্রভাগের সেনাপতি। উসমান রা.-এর হত্যার সংবাদ শোনার পর তিনি মিশরে ফিরে এসেছিলেন।

মিশর আলি রা.-এর তুলনায় মুআবিয়া রা.-এর বেশি নিকটবর্তী ছিল। মুআবিয়া রা. যখন জানতে পারলেন যে, মিশরের ওপর মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর রা.-এর নিয়ন্ত্রণ দুর্বল। তখনই তিনি আমর ইবনুল আস রা.-এর নেতৃত্বে ৬ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী পাঠিয়ে দেন মিশরের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের জন্য। আমর ইবনুল আস রা. মিশর সম্পর্কে পূর্ব থেকেই অবগত ছিলেন। তিনিই প্রথম এ অঞ্চল জয় করেন এবং আবদুল্লাহ ইবনে সাদ ইবনে আবু সারহ রা.-এর পূর্বে উমর রা. ও উসমান রা-এর পক্ষ থেকে দীর্ঘকাল মিশরের গভর্নর ছিলেন।

এই ৬ হাজার সৈন্যের সঙ্গে যোগ হয় মিশরের মুআবিয়া ইবনে হুদাইজ রা.-এর নেতৃত্বাধীন ১০ হাজার সৈন্য। ফলে তাদের বাহিনীর সেনা সংখ্যা পৌঁছে যায় ১৬ হাজারে। মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর রা. মিশরের অধিবাসীদের কাছে লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার আহ্বান করেন। তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল ইয়ামেনের অধিবাসী, যারা মিশরে বসবাস করত। তারা মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর রা.-এর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। এরপরও তিনি তাদের জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করলে সাকুল্যে ২ হাজার লোক তার আহ্বানে সাড়া দেয়। আলি রা. এ খবর জানতে পেরে মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর রা.-এর সাহায্যে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। আশতার নাখায়িও সেই বাহিনীতে ছিল। মিশরের কুলযুম নামক স্থানে পৌঁছলে আশতার নাখায়ির সঙ্গে জনৈক লোকের সাক্ষাৎ হয়। লোকটি আশতার নাখায়িকে মধু পান করায়। পান করা মাত্রই বিষক্রিয়ায় আশতার নাখায়ি মারা যায়।

বর্ণিত আছে, আশতার নাখায়িকে বিষাক্ত মধু পান করানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রা.। তবে এই বর্ণনায় সন্দেহ ও দুর্বলতা রয়েছে। আর যদি তা সহিহও হয়ে থাকে তবে এতে মুআবিয়া রা.-এর শক্ত দলিল রয়েছে। তিনি উসমান রা.-এর হত্যায় যারা জড়িত ছিল তাদের সকলকে হত্যা করা বৈধ মনে করতেন। এসব যুদ্ধবিগ্রহ ঘটার পেছনে এটিই তো ছিল একমাত্র কারণ। আর আশতার নাখায়ি ছিল উসমান রা.-কে অবরোধকারীদের একজন। এ ব্যাপারে সে লোকদের যথেষ্ট উৎসাহিত করেছে।

আশতার নাখায়ির মৃত্যুতে মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর রা.-এর শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। কারণ, আশতার ছিল প্রভাবশালী ও দূরদর্শী। সমরবিদ্যায় সে ছিল খুবই পারদর্শী। মুআবিয়া রা. ও আমর ইবনুল আস রা.-এর কাছে যখন আশতারের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছে, তখন তারা বলেন, সুবহানাল্লাহ, মধুও আল্লাহ তাআলার সৈনিকের কাজ করে![৩২৯]

আমর ইবনুল আস রা. চাইতেন, যেন লড়াই ছাড়াই সব কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়। তাই তিনি মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর রা.-এর কাছে চিঠি পাঠান। চিঠিতে তিনি লেখেন, আমি চাই না আমার পক্ষ থেকে তোমার ওপর একটি

---

৩২৯. *তারিখুত তবারি*, ৪/১৩৩; *আল-কামিল ফিত তারিখ*, ২/৩৯৭; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/৩৪৬; *আন-নুজুমুয যাহিরা*, ১/১০৪

নখের আঁচড়ও লাগুক। এ দেশের লোকেরা তোমার বিরুদ্ধে ও আমার নেতৃত্ব মেনে নিতে একমত হয়েছে এবং তোমার আনুগত্য করাকে নিজেদের জন্য লজ্জাজনক মনে করছে। তাই আমরা মুখোমুখি হলে তারা তোমাকে আমাদের হাতে তুলে দেবে। তাই তুমি মিশর থেকে বেরিয়ে পড়ো। নিশ্চয় আমি তোমার একজন শুভাকাঙ্ক্ষী।[৩৩০]

কিন্তু মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর রা. তার কথা শোনেননি। ফলে উভয় পক্ষ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। আমর ইবনুল আস রা.-এর পক্ষ বিজয়ী হয় আর মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর রা.-এর সঙ্গে থাকা অল্পসংখ্যক কিছু লোকের বাহিনী হয় পরাজিত। মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর রা. যুদ্ধে শহিদ হন। কথিত আছে, যুদ্ধের পরে শামের বাহিনীর কয়েকজন তার পিছু নেয় এবং যুদ্ধক্ষেত্রের কাছেই একটি বিরান জায়গায় তাকে হত্যা করে।[৩৩১]

মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর রা.-এর হত্যার ঘটনায় আলি রা. খুবই ব্যথিত হন। তিনিই তাকে লালনপালন করে বড় করেছিলেন। আবু বকর রা.-এর মৃত্যুর পর তার স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস রা.-এর ইদ্দত পালন শেষে আলি রা.-এর সঙ্গে তার বিয়ে হয় এবং আলি রা. মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর রা.-কে লালনপালন করেন।

এমনইভাবে আয়েশা রা.-ও তার মৃত্যুতে শোকাহত হন এবং তার সন্তানদের লালনপালনের জন্য নিজের কাছে নিয়ে আসেন।

এভাবেই মিশরে আমর ইবনুল আস রা.-এর কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয় এবং তিনি মুআবিয়া রা.-এর পক্ষ থেকে সেখানকার গভর্নর নিযুক্ত হন। এর ফলে শাম ও মিশর মুআবিয়া রা.-এর নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

এদিকে ইরাকের মাটিতে আলি রা.-এর বিরুদ্ধে লোকদের বিরুদ্ধাচারণ দিনদিন বাড়তেই থাকে। ফলে আলি রা. অত্যন্ত রাগান্বিত হন এবং তাদের সামনে একটি দীর্ঘ বক্তব্য পেশ করেন। বলেন, আল্লাহর শপথ! ধোঁকাগ্রস্ত তো তারা, যাদের তোমরা ধোঁকা দিয়েছ। যারা তোমাদের ছেড়ে গিয়েছে তারা তাদের প্রাপ্য অংশ পেয়ে গিয়েছে। যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য ডাকি, তখন কোনো ভালো মানুষ পাই না। আর যখন একান্তে কথা

---

৩৩০. *তারিখুত তবারি*, ৫/১০১; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/৩৪৮

৩৩১. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/৩৪৯

বলি, তখন কোনো বিশ্বস্ত ব্যক্তি পাই না। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন!

আমি তোমাদের কাছ থেকে কী আশা করেছিলাম আর কী পেলাম! তোমরা অন্ধ, কিছুই দেখতে পাও না। মূক, কিছুই বলতে পারো না এবং বধির, কিছুই শুনতে পারো না। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

ইবনে কাসির রহ. এ ব্যাপারে বলেন, একদিকে শামবাসীদের শক্তি যতই বৃদ্ধি পাচ্ছিল, অপরদিকে ইরাকবাসীদের শক্তি ততই দুর্বল হচ্ছিল। অথচ তাদের নেতা আলি রা. ছিলেন তৎকালীন পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে বেশি ইবাদতকারী, সবচেয়ে দুনিয়াবিমুখ, সবচেয়ে জ্ঞানী ও সবচেয়ে খোদাভীরু ব্যক্তি। এতৎসত্ত্বেও তারা তাকে এতই লাঞ্ছিত করে যে, তিনি জীবনকে ঘৃণা করতে শুরু করেন। মৃত্যু কামনা করতে থাকেন। ক্রমাগত বাড়তে থাকা ফিতনা ও বিপর্যয় তার মনে জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্ম দিয়েছিল। তিনি প্রায়ই বলতেন, সেই দুর্ভাগাকে কে রুখে দিয়েছে? সে কীসের প্রতীক্ষায় আছে?[৩৩২]

দুর্ভাগা দ্বারা উদ্দেশ্য সেই ব্যক্তি, যে আলি রা.-কে হত্যা করবে। আলি রা. ওই সকল বিরোধী ব্যক্তিদের কষ্ট থেকে মুক্তি পেতে মৃত্যু কামনা করেছিলেন, যারা তার সঙ্গে বিতর্ক করত এবং তার নির্দেশ অমান্য করত; যেন তাদের সঙ্গে আর থাকতে না হয়। এ ব্যাপারে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। যেমন, ইমাম আহমাদ রহ. নিজ সনদে (সূত্রে) যায়দ ইবনে ওয়াহাব রহ. থেকে বর্ণনা করেন, আলি রা. বসরায় অবস্থানরত খারেজিদের একটি দলের কাছে আসেন। তাদের মধ্যে জাদ ইবনে বাজা নামক এক ব্যক্তি আলি রা.-কে বলে, হে আলি, আল্লাহকে ভয় করুন। নিশ্চয় আপনি মৃত্যুর মুখোমুখি হবেন।

আলি রা. তাকে বললেন, বরং আমাকে হত্যা করা হবে। আমার মাথায় আঘাত করা হবে, আমার দাঁড়ি রক্তে মেখে যাবে। এটি প্রতিশ্রুত ও ফয়সালাকৃত বিষয়। যারা মিথ্যাচার করে তারা ব্যর্থ।[৩৩৩]

৩৩২. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/৩৫৮

৩৩৩. *আল-মুসনাদ লিল ইমাম আহমাদ*, ৭০৩; *আল-মুসতাদরাক লিল হাকিম*, ৪৬৮৭

উসমান ইবনে সুহাইব রহ. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আলি রা. একদিন বলেন, রাসুল ﷺ আমাকে বললেন, প্রথমে যারা এসেছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে দুর্ভাগা কে?

আমি বললাম, যে ব্যক্তি সালেহ আ.-এর উটনী হত্যা করেছিল।

তিনি বললেন, তুমি সত্য বলেছ। তাহলে শেষে যারা আসবে তাদের মধ্যে সবচেয়ে দুর্ভাগা কে?

আমি বললাম, তা তো জানি না।

তিনি বললেন, যে ব্যক্তি তোমার এখানে আঘাত করবে। এই বলে তিনি আলি রা.-এর মাথার অগ্রভাগের দিকে ইঙ্গিত করেন।

আলি রা. বলতেন, আমি চাই তোমাদের মধ্যকার সেই দুর্ভাগা ব্যক্তিটি উঠে দাঁড়িয়ে আমার মাথার রক্তে আমার দাড়ি রাঙিয়ে দিক।[৩৩৪]

আলি রা.-কে হত্যার ব্যাপারে তিনজনের ষড়যন্ত্র

খারেজিরা কিছুতেই থেমে ছিল না। যতবার তারা আলি রা.-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, ততবারই তাদের দলের বহু মানুষকে গ্রহণ করতে হয়েছে মৃত্যুর স্বাদ। তবুও তারা থেমে থাকত না। একের পর এক বিদ্রোহ ঘোষণা করতেই থাকত। ইরাকের অবস্থা এমন দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়েই চলতে থাকে। অপরদিকে শামের পরিস্থিতি ছিল শান্ত। সেখানকার সবাই ছিল মুআবিয়া রা.-এর প্রতি পূর্ণ অনুগত।

এ সময়ে খারেজিদের তিনজন ব্যক্তি একত্র হয়। প্রথমজনের নাম ছিল আবদুর রহমান ইবনে মুলজিম কিন্দি। অধিক ইবাদতের কারণে তার চেহারায় দাগ পড়ে গিয়েছিল। এজন্য সে প্রসিদ্ধও ছিল। অপর দুজনের নাম ছিল বারক ইবনে আবদুল্লাহ তামিমি ও আমর ইবনে বকর তামিমি। এখন তাদের কী করা উচিত এ নিয়ে তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে। তারা সালিশ নির্ধারণের বিষয়টি কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি। আলি রা., মুআবিয়া রা. ও আমর ইবনুল আস রা.-সহ সালিশ নির্ধারণে সম্মত সকলকেই তারা কাফের সাব্যস্ত করে। নাহরাওয়ানের যুদ্ধ ও পরবর্তী

৩৩৪. *মুসনাদু আবি ইয়ালা*, ৪৮৫; *আল-মুজামুল কাবির লিত তবারানি*, ৭৩১১

যুদ্ধগুলোতে তাদের যে-সকল ভাই নিহত হয়েছে, তাদের জন্য রহমতের দোয়া করে।

তারা বলে, তাদের মৃত্যুর পর এখন আমরা বেঁচে থেকে কী করব। তারা বেঁচে থাকতে আল্লাহর পথে কোনো নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করত না।

তারা আরও বলে, যদি আমরা এই পৃথিবী থেকে আমাদের প্রাণকে ক্রয় করে নিয়ে ওই সকল ভ্রান্ত নেতাদের কাছে গিয়ে তাদের হত্যা করতে পারতাম! যদি আমরা এদের হাত থেকে দেশসমূহকে নিষ্কৃতি দিতে পারতাম এবং এদের কাছ থেকে আমাদের ভাই হত্যার প্রতিশোধ নিতে পারতাম!

তখন আবদুর রহমান ইবনে মুলজিম বলে ওঠে, আলিকে হত্যা করার জন্য আমিই যথেষ্ট।

বারক বলে, আমি মুআবিয়াকে হত্যার জন্য যথেষ্ট।

আমর ইবনে বকর বলে, আমি আমর ইবনুল আসকে হত্যার জন্য যথেষ্ট।

অতঃপর তারা এ ব্যাপারে শপথ গ্রহণ করে। তাদের কেউই এই শপথ ভঙ্গ করবে না এই মর্মে একমত হয়। অচিরেই তারা তাদের হত্যা করার জন্য অথবা নিজেরা মৃত্যুবরণ করার জন্য রওনা হবে। তারা ঠিক করে রমজান মাসে তাদের হত্যা করা হবে। অল্প কিছু লোক ব্যতীত অন্য সবার কাছে তারা বিষয়টি গোপন রাখে। ওই অল্পসংখ্যক লোকের মধ্য থেকেই কেউ কেউ পরবর্তী সময়ে তওবা করে নেয় এবং এই ষড়যন্ত্রের কথা বর্ণনা করে।[৩৩৫]

বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত আছে, কিতাম বিনতে সিজনা নামক এক সুন্দরী নারীর পিতা ও ভাই নাহরাওয়ানের যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। আবদুর রহমান ইবনে মুলজিম যখন কিছু লোকের সঙ্গে আলি রা.-এর হত্যার ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করছিল, তখন কিতাম বিনতে সিজনা তার কাছে আসে। আবদুর রহমান ইবনে মুলজিম কিতামকে দেখে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালে কিতাম ৩ হাজার দিরহাম, একটি গোলাম, একটি বাঁদি ও আলি রা.-কে হত্যা করার শর্ত করে। তখন আবদুর রহমান ইবনে মুলজিম বলে, আমি তো এ কাজের জন্যই কুফায় এসেছি।

---

৩৩৫. *তারিখুত তবারি*, ৫/১৪৪; *আল-কামিল ফিত তারিখ*, ২/৫৩৮; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/৩৬১

কিতাম আবদুর রহমান ইবনে মুলজিমকে এ কাজের জন্য উদ্‌বুদ্ধ করতে থাকে। অতঃপর সে কিতামকে বিয়ে করে। ফলে আলি রা.-কে হত্যা করার ইচ্ছা তার আরও দৃঢ় হয়।[৩৩৬]

আবদুর রহমান ইবনে মুলজিম শাবিব ইবনে নাজদা শিজয়ি নামক অপর এক ব্যক্তির কাছে গিয়ে বলে, দুনিয়া ও আখেরাতের সম্মানের প্রতি আপনার কোনো আগ্রহ আছে কী?

শাবিব বলে, তা কীভাবে?

আবদুর রহমান ইবনে মুলজিম বলে, আলিকে হত্যা করার মাধ্যমে।

তখন শাবিব বলে, তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক! কতই-না নিকৃষ্ট কথা বললে তুমি। এটা কীভাবে সম্ভব?

শাবিব আবদুর রহমান ইবনে মুলজিমের এ পরিকল্পনার কারণে তাকে তিরস্কার করে। কারণ, আলি রা. হলেন একজন শক্তিশালী, বাহাদুর ও প্রভাবশালী ব্যক্তি। বিভিন্ন যুদ্ধে তার রয়েছে বিশাল অবদান ও অতুলনীয় বীরত্বের দৃষ্টান্ত। এরপর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, তিনি হলেন আমিরুল মুমিনিন।

আবদুর রহমান ইবনে মুলজিম বলে, আমি তার জন্য মসজিদে ওত পেতে থাকব। সে যখন আগামীকাল ফজরের নামাজের জন্য বের হবে আমরা তার ওপর হামলা করে তাকে হত্যা করব। যদি আমরা সফল হই তবে আমরা নিজেরাও বেঁচে যাব এবং আমাদের প্রতিশোধও নেওয়া হবে। আর যদি মরে যাই তবে এর চেয়ে উত্তম আর কী হতে পারে?

শাবিব বলে, তুমি ধ্বংস হও। আলি ছাড়া যদি অন্য কেউ হতো তবে আমার জন্য তা সহজ হতো। ইসলামে তার অগ্রগামীতা ও রাসুল ﷺ-এর নিকটবর্তিতার কথা আমি জানি। তাকে হত্যা করার জন্য আমার মন সায় দেয় না।

আবদুর রহমান ইবনে মুলজিম বলে, তুমি কি জানো না সে নাহরাওয়ানের যুদ্ধে আমাদের ভাইদের হত্যা করেছে? আমরা তাদের হত্যার বিনিময়েই তাকে হত্যা করব।

---

৩৩৬. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/৩৬১

এভাবে সে অনুপ্রাণিত করতে থাকলে একপর্যায়ে শাবিব তাকে সহযোগিতা করার আশ্বাস দেয়।[৩৩৭]

আবদুর রহমান ইবনে মুলজিম, বারক ইবনে আবদুল্লাহ এবং আমর ইবনে বকর স্থির করে যে, তারা তিনজন একই দিনে আলি রা., মুআবিয়া রা. ও আমর ইবনুল আস রা.-কে হত্যা করবে এবং তাদের দৃষ্টিতে ভ্রান্ত তিন নেতার হাত থেকে মুসলিম উম্মাহকে মুক্ত করবে।

তারা স্থির করে রমজান মাসের ১৭ তারিখে তাদের তিনজনকে হত্যা করবে। অতঃপর বারক ইবনে আবদুল্লাহ মুআবিয়া রা.-এর উদ্দেশ্যে দামেশকে রওনা হয়। আমর ইবনে বকর চলে যায় মিশরের ফুসতাতে, যেখানে অবস্থান করছেন আমর ইবনুল আস রা.। আর আবদুর রহমান ইবনে মুলজিম অবস্থান করে কুফাতে, যেখানে আছেন আলি রা.।

আলি রা.-এর শাহাদাতবরণ

১৭ রমজান ফজরের সময় আবদুর রহমান ইবনে মুলজিম আলি রা.-এর অপেক্ষায় ওত পেতে থাকে। আলি রা. নিজের ঘর থেকে ফজরের নামাজ পড়ার জন্য বের হন এবং সবাইকে নামাজের জন্য জাগ্রত করতে থাকেন। তার সঙ্গে কোনো প্রহরী থাকত না। মসজিদের কাছাকাছি যেতেই শাবিব ইবনে নাজদা তাকে সজোরে আঘাত করে। ফলে তিনি মাটিতে পড়ে যান। তবে এই আঘাতে তার মৃত্যু হয়নি। অতঃপর পাষণ্ড আবদুর রহমান ইবনে মুলজিম এসে বিষমাখা তরবারি দিয়ে তার মাথায় আঘাত করে। তার দাড়ির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যায় রক্ত। যেমনটি রাসুল ﷺ তার হত্যার ব্যাপারে বলেছিলেন।

এই আঘাতের পর পাষণ্ড আবদুর রহমান ইবনে মুলজিম বলে ওঠে, আলি, ফয়সালা দেওয়ার অধিকার তোমার নেই, অধিকার রয়েছে একমাত্র আল্লাহর।

সে কুরআনের এই আয়াত তেলাওয়াত করতে থাকে,

---

৩৩৭. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/৩

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾

> কিছু মানুষ এমন আছে, যারা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির বিনিময়ে নিজেকে বিক্রি করে দেয়। আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দার প্রতি দয়াশীল। [সুরা বাকারা : ২০৭]

আলি রা. চিৎকার করে বলতে থাকেন, এই লোকটিকে ধরো।

লোকজন এসে আবদুর রহমান ইবনে মুলজিমকে আটকে ফেলে। আর শাবিব পালিয়ে যায়।

অতঃপর আলি রা. ফজরের নামাজ পড়ানোর জন্য জাদা ইবনে হুবাইরা রা.-কে এগিয়ে দেন। লোকেরা তাকে ধরে বাড়িতে নিয়ে যায়। আলি রা. বুঝতে পারেন এই তরবারিটি ছিল বিষমাখা ও অচিরেই তিনি ইন্তেকাল করতে যাচ্ছেন। বিশেষ করে এই আঘাতটি ছিল রাসুল ﷺ যেভাবে বলেছিলেন ঠিক সেভাবেই। তখন তিনি আবদুর রহমান ইবনে মুলজিমকে ডাকেন। তাকে হাত বাঁধা অবস্থায় উপস্থিত করা হয়। আলি রা. বলেন, আল্লাহর শত্রু, আমি কি তোমার প্রতি সদাচারণ করিনি?

সে বলে, হ্যাঁ।

আলি রা. বলেন, তাহলে তুমি এমনটি কেন করলে?

সে বলে, আমি ৪০ দিন ধরে প্রতি সকালে তরবারিটি ধার দিয়েছি এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছি, যেন এর মাধ্যমে তার সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টিজীবকে হত্যা করা হয়।

আলি রা. বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি তোমার মৃত্যু দেখতে পাচ্ছি। আল্লাহ তাআলা তোমার দোয়া কবুল করে নিয়েছেন।

এরপর তিনি বলেন, আমি যদি মারা যাই তবে তাকে হত্যা করো। যদি আমি বেঁচে থাকি তবে তার সঙ্গে কী করা উচিত, তা আমিই ভালো বুঝব।

তখন জুনদুব রা. বলেন, আমিরুল মুমিনিন, আপনি যদি ইন্তেকাল করেন তাহলে কি আমরা হাসান রা.-এর হাতে বাইআত গ্রহণ করব? তিনি

বললেন, আমি তোমাদেরকে এই আদেশ দিচ্ছি না, নিষেধও করছি না।[৩৩৮]

মৃত্যু ঘনিয়ে এলে আলি রা. বেশি বেশি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করতে থাকেন। যেন এটিই হয় তার শেষ কথা। অতঃপর তিনি হাসান রা. ও হুসাইন রা.-কে অসিয়ত করেন। তারা তা লিপিবদ্ধ করে রাখেন—

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

এই হচ্ছে আলি ইবনে আবু তালেবের অসিয়ত। নিশ্চয় সে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই ও তিনি অদ্বিতীয় এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ তাআলার বান্দা ও রাসুল। তিনি তাঁকে সঠিক পথের দিশা ও সত্য ধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যেন তিনি অন্য সব ধর্মের ওপর বিজয়ী হতে পারেন; যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾

বলুন, আমার নামাজ, আমার কুরবানি, আমার জীবন-মরণ সবই বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ তাআলারই জন্য। তাঁর কোনো শরিক নেই, আমাকে এরই আদেশ করা হয়েছে এবং আমিই প্রথম তাঁর আনুগত্য স্বীকারকারী। [সুরা আনআম : ১৬২-১৬৩]

হাসান, আমি তোমাকে ও আমার সকল সন্তানকে—যাদের কাছে এই লেখা পৌঁছবে—অসিয়ত করছি যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলাকে ভয় করবে এবং মুসলিম অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করবে। সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জু আঁকড়ে ধরবে এবং বিভক্ত হবে না। আমি রাসুল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, দুই বিবদমান ব্যক্তির মধ্যে মীমাংসা করে দেওয়া সাধারণ নামাজ ও রোজা থেকে উত্তম। তোমাদের নিকটাত্মীয়দের প্রতি লক্ষ রাখবে এবং আত্মীয়তা বজায় রাখবে। এতে আল্লাহ তাআলা তোমাদের হিসাবকে সহজ করবেন। এতিমদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। তাদের তোমরা বঞ্চিত করো না এবং

৩৩৮. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/৩৬২; *তারিখু ইবনি খালদুন*, ২/৬৪৬

তোমাদের উপস্থিতিতে তারা যেন লাঞ্ছিত না হয়। তোমাদের প্রতিবেশীদের ব্যাপারেও আল্লাহকে ভয় করো। কারণ, এটি তোমাদের নবীর নির্দেশ। তিনি সর্বদা এ নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি আমরা ধারণা করেছি, তিনি প্রতিবেশীদের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করে দেবেন। আমি তোমাদের সতর্ক করছি কুরআনের ব্যাপারে। কুরআনের প্রতি আমলে কেউ যেন তোমাদের চেয়ে অগ্রবর্তী হতে না পারে। সতর্ক করছি নামাজের ব্যাপারে। নামাজ তোমাদের দ্বীনের স্তম্ভ। সতর্ক করছি তোমাদের প্রভুর গৃহের (মসজিদের) ব্যাপারে। তোমরা বেঁচে থাকতে তা যেন খালি না হয়। যদি তাকে ছেড়ে দাও, তাহলে তোমাদের প্রতিও ভ্রুক্ষেপ করা হবে না। সতর্ক করছি রমজান মাসের ব্যাপারে। নিশ্চয় রমজানের রোজা হচ্ছে জাহান্নাম থেকে বাঁচার ঢালস্বরূপ।

তোমাদের সতর্ক করছি নিজেদের জানমাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে যাওয়ার ব্যাপারে। সতর্ক করছি জাকাতের ব্যাপারে। নিশ্চয় তা প্রভুর ক্রোধ নিভিয়ে দেয়। সতর্ক করছি তোমাদের নবীর প্রতি দায়িত্ব নিয়ে। তোমাদের সামনে কেউ যেন তা লঙ্ঘন করতে না পারে। সতর্ক করছি রাসুল ﷺ-এর সাহাবিগণের ব্যাপারে। কারণ, নবীজি ﷺ সাহাবিগণের ব্যাপারে অসিয়ত করেছেন। সতর্ক করছি অসহায় ও দরিদ্রদের ব্যাপারে। তাদেরকে তোমাদের জীবিকায় শরিক করে নেবে। সতর্ক করছি তোমাদের মালিকানাধীন গোলাম-বাঁদি সম্পর্কে। কারণ, রাসুল ﷺ-এর শেষ কথা ছিল এই, 'তোমাদেরকে দুর্বল দুই শ্রেণি অর্থাৎ তোমাদের স্ত্রী ও বাঁদিদের প্রতি লক্ষ রাখার অসিয়ত করছি।'

নামাজের প্রতি গুরুত্ব দেবে। আল্লাহর পথে কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে পরোয়া করবে না। তারা তোমাদেরকে নিজেদের সংকল্প থেকে দূরে ঠেলে শেষে বিরোধিতা করবে। আল্লাহ তাআলার নির্দেশ অনুযায়ী লোকদের সঙ্গে উত্তম পন্থায় আলোচনা করবে। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা থেকে কখনো বিরত হবে না। এমনটি হলে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে মন্দ ব্যক্তিরা ক্ষমতা দখল করে নেবে। অতঃপর তোমরা দোয়া করবে কিন্তু তা কবুল হবে না। তোমরা পরস্পর সম্প্রীতি রক্ষা করবে। একে অন্যের জন্য খরচ করবে। মানুষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া, সম্পর্ক ছিন্ন করা ও বিভক্তি থেকে দূরে থাকবে।

> সৎ কাজ ও খোদাভীরুতায় একে অপরকে সহযোগিতা করবে। গুনাহ ও সীমালঙ্ঘনে একে অপরকে সহযোগিতা করবে না। আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা কঠিন শাস্তিদাতা। আল্লাহ তাআলা তোমাদের মাধ্যমে তোমাদের পরিবার এবং তোমাদের নবীর সম্মান সংরক্ষণ করুন। আমি তোমাদেরকে আল্লাহ তাআলার হাতে সোপর্দ করছি এবং তোমাদের প্রতি শান্তি ও রহমত বর্ষণ কামনা করছি।

এরপর আলি রা. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করা ব্যতীত অন্য কোনো কথা বলেননি। অতঃপর শেষ মুহূর্তে এসে তিনি তেলাওয়াত করেন,

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾

> যে অণু পরিমাণ নেক আমল করবে তা দেখতে পাবে। আর যে অণু পরিমাণ মন্দ আমল করবে তা-ও দেখতে পাবে। [সুরা যিলযাল : ৭-৮][৩৩৯]

অতঃপর তিনি শহিদ হয়ে মহান প্রভুর সান্নিধ্যে গমন করেন, যিনি ছিলেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ১০জন সাহাবির একজন। রাসুল ﷺ-এর জামাতা ও চাচাতো ভাই।

দুই পুত্র হাসান রা., হুসাইন রা. ও ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে জাফর রা. তাকে গোসল করান। হাসান রা. তার জানাজার নামাজে ইমামতি করেন। এরপর আবদুর রহমান ইবনে মুলজিমকে নিয়ে আসা হয় এবং শরয়ি বিধান অনুযায়ী তাকে হত্যা করা হয়।[৩৪০]

মুআবিয়া রা.-কে হত্যার চেষ্টা

এদিকে মুআবিয়া রা.-এর অপেক্ষায় ওত পেতে থাকা বারক ইবনে আবদুল্লাহ তার ওপর বিষাক্ত তরবারি দিয়ে আঘাত করে। মুআবিয়া রা. সেই আঘাত থেকে বেঁচে গেলেও তার উরুতে আঘাত লাগে। লোকেরা তাকে ধরে বাড়িতে নিয়ে যায় এবং বারক ইবনে আবদুল্লাহকে আটক করে। এরপর মুআবিয়া রা.-এর চিকিৎসা করা হয়। আল্লাহ তাকে আরোগ্য দান করেন।[৩৪১]

---

৩৩৯. *আল-মুজামুল কাবির লিত তবারানি*, ১৬৭; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/৩৬৩

৩৪০. *তারিখুল খুলাফা*, পৃ. ১৩৬

৩৪১. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭/২৬৮

আমর ইবনুল আস রা.-কে হত্যার চেষ্টা

আমর ইবনুল আস রা.-কে হত্যার প্রতিশ্রুতিদাতা আমর ইবনে বকর অপেক্ষা করতে থাকে, তিনি কখন ফজরের নামাজের জন্য বের হন। কিন্তু এদিন আমর ইবনুল আস রা. অসুস্থ ছিলেন। তাই তিনি তার নায়েব খারিজাকে নামাজের দায়িত্ব প্রদান করেন। আমর ইবনে বকর সেই নায়েবকেই আমর ইবনুল আস ভেবে হত্যা করে। লোকেরা তাকে ধরে ফেলে এবং নায়েবকে হত্যা করার শাস্তিস্বরূপ আমর ইবনে বকরকে হত্যা করা হয়। এভাবে আল্লাহ তাআলা আমর ইবনুল আস রা.-কে বাঁচিয়ে দেন। লোকেরা বলতে থাকে, তার ইচ্ছা ছিল আমরকে হত্যা করা। কিন্তু আল্লাহ চেয়েছেন খারিজার মৃত্যু।[৩৪২] অতঃপর এই কথাটি একটি প্রবাদে পরিণত হয়। যখন কেউ কোনো কাজের ইচ্ছা করে এবং আল্লাহর ইচ্ছা থাকে ভিন্ন, তখন এই কথাটি বলা হয়।

আলি রা.-এর হত্যাকাণ্ডের পর মুসলিমগণ হয়ে পড়েন খলিফাশূন্য। তখন তারা নতুন খলিফা নির্বাচনে চিন্তাভাবনা শুরু করে দেন।

হাসান রা. ও আমুল জামাআ

ইরাকের যখন এমন পরিস্থিতি, শামে তখন মুআবিয়া রা.-এর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ। তার রাজত্ব ছিল বিশাল এবং তা ছিল যথেষ্ট শক্তিশালী ও সুরক্ষিত। ফলে তারা নিজেদের শক্তিমত্তা অনুভব করতে শুরু করে। আলি রা.-এর ইন্তেকালের পর ইরাকের অধিবাসীরা একত্র হয়ে হাসান রা.-এর হাতে বাইআত গ্রহণ করে তাকে খলিফা হিসাবে মেনে নেয়। তাদের এই খলিফা নির্বাচন অবশ্যই সঠিক ছিল। হাসান রা. ছিলেন একজন খোদাভীরু, পরহেজগার, আলেম ও মুজাহিদ। তিনি ছিলেন রাসুল ﷺ-এর ভাষায় রায়হানা (একটি সুগন্ধি ফুল)। রাসুল ﷺ তাকে সাইয়িদ তথা নেতা উপাধি দিয়েছিলেন। এজন্য তাকে সাইয়িদুল মুসলিমিন অর্থাৎ মুসলিমদের নেতা বলা হতো।

রাসুল ﷺ-এর কাছে হাসান রা. ও হুসাইন রা.-এর মর্যাদা এবং তাদের প্রতি তাঁর সীমাহীন ভালোবাসা সম্পর্কে অসংখ্য হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

---

৩৪২. *আল-কামিল ফিত তারিখ*, ২/৭৪৩; *তারিখু ইবনি খালদুন*, ২/৬৪৭

ইরাকবাসী হাসান রা.-এর হাতে বাইআত গ্রহণের জন্য একত্র হয়। কায়স ইবনে সাদ রা.-ও আসেন। তার অধীনে ছিল আজারবাইজান ও ৪০ হাজার সৈন্য। তাদের প্রত্যেকেই আলি রা.-এর শাহাদাতের পূর্বে তার হাতে বাইআত গ্রহণ করেছিলেন। কায়স ইবনে সাদ রা. হাসান রা.-কে বলেন, আপনার হাত প্রসারিত করুন। আমরা বাইআত গ্রহণ করব।

হাসান রা. তার কথার কোনো জবাব দেননি। তিনি কায়স ইবনে সাদ রা.-এর এ কথায় সন্তুষ্ট হননি এবং এমনটি কামনাও করেননি। কারণ, তিনি জানেন যে, এর পরে রয়েছে অনেক রক্ত। কিন্তু কায়স রা.-এর বারংবার পীড়াপীড়ির কারণে অবশেষে তিনি সম্মত হন। এ ছিল ৪০ হিজরির ১৭ রমজান, আলি রা.-এর ইন্তেকালের দিনের ঘটনা।[৩৪৩]

ইরাকে হাসান রা.-এর জন্য বাইআত সম্পন্ন হয়। তখন ইসলামি সাম্রাজ্যের একটি বিশাল অংশ ও বিজিত পারস্য ছিল ইরাকের প্রশাসনিক সীমানার অন্তর্ভুক্ত।

এদিকে শামের অধিবাসীরা আলি রা.-এর ইন্তেকালের পর খলিফা হিসাবে মুআবিয়া রা.-এর কোনো বিকল্প দেখতে পায়নি।[৩৪৪] এ ক্ষেত্রে একটি কথা জেনে রাখা উচিত যে, আলি রা.-এর খেলাফতের পুরো সময়জুড়ে মুআবিয়া রা. আলি রা.-এর আনুগত্য স্বীকার না করা সত্ত্বেও কখনো খেলাফতের দাবি করেননি এবং শামবাসীরাও চায়নি মুআবিয়া রা.-কে খেলাফতে অধিষ্ঠিত করতে। বরং তাদের কথা ছিল একটাই, যদি আলি রা. উসমান রা.-এর খুনিদের শাস্তি প্রদান করে তবেই তারা আনুগত্য স্বীকার করবে।

শিয়া, ওরিয়েন্টালিস্ট ও তাদের হাতে দীক্ষাপ্রাপ্ত মুসলিমদের গ্রন্থে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, এই লড়াই, সংঘর্ষ ও রক্তপাত হয়েছিল রাজত্ব ও শাসনক্ষমতার জন্য, তা কোনোভাবেই ঠিক নয়। রাসুল ﷺ-এর সম্মানিত সাহাবিগণের ওপর এ স্পষ্ট অপবাদ। তারা নিজেদের বিবেকবুদ্ধি দিয়ে চিন্তা করেছেন অতঃপর যখন নিশ্চিত হয়েছেন যে, তারা সত্যের পক্ষে আছেন, তখনই তারা যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছেন। এ যুদ্ধের মাধ্যমে তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করা।

---

৩৪৩. *তারিখু ইবনি খালদুন*, ২/৬৪৮

৩৪৪. *তারিখু ইবনি খালদুন*, ২/৬৪৮

অতঃপর শামের অধিবাসীরা মুআবিয়া রা.-এর হাতে বাইআত গ্রহণ করে। ফলে মুসলিম ইতিহাসে প্রথমবারের মতো একই সঙ্গে দুই খলিফা নির্বাচিত করার ঘটনা ঘটে। তাদের একজন শামে, আরেকজন ইরাকে। এমনটি শরিয়তসম্মত নয়। ইসলাম এমনটি সমর্থন করে না। বরং সমস্ত মুসলিমের জন্য একজন খলিফা হবেন, সবাই তার কথা শুনবে এবং আনুগত্য করবে।

হাসান ইবনে আলি রা. লড়াই পছন্দ করতেন না। তিনি তার পিতা আলি রা.-কে সিফফিনের উদ্দেশে যাত্রা করা থেকে নিষেধ করেছিলেন। অবশেষে আলি রা. তাকে বুঝাতে সক্ষম হন যে, তিনি ইমামের বাইআতে বিরোধিতাকারীদের সঙ্গে লড়াই করার মাধ্যমে আল্লাহর শরিয়তকেই প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছেন। তাই খেলাফত গ্রহণের পর থেকেই হাসান রা. লড়াই ও রক্তপাত এড়িয়ে লোকদের নিরাপত্তার প্রতি আগ্রহী হন। মুসলিমদের কোনোরূপ সংঘর্ষ এবং লড়াইয়ে তিনি আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু ইরাকের অধিবাসীরা শামের অধিবাসীদের সঙ্গে লড়াই ও ইরাকের নেতৃত্বের জেদে অটল থাকে।

হাসান রা. তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে তারা নিজেদের পুরনো অভ্যাসমতো পুনরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে। শামের অধিবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য কয়েক হাজার লোক সমবেত হয়। এই লড়াইয়ের শরয়ি ব্যাখ্যা থাকলেও এতে ইমাম তথা নেতার আদেশের বিরোধিতা করা হয়েছিল। হাসান রা. এই লোকদের বিরোধিতায় ফিতনার আশঙ্কা করে নিজের অপছন্দসত্ত্বেও শামের অধিবাসীদের সঙ্গে লড়াই করার উদ্দেশ্যে বাহিনী নিয়ে বের হতে বাধ্য হন। মুআবিয়া রা. এ সংবাদ শুনতে পেয়ে তিনিও তার বাহিনী নিয়ে বেরিয়ে পড়েন।

দুই বাহিনী যতই নিকটবর্তী হচ্ছিল হাসান রা.-এর মনের অস্থিরতা কেবলই বেড়ে যাচ্ছিল। তিনি যুদ্ধে আগ্রহী ছিলেন না, তিনি চেয়েছিলেন মুসলিমদের রক্তপাত থেকে বাঁচাতে। তাই তিনি মুআবিয়া রা.-এর কাছে কয়েকটি চিঠি পাঠিয়ে তাকে তার মত থেকে ফিরে আসার আহ্বান করেন। সকল মুসলিমের সঙ্গে একমত হয়ে আনুগত্য স্বীকার করে নিতে বলেন। কিন্তু মুআবিয়া রা. দেখলেন, উসমান রা.-কে হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের এমন সুবর্ণ সুযোগ হয়তো আর কখনো আসবে না। তিনি যদি সকল মুসলিমের শাসক হতে পারেন তবেই এমনটি সম্ভব। এদিকে হাসান রা.-এর সঙ্গে আগত ইরাকি বাহিনী সংখ্যায় ছিল বিশাল এবং তারা ছিল লড়াইয়ের জন্য উদ্‌গ্রীব।

বিশেষভাবে সিফফিনের যুদ্ধে মুআবিয়া রা.-এর অর্ধেক বাহিনী নিহত হওয়ার পর তাদের এই আগ্রহ আরও বৃদ্ধি পায়। তারা হাসান রা.-এর হাতে মৃত্যুর বাইআত গ্রহণ করেছিল।

হাসান বসরি রহ. বলেন, হাসান রা. মুআবিয়া রা.-এর মুখোমুখি হলেন পর্বতসম সেনাবাহিনী নিয়ে।

আমর ইবনুল আস রা. তাদের দেখে বললেন, আমি এমন এক বাহিনী দেখতে পাচ্ছি যারা তাদের প্রতিপক্ষকে হত্যা না করে পশ্চাদ্‌গমন করবে না।

মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রা. বললেন, যদি তারা নিহত হয় তাহলে আমার হয়ে লোকদের দেখভাল কারা করবে? দুর্বল লোকদের সহায় কারা হবে? কারা নেবে তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের দেখাশোনার দায়িত্ব? মুআবিয়া রা. নিজেও যুদ্ধবিগ্রহ অপছন্দ করতেন। ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. তার ব্যাপারে বলেছেন, যুদ্ধ থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রে তিনি থাকতেন সর্বাগ্রে।

তখন তিনি হাসান রা.-এর সঙ্গে পরামর্শ ও আলাপ করার জন্য দুইজন দূত প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নেন। আবদুর রহমান ইবনে সামুরা রা. ও আবদুল্লাহ ইবনে আমের রা.-কে দূত হিসাবে প্রেরণ করা হয়। তারা হাসান রা.-এর সঙ্গে বৈঠকে বসেন।

হাসান রা. বলেন, নিশ্চয় এই উম্মত তাদের রক্ত নিয়ে সর্বনাশে মত্ত হয়ে গিয়েছে।

তখন আগত দূতদ্বয় তাকে বলেন, মুআবিয়া রা. আপনাকে এই এই প্রস্তাব দিয়েছেন। তিনি আপনার কাছে এমনটি কামনা করেন এবং আপনার সঙ্গে সন্ধি করতে চান।

হাসান রা. বলেন, আমাকে এ কথার নিশ্চয়তা কে দেবে?

তারা দুজন বললেন, আমরা আপনাকে এই নিশ্চয়তা দিচ্ছি। হাসান রা. এতে খুবই আনন্দিত হন। তিনি এমনটিই চেয়েছিলেন।[৩৪৫]

এরপর হাসান ইবনে আলি ইবনে আবু তালেব রা. ইসলামি ইতিহাসের সবচেয়ে বিপজ্জনক একটি পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। রাসুল ﷺ-এর

---

৩৪৫. *তাহযিবুল কামাল*, ৬/২৪৯; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৮/১৯

আদরের কন্যার আদরের দুলাল হাসান রা.-এর মতো পবিত্র মনের ব্যক্তিই পারেন এমন সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে। তিনি সম্পূর্ণ সন্তুষ্টির সঙ্গে মুআবিয়া রা.-এর কাছে খেলাফত ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এ সময় তার শক্তিমত্তা মোটেও কম ছিল না। শামের বাহিনীর তুলনায় তার বাহিনী ছিল বিশাল। তিনি চাইলেই শামের বাহিনীকে তছনছ করে দিতে পারতেন। এরপরও তার বাহিনী থেকে বিশাল অংশ অক্ষত থাকত। কিন্তু তিনি মুসলিমদের রক্তপাতের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য মুআবিয়া রা.-এর কাছে খেলাফত ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

হাসান রা. মুআবিয়া রা.-এর কাছে চিঠি পাঠান। তিনি এ শর্তে খেলাফত থেকে সরে দাঁড়াবেন যে, মুসলিমদের মধ্যে কোনো রক্তপাত হবে না এবং তার বাহিনী লড়াই ছাড়াই প্রত্যাবর্তন করবে।

এভাবেই হাসান রা.-এর ৬ মাসব্যাপী খেলাফতের পর মুআবিয়া রা. শরয়ি খলিফা হিসাবে নির্বাচিত হন।

হাসান রা.-এর খেলাফত ছেড়ে দেওয়া ও এর মাধ্যমে লোকদের মধ্যে মীমাংসা করে দেওয়া রাসুল ﷺ-এর নবুয়তের দলিলসমূহের একটি। *সহিহ বুখারি*-তে বর্ণিত আছে, আবু বাকরা রা. প্রায়ই বলতেন, আমি দেখেছি রাসুল ﷺ মিম্বরে উপবিষ্ট আর হাসান রা. তাঁর পাশেই বসা। তিনি একবার লোকদের দিকে তাকাচ্ছিলেন, আরেকবার তাকাচ্ছিলেন হাসান রা.-এর দিকে। অতঃপর বলেন, আমার এই সন্তান একজন নেতা। অচিরেই আল্লাহ তাআলা তার মাধ্যমে মুসলিমদের দুই বিরাট দলের মধ্যে মীমাংসা করবেন।[৩৪৬]

হাসান রা.-ই ছিলেন ইরাক ও শামের দুই বাহিনীর মধ্যে মীমাংসার মাধ্যম। ৪১ হিজরির সেই বছরকে আমুল জামাআ অর্থাৎ ঐক্যবদ্ধতার বছর নামে অভিহিত করা হয়। মুসলিমদের জন্য এ বছর ছিল খুবই সৌভাগ্যের। দীর্ঘ সময়ের বিভেদের পর এ বছরেই তাদের বিরোধ মিটে যায় এবং তারা এক কাতারে ঐক্যবদ্ধ হয়। কিন্তু ইরাকের স্বভাবজাত বিদ্রোহীরা—যাদের চিরায়ত অভ্যাস হচ্ছে শাসকের বিরোধিতা করা ও তাদের আনুগত্য না করা—হাসান রা.-এর এই সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হয়। তাদের ক্রোধ চরম আকার ধারণ করে। ইরাক প্রত্যাবর্তনের পর হাসান রা.-এর সঙ্গে দেখা হলেই তারা বলত, মুসলিমদের অপদস্তকারী, আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।

---

৩৪৬. *সহিহ বুখারি*, ২৭০৪; *সহিহ ইবনি হিব্বান*, ৬৯৬৪; *আল-মুসতাদরাক লিল হাকিম*, ৪৮১০

অথচ এর আগে তারা বলত, আমিরুল মুমিনিন, আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।

হাসান রা. তাদের বলতেন, তোমরা আমাকে এ কথা বলো না। আমি মুসলিমদের অপদস্ত করিনি। আমি রাজত্বের জন্য তাদের সঙ্গে লড়াই করা অপছন্দ করেছি। তিনি বলতেন, মুসলিমদের জীবন রক্ষার দায়িত্ব ছিল আমার হাতে।

সাফিনা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, খেলাফত হবে ৩০ বছর। এরপর হবে রাজত্ব।[৩৪৭]

সাফিনা রা. বলেন, আবু বকর রা.-এর খেলাফত ছিল দুই বছর, উমর রা.-এর খেলাফত ১০ বছর, উসমান রা.-এর খেলাফত ১২ বছর এবং আলি রা.-এর খেলাফত ছিল ছয় বছর।

হাসান রা. যে ছয় মাস খেলাফতের দায়িত্বে ছিলেন তার মাধ্যমে খেলাফতে রাশেদা সমাপ্ত হয় এবং মুআবিয়া রা.-এর মাধ্যমে শুরু হয় সেই রাজত্ব, যার সংবাদ রাসুল ﷺ দিয়ে গিয়েছিলেন। ইবনে কাসির রহ. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* গ্রন্থে এ ঘটনার সঙ্গে সংযুক্ত করে বলেন, হাসান রা.-এর খেলাফতের মাধ্যমে ৩০ বছর পূর্ণ হয়ে যায়। এরপর মুআবিয়া রা.-এর শাসনামলে শুরু হয় রাজত্ব। তাই তিনি ছিলেন ইসলামের ইতিহাসে প্রথম ও শ্রেষ্ঠ রাজা।

মুআবিয়া রা. ছিলেন ওহির লিপিকার। তাকে বলা হতো মুমিনদের মামা। কারণ, তিনি ছিলেন রাসুল ﷺ-এর স্ত্রী উম্মুল মুমিনিন উম্মে হাবিবা রামলা বিনতে আবু সুফিয়ান রা.-এর ভাই।

ছয় বছরব্যাপী রক্তক্ষয়ী সংঘাতের পর প্রথমবারের মতো যুদ্ধের আগুন নিভে যায়। মুসলিমরা আবার একতাবদ্ধ হয় একজন শাসকের অধীনে।

।। সমাপ্ত ।।

৩৪৭. *আল-মুসনাদ লিল ইমাম আহমাদ*, ২১৯১৯

এ গ্রন্থটি ইসলামি ইতিহাসের বেদনাসিক্ত একটি অধ্যায়ের প্রামাণ্যচিত্র। এখানে তুলে ধরা হয়েছে এমন এক মর্মান্তিক ঘটনা কিংবা দুর্ঘটনার কথা, যা আজও মুসলিমদের হৃদয়ে হাহাকার সৃষ্টি করে। যেই ঘটনায় সম্মানিত সাহাবিগণের হাতেই শহিদ হয়েছিলেন অনেক সাহাবি। এই গ্রন্থে আমরা কথা বলেছি ইসলামি ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ফিতনা উসমান ইবনে আফফান রা.-এর হত্যাকাণ্ড নিয়ে। আলোচনা করেছি আলি রা. এবং মুআবিয়া রা.-এর মতো সম্মানিত সাহাবিদ্বয়ের মধ্যকার লড়াই নিয়ে। কথা বলেছি এক অনভিপ্রেত ঘটনায় উল্লেখযোগ্যসংখ্যক সাহাবির শাহাদাত নিয়ে। যা সে সময় ইসলামের প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে রেখেছিল বিরাট নেতিবাচক প্রভাব।

—ড. রাগিব সারজানি